প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

37তম পুনর্মুদ্রণ : মে, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পাঠসংকরন প্রণীত হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পাঠ-উপকরণ অবলম্বনে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আনুকূল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

মূল সংকলনের লেখক, সম্পাদক, পরিকল্পনাকার প্রত্যেকের অবদান আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

পাঠসংকলনের বর্তমান আকার দিতে বিশেষভাবে যাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঃ

FHS ঃ পর্যায় - 5

ঃ অনুসৃজন ঃ
অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী
ড. শেখর ঘোষ

ঃ সম্পাদনা ঃ
অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী
অধ্যাপক শোভন লাল দত্তগুপ্ত

FHS ঃ পর্যায় - 6

ঃ অনুসৃজন ঃ
অধ্যাপিকা সঞ্চিতা দাশগুপ্ত

ঃ সম্পাদনা ঃ
অধ্যাপক অসিতানন্দ রায়

FHS ঃ পর্যায় - 7

ঃ অনুসৃজন ঃ
অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত
অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক অসিতানন্দ রায়

ঃ সম্পাদনা ঃ
অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত
ড. সুকুমার সেন

FHS ঃ পর্যায় - 8

ঃ অনুসৃজন ঃ
অধ্যাপিকা সঙ্ঘমিত্রা লাহিড়ী
অধ্যাপক প্রাবৃট দাস মহাপাত্র

ঃ সম্পাদনা ঃ
অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী
ড. সুকুমার সেন

ঃ প্রধান সম্পাদক ঃ
অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

ঃ পুনর্মুদ্রণ সহায়তা ঃ
শুভ্রাংশু মৈত্র

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

FHS - 5, 6, 7 & 8

মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায়
5

জাতীয় সংহতি

একক 19	জাতীয় ঐক্যসংক্রান্ত সমস্যা ঃ ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার	9-28
একক 20	জাতীয় ঐক্যের সমস্যা, জাতপাত ও আদিবাসী	29-49
একক 21	জাতীয় ঐক্যের সমস্যা ঃ আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা	50-65
একক 22	বহুধর্মীয় সমাজ ঃ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি	66-85

পর্যায়
6

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

একক 23	ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি	87-98
একক 24	কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি	99-113
একক 25	ক্ষমতা হস্তান্তর	114-122
একক 26	গণতন্ত্র ও ভারতের অনগ্রসর শ্রেণি	123-133

পর্যায়
7

সামাজিক রূপান্তর

একক 27 সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি 137-147

একক 28 উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ 148-160

একক 29 ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান 161-186

একক 30 শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যম 187-203

পর্যায়
8

ভারতবর্ষ ও বর্তমান বিশ্ব

একক 31 স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বর্ণগত সমতা 205-221

একক 32 পারমাণবিক বিশ্বে শান্তির সমস্যা 222-229

একক 33 প্রতিবেশ (Eco-System) ও তার বিপদসমূহ 230-246

একক 34 বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশ 247-260

পর্যায় ৫ ঃ জাতীয় সংহতি

এই পর্যায় জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্য উৎসর্গীকৃত।

এই পর্যায়ের বিভিন্ন এককে জাতীয় ঐক্যের বিষয়বস্তুগুলি আলোচিত হয়েছে। ১৯নং এককটিতে দু'টি প্রধান সমস্যা, যথা, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এরই সঙ্গে এটাও দেখান হয়েছে যে, জাতীয় আন্দোলন কিভাবে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করছে। ব্রিটিশের 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' নীতি আইনসভায় এবং চাকরীতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সূচনা করেছিল। এই নীতি 'যোদ্ধা জাতের'ও প্রবক্তা ছিল।

● ২০ নং এককে জাতীয় ঐক্যের আর একটি সমস্যা, যথা, জাতপাত ও আদিবাসীদের সমস্যা আলোচিত হয়েছে। এই এককে আমাদের সমাজে জাতপাত ব্যবস্থার প্রভাব এবং এটি কিভাবে নির্বাচনী রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে তা উল্লেখিত হয়েছে।

● ২১ নং এককে আঞ্চলিক উন্নতি ও তার সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই এককে কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে আন্তঃ আঞ্চলিক বৈষম্য সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে এবং দেখান হয়েছে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আঞ্চলিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায়।

● ২২ নং এককে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এর অর্থ কী? এটির আচরণগত ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা যায়? এই এককে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে পশ্চিমী সমাজে এবং ভারতবর্ষে কী বোঝায় তাও বলা হয়েছে।

একক ১৯ ❑ জাতীয় ঐক্যসংক্রান্ত সমস্যা ঃ ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য
১৯.১ প্রস্তাবনা
১৯.২ জাতীয় ঐক্যের ধারণার বিবর্তন
১৯.৩ জাতীয় ঐক্যের উপাদানসমূহ
১৯.৪ ভারতে বৃটিশ শাসনের ভূমিকা ও তার প্রভাব
১৯.৪.১ ভারতীয় কৃষক
১৯.৪.২ আদিবাসীসমূহ
১৯.৪.৩ শিক্ষা ও সংস্কার
১৯.৪.৪ যোদ্ধাজাতি সংক্রান্ত ধারণা
১৯.৫ ইতিহাসের বিকৃতি
১৯.৬ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রাজনীতির উৎস
১৯.৬.১ আইনসভার প্রতিনিধিত্বে
১৯.৬.২ চাকুরীক্ষেত্রে
১৯.৬.৩ কৃষিসংক্রান্ত শ্রেণী সম্পর্কে
১৯.৬.৪ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে
১৯.৭ আঞ্চলিক ভাবপ্রবণতা ও অঞ্চলভিত্তিক আনুগত্যের বৃদ্ধি
১৯.৮ সারাংশ
১৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী
১৯.১০ উত্তরমালা

১৯.০ উদ্দেশ্য

জাতীয় ঐক্যের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণের জন্যই এই এককটি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাকেই জাতীয় ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় বলে এই এককে গণ্য করা হয়েছে।

এই এককটি পড়লে আপনি

- সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার ধারণা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- বিশেষ করে গত শতাব্দির ঘটনাবলীর মাধ্যমে এই ধারণা দু'টির বিবর্তন ধারার ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

- ভারতীয় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন কৌশল সম্বন্ধে এবং ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

১৯.১ প্রস্তাবনা

ভারত বিভিন্ন জনজাতি সমন্বিত একটি দেশ। বহু জনজাতি এদেশে রয়েছে। এগুলির আকার এবং প্রকারে যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন রয়েছে কোন বিশেষ এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র আকারের জাতি অথবা উপজাতি এবং ভাষা বা ধর্মভিত্তিক বৃহদাকারের জনজাতি। কোন বিশেষ জনজাতি যে অত্যন্ত প্রভাবশালী, তা নয় এবং বিভিন্ন জনজাতিকে একে অপর থেকে পৃথক করার মাপকাঠিও তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। এমতবস্থায় ভারতীয় ঐক্য সংক্রান্ত ধ্যানধারণা উপস্থাপনার সমস্যা যে যথেষ্ট কঠিন তা অস্বীকার করা যায় না। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত লেখাপত্রে জাতীয় সংহতির প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং এর উদ্দেশ্য হ'ল প্রত্যেকটি রাজ্যের সমস্ত মানুষকে একটি অভিন্ন পরিচিতির ভিত্তিতে আবদ্ধ করা এবং অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও কর্তব্য যাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় তার পথ প্রশস্ত করা।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু রাজনৈতিক সংহতির সঙ্গে সমার্থক নয়। কারণ, রাজনৈতিক সংহতির উদ্দেশ্য হ'ল কোন একটি রাজনৈতিক এককের (যেমন একটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) ভূখণ্ডগত সংহতিসাধন। উক্ত এককের কৃষ্টিকে ভারতের প্রধান অথবা কোন মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে একাকার করে ফেলা নয়। উপরোক্ত দু'টি দৃষ্টভঙ্গীর বৈধতার প্রশ্ন না তুলেও ওর্টা জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী এককভাবে অথবা যৌথভাবে কতটা আমাদের জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার সাহায্য করেছে ? কারণ এখন দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা, ধর্ম, জাতপাত, জনজাতি, অঞ্চল প্রভৃতি প্রশ্নে কায়েমি স্বার্থের কারণে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হতে বসেছে। এই এককে জাতীয় ঐক্যের কোণ থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার সমস্যার আলোচনা করা হবে।

১৯.২ জাতীয় ঐক্যের ধারণার বিবর্তন

একটা প্রশ্নে বিদ্বজ্জনমন্ডলীতে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। সেটি হ'ল এই যে, 'ভারত' বলতে কি ভারতে সমস্ত নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সার্বিক সভ্যতা বোঝায় ? 'ভারত' কী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্থে বাস্তব ? অথবা, 'ভারত' বলতে কি বোঝায় একটি বিশিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি সমন্বিত অঞ্চল ? ১৮৮০-এর দশক থেকে এই বিতর্কের সূচনা বেশ ভালভাবেই হয়েছে। জন ষ্ট্র্যাচি তাঁর 'ভারত' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে ভারত সম্পর্কে যা অবশ্য জানা উচিত তা হ'ল :

"ভারত' কোনদিন ছিলও না, নেইও। এমনকি ভারত নামক এমন একটি দেশের কথাও আমরা বলতে পারিনা। কারণ ইউরোপীয় ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপটে দেখলে ভারতের প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ধর্মীয় ঐক্য ছিল না।"

স্পষ্টত, ব্রিটিশরা ভারতে আঞ্চলিকতার উপরেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল। পক্ষান্তরে ডি. আর. ভান্ডারকর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এবং আরও অনেক জাতীয়তাবাদী লেখনগণ জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত ঐক্য সম্বলিত এক 'ভারত' ছিল এবং চিরদিনই রয়েছে। ভিন্‌সেন্ট স্মিথ তাঁর Oxford History

of India গ্রন্থে এই দুই মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতে রয়েছে 'ঐক্যের মধ্যে বহুত্ব'। জওহরলাল নেহরু ভারতের ঐক্যের স্বতন্ত্র ভিত্তির স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে স্মিথের এই উক্তির প্রয়োগ করেছেন।

১৯.৩ জাতীয় ঐক্যের উপাদানসমূহ

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার আগে আধুনিক অর্থে একটি জাতি হিসেবে ভারতের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দীর্ঘ ইতিহাস ভারতের রয়েছে এবং তার ফলে ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে এদেশের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের ধারণা শক্তিশালী হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্নিহিত কাঠামোর যে বিষয়গুলি ভারতকে একটি দেশ থেকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত হ'তে সাহায্য করেছে সেগুলি হল :

- ব্রিটিশরা সমস্ত ভারতীয় ভূখণ্ডকে একটি অভিন্ন প্রশাসন-ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এসেছিল।
- একটি অভিন্ন আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রচলনে ভারতের ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।
- রেলপথ, তারবার্তা ব্যবস্থা, আধুনিক ডাক-ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, মোটর চলাচল ব্যবস্থার মত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচলনে ভারতের ঐক্যসাধনের প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে একদিকে যেমন গ্রামীণ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বিনষ্ট হয়েছিল, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-ব্যবস্থার বৃদ্ধির ফলে জাতীয় চেতনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই জাতীয় চেতনা ভারতের ঐক্যের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারত। 'উঠতে পারত' এজন্য বলা হচ্ছে যে, ব্রিটিশ শাসন নিজের অজান্তে ভারতীয় ঐক্যের পথ সুগম করলেও ব্রিটিশরাজের স্বেচ্ছাকৃত 'বিভেদ-ভিত্তিক শাসনের' নীতির মাধ্যমে সযত্নে করেই সেই ঐক্যের ভিত্তিতে চিড় ধরানো হয়েছিল।

অনুশীলনী ১

১) নিম্নলিখিত উক্তিগুলির কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা X চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) জন স্ট্র্যাচি ভারতবর্ষকে বহুকাল ধরে বর্তমান এক জাতিরূপে বর্ণনা করেছেন।

(খ) সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ভারতবর্ষের।

(গ) ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান।

২) ভারতবর্ষ কি এক জাতি সেই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কদের মতামত কী ছিল ? পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর লিখুন।

....

....

....

....

....

১৯.৪ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা ও তার প্রভাব

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ব্রিটিশরা ভারতের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণকে নিজেদের স্বার্থেই কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি সবসময়েই এক ছিল না। ব্রিটেনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে ভারতেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, নীতি এবং এগুলির প্রভাব পরিবর্তিত হয়েছে।

১) ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে প্রশাসন, বিচার, পরিবহন ও যোগাযোগ, কৃষি অথবা শিল্পোৎপাদন এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বা চিন্তার জগতে কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি।

২) ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় পর্যায়েই দেখা গেল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর ঘটান হ'ল। পুরোন ব্যবস্থা অনুসরণ করে নূতন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করা, অর্থাৎ ব্রিটিশ পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষা করা, সম্ভব ছিল না। এজন্যই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় প্রশাসনে, অর্থনীতিতে ও সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর নীতি অবলম্বন করা হয়। এজন্যই নূতন নূতন আইন-কানুন সম্বলিত একটি নূতন ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই নূতন আইন-কানুনগুলির মধ্যে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) এবং দেওয়ানী আইন (Indian Civil Procedure Code) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নূতন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য অতিরিক্ত লোকজনের (ভারতীয়) প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেজন্যই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা হয় এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করা হয়। এসময়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদ এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসকবর্গের মধ্যে একটু উদারনৈতিক মনোভাবের উদ্ভব ঘটে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ স্বশাসনের বিষয়ে ভারতীয়দের তালিম দেওয়ার প্রশ্নে জল্পনা কল্পনার সূত্রপাত হয়।

৩) বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় পর্যায় মোটামুটি একই সময়ের ঘটনা। এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপান শিল্পোন্নত দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলেই বাজার এবং উপনিবেশ দখলের লড়াই সমস্ত পৃথিবী জুড়েই শুরু হয়। স্বভাবতই, এই পর্যায়ে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বন করে। অর্থাৎ স্বশাসনে ভারতীয়দের প্রশিক্ষণের ভাবনা-চিন্তা শিকেয় তুলে রাখা হয় এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন পাকাপাকিভাবে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে নূতন নীতি অবলম্বন করা হয়। এতে নিম্নোক্ত বিষয় দু'টি লক্ষ্য করা যায় :

(ক) ভারতে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার সূত্রপাতের ফলে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলশ্রুতিস্বরূপ ভারতে যে সামাজিক শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে, সেই শক্তি ব্রিটিশ ভারতের আধুনিকীকরণের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়।

(খ) সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভয়ে ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ (মূলতঃ ধর্মভিত্তিক) সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করে। কারণ, ব্রিটিশরাজের ধারণা হয়েছিল যে এ ধরণের বিভেদের নীতি কার্যকর করা গেলে ভারতে একটি সংহত এবং শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের সম্ভাবনাকে শুরুতেই খর্ব করা যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে ব্রিটিশরাজ ভারতকে সম্পূর্ণরূপে উপনিবেশে পরিণত করে। একটি শীর্ষস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে ব্রিটেনের উন্নয়ন এবং ভারতীয় অর্থনীতির অনুন্নত অবস্থা হাত ধরাধরি করেই এগোয়। বস্তুত, একে অপরের পরিপূরকই ছিল। ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ শিল্পপতি, ব্রিটিশ লগ্নী এবং অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের স্বার্থে রাজপ্রচলিত সমস্ত পদক্ষেপই ভারতকে একটি অত্যন্ত অনুন্নত ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পর্যবসিত করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপের মধ্যে যেটি ভারতীয় জনসাধারণকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করেছিল সেটি ছিল জমির খাজনা আদায় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা।

১৯.৪.১ ভারতীয় কৃষক

খাজনা আদায় ও জমির স্বত্বের স্থায়িত্বসংক্রান্ত যে দু'টি প্রধান ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল তার একটি ছিল জমিদারী প্রথা (পরবর্তীকালে খানিক পরিবর্তনসহ এটি মহাজনী ব্যবস্থা নামে পরিচিত হয়েছিল) এবং অপরটি ছিল রায়ত ব্যবস্থা।

উপরোক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও চাষীর সমৃদ্ধির কথা ভাবা হয়নি। এই দ্বৈত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, জমির স্বত্বাধিকারী এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টির কথা ভাবা হয়েছিল, যে শ্রেণী ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তির স্বার্থে ব্রিটিশরাজ নির্ভর হতে বাধ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে ভারতের উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

এই দুই ব্যবস্থাতেই বস্তুত ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের। জমিদারী প্রথার ফলে আগের খাজনাদায়ী কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিক হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা গ্রামীণ সমাজের শিরোমণি হয়ে বসেছেন এবং চাষীদের ইচ্ছামত প্রজা বানানো হয়েছে। তবে এই নতুন শ্রেণীর জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে প্রতি বৎসর যে কর আদায় করত তার একটা অত্যন্ত বড় অংশ ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হ'ত।

রায়ত ব্যবস্থায় সরকার সরাসরি চাষীদের থেকে খাজনা আদায় করত। যদিও চাষীরা ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিক ছিলেন, তবু অত্যন্ত উচ্চহারে খাজনা দিতে হ'ত বলে তাঁদের মালিকানা প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। উপরোক্ত দু'টি ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ সরকারই জমির আসল মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার সরাসরি কুফল হিসেবে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই মহাজনদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল এবং তাঁরা নিজেদের স্বার্থে বিচারবিভাগ ও প্রশাসনকে চোরাপথে প্রভাবিত করতেন। জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল। উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সেগুলি হ'ল - জমিদার, দালাল, মহাজন। এই শ্রেণীগুলির অবস্থান ছিল সমাজের উপরতলায়। সমাজের নীচুতলায় যে শ্রেণীগুলি আত্মপ্রকাশ করে সেগুলি হ'ল - প্রজা (যাঁদের জমিদাররা ইচ্ছা হলেই প্রজা বানাতে পারতেন), ভাগচাষী এবং জমিহীন কৃষিশ্রমিক। এতে করে শুধু যে শোষণ চরম পর্যায়ে পৌঁচেছিল তাই নয়, এর ফলে ভারতের গ্রামীণসমাজ খণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

১৯.৪.২ আদিবাসীসমূহ

ব্রিটিশ শাসন এবং কৃষিকে বাণিজ্যভিত্তিক করার নীতির ফলে বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে মহাজন, ব্যবসায়ী,

জমি দখলদারী এবং ঠিকাদারদের অনুপ্রবেশের প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এইসব লোকেরা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বাইরে সমতলভূমি থেকেই এসেছিল। আদিবাসী অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলনে আদিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ যথেষ্ট ছিল। তবে মহাজন, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতি শোষক শ্রেণীর অনুপ্রবেশের ফলে আদিবাসীদের নিরুদ্বেগ এবং সরল জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হওয়ায় আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এদের অনুপ্রবেশের কারণে আদিবাসীদের মধ্যে স্বভাবতই তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৮৭০-এর পর থেকে দেখা যায় যে, অধিকতর আয়ের স্বার্থে বনাঞ্চলগুলিকে কড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নিয়ে আসা হয়। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ১৮৬৭ সাল থেকেই ঝুমচাষ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রিত অথবা নিষিদ্ধ করা হয়। অথচ এ ধরনের চাষ ব্যবস্থায় লাঙল অথবা গরু-মহিষের প্রয়োজন পড়ত না বলে এর উপর আদিবাসীভুক্ত অত্যন্ত দরিদ্র মানুষদের প্রচণ্ড নির্ভরতা ছিল। কাঠ ও চারণভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে সরকার বনজ সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিবাদ করা সহজ ছিল না। অসীম সাহস এবং চরম ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত প্রতিবাদ সম্ভবও ছিল না। কারণ, এ ধরনের প্রতিবাদ দমনে প্রশাসন চূড়ান্ত দমন-পীড়নের পন্থা অবলম্বন করে। এ প্রসঙ্গে ১৮২০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত কোলবিদ্রোহ, ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৭৯ সালের রম্পা বিদ্রোহ এবং ১৮৯৫ থেকে ১৯০১ সালে মুণ্ডা বিদ্রোহ সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাই হোক, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে এদেশে বহুরকমের বিভাজন সৃষ্টি হয়। এ ধরণের বিভাজন ঘটে আঞ্চলিক অর্থে, সাম্প্রদায়িক অর্থে, উপজাতি ও অনুপজাতির অর্থে, উঁচুজাত-নীচুজাতের অর্থে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত অর্থে। স্পষ্টতই, এ ধরণের নানারকম বিভাজনের ফলে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মধ্যে ভারসাম্য সম্ভব ছিল না। যা সম্ভব ছিল তা হ'ল, চরম অসাম্য এবং অসমকক্ষতা। ভারতীয় সমাজে এরূপ বিখণ্ডীকরণজনিত অসাম্যের ফলে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ মোটেই সহজ ছিল না। স্বভাবতঃই, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের সাথে জাতপাত, লিঙ্গ ও ধর্মভিত্তিক প্রভেদ দূরীকরণের ভিত্তিতেই ভারতীয়দের আন্দোলন সামিল করা সম্ভব ছিল।

১৯.৪.৩ শিক্ষা ও সংস্কার

পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে আধুনিক ধ্যানধারণা ভারতে প্রবেশ করে এবং এর ফলে ভারতীয়দের চিন্তার জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে গণতন্ত্র, জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা, যুক্তিবাদ, মানবিকতাবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কিন্তু এটা চাননি। ১৮১৩ সাল থেকে ভারতে অত্যন্ত সীমিতভাবে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক ও সামাজিক শিক্ষা অবহেলার শিকার হয়। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষা ভারতে জাতীয়তাবাদ প্রসারের উৎস্বরূপ ছিল বলে পরবর্তীকালে ভারতীয়দের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ শাসককুল বৈরী মনোভাব পোষণ করে। ফলে উপনিবেশিক স্বার্থের কথা মনে রেখেই ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামো, প্রকৃতি, লক্ষ্য, প্রণালী এবং পাঠ্যবিষয় স্থির করা হয়। ঔপনিবেশিক চরিত্র সম্বলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার সারাংশ নীচে দেওয়া হল :

- আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার উন্নয়নে অবশ্য প্রয়োজনীয় কারিগরী শিক্ষা সর্বৈবভাবে অবহেলিত হয়।

- শিক্ষার মাধ্যমস্বরূপ ভারতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর ফলে, সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই এই ব্যবস্থার ফলে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের

উচ্চস্তরের লোক (এলিট) এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর সামাজিক, ভাষাগত এবং কৃষ্টিগত ব্যবধান সৃষ্টি হয়। শিক্ষার সুযোগ শহরবাসী মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়।

শুরুতে ঔপনিবেশিক প্রশাসন সমাজ-সংস্কারের কথা ভাবলেও পরে পিছিয়ে আসে। বস্তুতঃ এধরনের প্রশাসনের সহজাত রক্ষণশীলতা এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের কারণেই সমাজ-সংস্কারের কথা শেষ পর্যন্ত আর ভাবা হয়নি। শুধু তাই নয়, বৃটিশ প্রশাসন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল এবং অবক্ষয়ী ব্যক্তিদের সমাজ সংস্কার রোধের প্রচেষ্টায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করার নীতিই প্রশাসন অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, এধরনের রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯.৪.৪ যোদ্ধা-জাতি সংক্রান্ত ধারণা

ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্যের ফাটল ধরাতে ব্রিটিশরাজ অন্যান্য পথও বেছে নেয়। যেমন, ভারতের বিভিন্ন জাতিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়; যোদ্ধাজাতি এবং যোদ্ধা নয় এমন জাতিতে। ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ এবং বিভিন্ন বাহিনীর (রেজিমেন্ট) গঠন আঞ্চলিক বিবেচনার ভিত্তিতে করার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্যের বীজই বপন করা হয়। যেমন, পৌরুষ ও সাহসের অভাব এই অজুহাতে বাঙ্গালীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে টি.বি. ম্যাকিন্‌লি তাঁর Critical and Historical Essays নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> "শারীরিক শক্তির নিরিখে বাঙালীরা অত্যন্ত দুর্বল, এমনকি পৌরুষহীন। তারা সর্বক্ষণই হাঁসফাঁস করে, বসে বসে কাজ করাই তারা পছন্দ করে, তাদের হাত-পা নড়বড়ে এবং চলাফেরা ঢিলেঢালা। ইতিহাসের নানা যুগে বাঙালীরা তাদের থেকে আরও শক্তিশালী জাতিদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ছে। বাঙালীদের শারীরিক গঠন এবং তাদের পরিস্থিতি এমনই যে তাদের পক্ষে সাহসী স্বাধীনচেতা এবং সত্যবাদী হওয়া সম্ভব হয়নি।"

বলাই বাহুল্য যে, বাঙালীর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য বিদ্বেষের পরিচায়ক এবং সর্বৈব ভিত্তিহীন। এরূপ পক্ষপাতদুষ্ট ধারণার ভিত্তিতেই শিখ, জাঠ, রাজপুত এবং মারাঠা বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এর ফলে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী একটি (ভারতীয়) জাতীয় বাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি; বরং বিভিন্ন বাহিনী, বিভিন্ন অঞ্চল, জাত এবং সংকীর্ণ স্বার্থের প্রতিভূস্বরূপই বিবেচিত হ'ত। তবে পরিতাপের কথা হ'ল এই যে, স্বাধীনতার পরেও ব্রিটিশরাজ প্রচলিত এই জঘন্য নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে অত্যন্ত সাম্প্রতিককালে ব্রিটিশ প্রচলিত এধরনের নীতি পরিবর্তন করা যায় কিনা তা নিয়ে নূতন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগ থেকেই 'বিভাজনের ভিত্তিতে শাসনের নীতিই ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসননীতির মূলসূত্র ও সর্বব্যাপী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই নীতির ফল ছিল নিম্নরূপ :

ভারতীয়দের বিভিন্ন ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সর্বৈব পৃথক এবং সংহত গোষ্ঠী বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া, ভারতীয়দের বিভিন্ন সংকীর্ণ স্বার্থ ও জাতের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। শুধু তাই নয়, এরকম এক একটি গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শক্তিস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশরাজ প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতির প্ররোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে বাঙালী বনাম বিহারী বা বাঙালী বনাম পাঞ্জাবী বিরোধ উস্কে দেওয়া হয়। তাছাড়া ভাষা, জাত, কোন একটি জাতি যোদ্ধা অথবা যোদ্ধা নয় প্রভৃতির ভিত্তিতেও বীজ বপন করা হয়। অর্থাৎ,

ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিতে ব্রিটিশরাজ সমস্ত সম্ভাব্য পন্থাই অবলম্বন করেছিল।

অনুশীলনী ১

১) আদিবাসীদের উপর ভারতে ঔপনিবেশিক শাসক অনুসৃত নীতির প্রভাব আলোচনা করুন। দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২) নিম্নলিখিত উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল ? ✓ অথবা ✗ চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির ফলে ভারতে এলিট এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

(খ) 'বিভাজনের ভিত্তিতে শাসনের' নীতির কারণেই ভারতীয়দের যোদ্ধা নয় জাতিতে ভাগ করা হয়েছিল।

(গ) ভারতীয় ঐক্য সংহত করার স্বার্থেই ভারতীয়দের যোদ্ধাজাতি ও যোদ্ধা নয় এমন জাতিতে ভাগ করা হয়েছিল।

(ঘ) ব্রিটিশরাজ প্রাদেশিকতাকে উৎসাহিত করেছিল।

৩) ব্রিটিশরাজ সমাজ সংস্কারদের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল কেন ? পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

১৯.৫ ইতিহাসের বিকৃতি

ভারতীয় ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর উদ্দেশ্য সমস্ত সম্ভাব্য পথ ব্রিটিশরাজ অবলম্বন করে। ব্রিটিশরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে স্বৈরাচারী শাসকগণই চিরকাল ভারত শাসন করেছে। আসলে এধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্রিটিশরা বোঝাতে চেয়েছে যে :

প্রথমত, ব্রিটিশরাজ আইনের ভিত্তিতে শাসনের মাধ্যমেই সঙ্গতভাবেই স্বৈরাচারে লিপ্ত হতে পারত।

দ্বিতীয়ত, ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের ফলে হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।

ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনকালে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে বিভক্ত করার লক্ষ্যই ছিল পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বিভেদ ও পার্থক্য বৃদ্ধি করা। ভারতের ইতিহাসের এরূপ বিকৃত, ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এরূপ অপব্যাখ্যার কারণেই ভারতে ব্রিটিশ আমলে সাম্প্রদায়িক আদর্শের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল। স্কুলে ও উচ্চশিক্ষার স্তরে এই বিকৃত ইতিহাস পঠনপাঠনের কারণে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় ইতিহাসের সম্প্রদায়ভিত্তিক অপব্যাখ্যা প্রথম সাম্রাজ্যবাদী গ্রন্থকারগণ করেন। পরে অন্যরাও অনুরূপ অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে ভারতে মুসলিম শাসন সম্পর্কে এইচ্.এম্. ইলয়টের উক্তি উদ্ধৃত করা যাক :

> "ভারতে মুসলিম শাসন সম্পর্কে বলতে গেলে এটা বলতেই হয় যে, মুসলমানদের মত থেকে বিরুদ্ধ মত পোষণ করার জন্য হিন্দুদের খুন করা হয়েছে। হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা বন্ধ করা হয়েছে, তাঁদের দেবদেবীর মূর্ত্তি অপবিত্র করা হয়েছে, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, হিন্দু মেয়েদের বলপূর্বক মুসলমানরা বিবাহ করেছে, হিন্দুদের বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করান হয়েছে, হিন্দুদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং পাইকারী হারে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে। কামুক ও পানাসক্ত অত্যাচারী মুসলমান শাসকবর্গ হিন্দুদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অত্যাচার উপভোগই করতেন।"

ইলিয়ট অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, এসব লেখার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গ্রহণযোগ্যতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে ভারতীয় প্রজাদের প্রভাবিত করা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবিদের প্রাক-ব্রিটিশ যুগের অর্থাৎ মুসলমান শাসনের রূঢ় বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা ও তাঁদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমালোচনা থেকে নিরস্ত করা।

তবে পরিতাপের কথা এই যে, অনেক ভারতীয় ইতিহাসবিদ সচেতন অথবা অ-সচেতনভাবে তাঁদের ইতিহাস চর্চায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা অনুসরণ করেছেন এবং তাঁরা তথ্যভিত্তিক ইতিহাসচর্চা বর্জন করে ব্রিটিশদের চোখেই ভারতে মুসলিম শাসন অবলোকন করেছেন অথবা হিন্দু শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খার জয়গান গেয়েছেন। উদাহরণস্পরূপ, স্যার যদুনাথ সরকারের লেখা (হিস্ট্রি অব আওরঙজেব, অষ্টম খণ্ড) থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক :

> "সমস্ত অমুসলিমদের ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করা এবং সমস্তরকমের বিরুদ্ধ মত গুঁড়িয়ে দেওয়াই ভারতে মুসলিম শাসনের লক্ষ্য ছিল। সমাজে যদি কোন ইসলামধর্মে অবিশ্বাসীর অস্তিত্ব নিরূপায় হয়েই স্বীকার করা হ'ত, তবে মুসলমানশাসিত সমাজে অমুসলমানদের অস্তিত্ব চিরকালীন নয় বলেই ধরে নেওয়া হ'ত। অতএব এঁদের ধর্মান্তরিত করা উদ্দেশ্য এঁদের ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট নানারূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার

সম্মুখীন হতে হ'ত। এবং এঁদের ধর্মান্তরণের পথ সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে রাজকোষ থেকে অর্থব্যয়ের মাধ্যমে এঁদের জন্য নানারূপ প্রলোভন সৃষ্টি করা হ'ত।"

অনুরূপভাবে এ.এল. শ্রীবাস্তব তাঁর 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ১০০০-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ' গ্রন্থে লিখেছেন :

"ভারতেও মুসলমানরা যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে দখল করার তুর্কী নীতি অবলম্বন করেছিল। এঁদের শাসন সাড়ে তিনশত বৎসর ধরে চলেছে এবং সেসময়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে খুন করা হয়েছে, যুদ্ধের পর লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু-নারী ও শিশুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং অনেককে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হয়েছে। ভারতে মুসলিম শাসনকালে হিন্দুরা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। মুসলমান শাসনে তাঁরা যে শুধু শাসক, মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষের পদ হারিয়েছিলেন, তাই নয়, তাঁরা মুসলমানদের ঘৃণার শিকার হয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে এরকম বিকৃত ইতিহাস শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে তখনও অনেকে অবহিত ছিলেন। গান্ধীজী বলেছেন যে, স্কুল এবং উচ্চশিক্ষাস্তরে এধরণের বিকৃত ইতিহাসের পঠন-পাঠন চলতে থাকলে ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন কখনই সম্ভব হবে না। ১৯৩২ সালে দানাপুরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের 'মুখবন্ধ' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত উদ্ধৃত করা যাক :

"ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার স্বার্থে এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের স্বার্থে অতীত সম্পর্কে যথার্থ ধারণা অবশ্য প্রয়োজন। অতএব একথা অনস্বীকার্য যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের পথে ইতিহাসের পথে ইতিহাসের বিকৃতি দূরীকরণই প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।"

ইতিহাসের সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির উপর এর অশুভ ছায়াপাত ঘটেছিল।

অতএব দেখা যায় যে, এখনও কিছু কিছু বিশ্লেষক এবং রাজনীতিক মনে করেন যে, ভারতের বর্তমানকালের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উৎস অতীতের ইতিহাস ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। তাঁরা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এই বীজ ভারতে মুসলিম শাসনকালেই বপন করা হয়েছিল। এটা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা অতীতের অবদান নয়। অধ্যাপক বিপানচন্দ্র বলেছেন :

"সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শ বর্তমানকালেরই। তবে অতীতের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং ইতিহাস থেকে কিছু কিছু উপাদান এর মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই বর্তমানকালের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আলোচনার রীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী স্থির করা হয়েছে।"

১৯.৬ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রাজনীতির উৎস

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবণতা এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ সম্পর্কে সুপ্ত ধারণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং যেটুকু পারস্পরিক সদিচ্ছা ছিল তা নূতন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আবর্তে হারিয়ে যায়। অতএব দেখতে পাই

যে, সবচেয়ে বড় বড় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছে এই শতাব্দির প্রথমার্ধে (১৯০৬-৭, ১৯১৮, ১৯২৬ ও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে)।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। বিপানচন্দ্রের মতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা মাঝে মাঝে জাগ্রত হয়ে থাকে এবং তাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, এবং এতে মধ্যবিত্ত ভূস্বামীগণ এবং আমলারা লিপ্ত হয়ে থাকেন। তবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রাজনীতি বিযুক্ত নয়। কারণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জনক। গত একশ বৎসরের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফসল হ'ল সাম্প্রদায়িকতা বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে।

ব্রিটিশরাজও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভাজনের নীতি অনুসরণ করেছে। এটা ঠিক নয় যে, মুসলিম শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য ও উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু সে উত্তেজনা ও মতপার্থক্য ছিল মূলত শ্রেণীগত। সেই পার্থক্য শাসক ও শাসিত শ্রেণীর, উৎপাদক ও যারা ভোগ করতেন তাঁদের, ভূস্বামী ও প্রজার। এর প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

হিন্দু ও মুসলমানরা চিরকালই একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একই ধর্মবিশ্বাস দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দেখা যায়; যেমন, সত্যপীর, মানিকপীরের ভক্ত দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই ছিল। অনেক মুসলমান কবি ছিলেন যাঁরা বৈষ্ণবধর্ম নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে সৈয়দ মুর্তজা, চাঁদ কাজী সানুর ও লাল মহম্মদ অন্যতম। কিছু মুসলমানের মধ্যে হিন্দুদের দেবদেবী সম্পর্কে ভক্তি ছিল। মীরজাফরের মৃত্যুর সময় তিনি 'মুক্তির' আশায় দেবী কীরিটীশ্বরীর চরণামৃত পান করেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারই তাঁকে ঐ চরণামৃত পান করান। আবার একথাও ঠিক যে, ভারতে ব্রিটিশযুগে দেশের প্রতি আনুগত্যের চেয়েও ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রাধান্য পেয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা যায়।

১৯.৬.১ আইনসভার প্রতিনিধিত্বে

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে আইনসভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ব্রিটিশরাজের প্রশ্নে ব্রিটিশরাজের নীতির ভূমিকা সমধিক। ১৯০৯ সালের আইনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী স্থির করা হয়েছিল। এর তাৎপর্য অবহেলা করা যায় না। এই আইনের ফলে মুসলমানরা তাঁদের জন্য পৃথকীকৃত নির্বাচনক্ষেত্রে তাঁদের ইচ্ছামত প্রার্থীকে (প্রার্থীর ধর্ম যা-ই হোক) ভোট দিতে পারতেন, আবার সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গেও ভোট দিতে পারতেন। ১৯১৯-এর আইনে এই অবস্থার আরও অবনতি হয়। কারণ এক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু ভোটার তাঁদের পৃথক নির্বাচনক্ষেত্রে শুধু তাঁদের নিজেদের ধর্মাবলম্বী প্রার্থীদেরই ভোট দিতে পারতেন। ১৯৩০ সালের সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনের ফলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়, কারণ এই প্রতিবেদন বিভিন্ন আইনসভায় সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের উপর এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচনক্ষেত্র সংরক্ষণের নীতির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। নির্বাচন প্রথায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের গুরুত্ব আরোপ (weightage) এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ব্রিটিশরাজ প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার অন্যান্য অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল।

এ ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলনের পিছনে দু'টি মৌল ধারণা কাজ করেছে :

(ক) ব্রিটিশরাজের ধারণা ছিল এই যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ ভিন্ন

ছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ তাঁদের নিজেদের ধর্মালম্বী প্রতিনিধিরাই রক্ষা করতে পারতেন।

(খ) সংরক্ষণ ব্যবস্থা বর্জিত সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হ'ত। এবং তা শুধু আইনসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেই নয়, উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ পরিকল্পিতভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংরক্ষিত নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচনক্ষেত্র ও আইনসভা সাম্প্রদায়িক বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ছিল।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রণালীই শেষ কথা ছিল না। নির্বাচকদের সম্পত্তিগত ও শিক্ষাগত মাপকাঠিও নির্বাচনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ফলে, নির্বাচনাধিকার মূলত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমবদ্ধ ছিল এবং এর ফলে, মধ্যবিত্তের স্বার্থ ও রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন, ১৯৩২ সালের গোড়ায় র‍্যামেজে মাক্‌ডোনাল্ড প্রচলিত ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্বাচকমন্ডলীকে হিন্দু, অস্পৃশ্য ও মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক পৃথক ভাবে ভাগ করা হয়েছিল (হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা প্রচলনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু নির্বাচনক্ষেত্রগুলির মধ্যেই তিনি অস্পৃশ্যদের (গান্ধীজী এঁদের 'হরিজন' বলতেন) জন্য বেশী আসন সংরক্ষণের দাবী জানিয়েছিলেন। এভাবেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত নির্বাচন ব্যবস্থায় সংশোধন করা হয়।

১৯.৬.২ চাকুরীক্ষেত্রে

ঊনবিংশ শতাব্দির শেষদিকে তিনটি প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত চাকুরীর প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়। সুফিয়া আহমেদ একটি সমীক্ষায় দেখান যে ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলায় ১৫ টাকা থেকে ১০০০ টাকা বা তদূর্ধ বেতনক্রমে চাকুরীরত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১,২৩৫। পক্ষান্তরে অনুরূপ বেতনক্রমে চাকুরীরত হিন্দু ছিলেন ৮,২৬২। এমনকি মুসলমানপ্রধান পূর্ববাংলায়ও চাকুরীতে ও চাকুরীর সাথে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে চাকুরীক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের নীতির প্রতিফলন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯.৬.৩ কৃষিসংক্রান্ত শ্রেণী সম্পর্কে

জমিদার ও প্রজাদের বিরোধের প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রকট ছিল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ) এটা ঘটেছিল। পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ জমিদার হিন্দু ও অধিকাংশ প্রজা মুসলমান ছিলেন। ১৯০১ সালে আদমসুমারীতে দেখা যায় যে প্রতি দশ হাজার মুসলমানের মধ্যে ৭,৩১৬ জন কৃষিতে লিপ্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে প্রতি দশ হাজার হিন্দুর মধ্যে ৫,৫৫৫ জন কৃষিতে লিপ্ত ছিলেন। আবার প্রতি দশ হাজার মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ১৭০ জন ভূস্বামী ছিলেন, পক্ষান্তরে অনুরূপ ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২১৭। ব্রিটিশ প্রশাসন ইচ্ছা করেই জমিদার-প্রজা সম্পর্কের অবনতির পথ প্রশস্ত করেছিল।

১৯.৬.৪ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে

ইংরাজী-মাধ্যমভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যে সাংস্কৃতিক পরিবৃত্ত গড়ে উঠেছিল। তার

ফলেও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ব্রিটিশরাজকে মুসলিম অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুদের ত্রাতাস্বরূপ দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রের কার্যকলাপের মাধ্যমেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান বিস্তর বিভেদ আরও বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশরাজ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় ইন্ধন জুগিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, এই প্রশাসন সমাজে জাতপাতের বিভেদও বাড়িয়ে তোলে। যে কোন একটি বিশেষ জাতের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধিতেও প্রশাসন সচেষ্ট ছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে জমির সহজলভ্যতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে একজাতের লোকজন অন্যত্র চলে গিয়ে অন্যজাতের লোকেদের সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারত। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এ ধরনের সুযোগ প্রায় আর ছিল না। একই সঙ্গে যুক্তপ্রদেশের (UP) ছোটলাট হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান করেন। তিনি প্রচুর হিন্দুকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করেন এবং হিন্দী ভাষার প্রবক্তাদের সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে উর্দু অবহেলিত হয়। এর ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ আরও তীব্র হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবে সরকারী চাকুরীতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণব্যবস্থা দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়। ১৯৩৪-এ এই সংরক্ষণ নীতি সমস্ত প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় (সরকারী) চাকুরীর ক্ষেত্রেই প্রবর্তন করা হয়। এই নীতি বিভিন্ন পেশাদারী শিক্ষাক্রম ও সরকারী কলেজের ভর্তির ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে পৌরকমিটি, জেলা শিক্ষাপর্ষদ, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় গোষ্ঠী পরিচালিত বিদ্যালয় (denominational school) প্রভৃতির সবিশেষ ভূমিকার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

শুধু সরকারী চাকুরী ও শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধিকালে ব্রিটিশরাজ অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করে। এর মধ্যে সরকারী ঠিকা ও খেতাব বিতরণ, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ, পৌর-প্রতিষ্ঠান ও আইনসভাগুলিতে মনোনয়ন উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ যাঁরা ছড়িয়ে বেড়াতেন ব্রিটিশরাজ তাঁদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই নেয়নি, অথচ পুলিশ প্রতিবেদন ব্যবস্থা ও গুপ্তচর ব্যবস্থার কোন ঘাটতি ছিল না। জাতীয়তাবাদীদের দমনের জন্য এবং জনসাধারণের যথার্থ দাবি-দাওয়া যাতে ঠিকমত জনসমক্ষে তুলে ধরা না যায় সেজন্য সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও বিভিন্ন ধরনের দমন আইনের ব্যবহার যথেষ্টই করত। অথচ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যাঁরা ছড়িয়ে বেড়াতেন সরকারী দমনযন্ত্র কখনই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হ'ত না। পক্ষান্তরে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের মালিকানাধীন এবং ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংবাদপত্র থেকে উৎসাহ পেয়ে থাকতেন। এই অবস্থাকে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ঘৃতাহুতির নামান্তর বলা চলে। ইংরাজী শিক্ষার কারণে সীমিত সংখ্যক (যদিও পরিবর্ধমান) লোকের সামাজিক উচ্চাকাঙ্খার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। এর ফলেও সমাজে বিভেদ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, ১৯০১ সাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন জাতভুক্ত লোকেদের আদমসুমারী (caste census) প্রচলিত হয়। এভাবে বিভিন্ন জাতের অবস্থান (কোন্ জাত কতটা উঁচু বা নীচু) সম্বন্ধে ভারতীয় জনমানসে বিদ্যমান ধ্যানধারণাকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়। এর ফলে বিভিন্ন জাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ জাতভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তাঁদের স্ব-স্ব জাতের ইতিহাসকে কাল্পনিক গরিমাযুক্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। এর উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের জাতের জন্য প্রাধান্য বিস্তার করা। এই প্রচেষ্টায় সফল নেতৃবর্গ তাঁদের নিজেদের জাতের লোকেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধিকল্পে সংগঠিত করায় ব্যাপৃত হন। নিজেদের জাতের জন্য সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়াও রাজনৈতিক অনুগ্রহ, সরকারী চাকুরী লাভ এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে প্রচলিত ব্যবস্থার কারণে

এরূপ জাতভিত্তিক সংগঠন ও আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী ৩

(১) ভারতের ইতিহাস বিকৃত করার জন্য ব্রিটিশদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দশ লাইনের মধ্যে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(২) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পার্থক্য নির্ণয় করুন। পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

(৩) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ব্রিটিশরাজ কেন এবং কীভাবে করেছিল ? দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১৯.৭ আঞ্চলিক ভাবপ্রবণতা ও অঞ্চলভিত্তিক আনুগত্যের বৃদ্ধি

ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি বিংশ শতাব্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কখনো কখনো এ ধরনের ভাবপ্রবণ মানসিকতার উদ্দেশ্য ছিল বঞ্চিত অথচ শিক্ষিত যুবাগোষ্ঠীর জন্য সরকারী চাকুরীর অভীপ্সা। তবে বহুক্ষেত্রেই এগুলি আঞ্চলিক ভাষাভিত্তিক সাহিত্য ও কৃষ্টিকেন্দ্রিক প্রাদেশিকতার চালিকাশক্তিস্বরূপ কাজ করত (সুমিত সরকার, মডার্ণ ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৪৮)।

১৯১১ সাল নাগাদ মাদ্রাজের তেলেগু অধ্যুষিত জেলাগুলি নিয়ে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবীতে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৩ সাল থেকে বার্ষিক অন্ধ্র সম্মেলন বা অন্ধ্র মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের সম্মেলনে অন্যান্য দাবীর সঙ্গে মাতৃভাষার (তেলেগু) মাধ্যমে শিক্ষার দাবীও উত্থাপিত হয়। যদিও শুধু অন্ধ্র অঞ্চল থেকেই ভাষাভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবী করা হয়, তবু উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের ফলে নানাবিধ প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যেমন, তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলনের ফলে ঐ প্রদেশের বিভিন্ন শহরে শুধু 'তামিল সঙ্গম'ই প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, এর ফলে প্রাচীন তামিল মহাকাব্য অধ্যয়নে সমধিক আগ্রহ সৃষ্টিও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলায় ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আন্দোলনের সময় থেকেই আঞ্চলিক ঐক্যের ও অঞ্চলভিত্তিক চেতনার প্রসার ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষার সাহিত্যপোযোগী সমৃদ্ধি সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের ফলে বাঙালীদের মধ্যে কেবল আঞ্চলিক গর্বই সঞ্চারিত হয়নি, তাঁদের মধ্যে আঞ্চলিক চেতনারও উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে।

বিহারে সচ্চিদানন্দ সিংহের নেতৃত্বে পৃথক প্রদেশের দাবীর ফলস্বরূপ ১৯১১ সালে স্বতন্ত্র বিহার ও ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হয়। এই আঞ্চলিক চেতনা কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই এই চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য অবশ্য বিটিশ প্রশাসনের অতিকেন্দ্রিকতা দায়ী। এ ধরণের অতিকেন্দ্রিকতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মোগল আমলে প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণ শুরু হলেও বিজাপুর, গোলকোন্ডা, বিহার, ওড়িশা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ প্রভৃতির আঞ্চলিক সত্তাকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। পক্ষান্তরে, ব্রিটিশরাজ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার মত বড় বড় প্রেসিডেন্সি স্থাপন করে বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীর উপর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আঞ্চলিক চেতনা তীব্র হয়ে ওঠে এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আঞ্চলিক চেতনা তীব্র হয়ে ওঠে এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবিও শক্তিশালী আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে একথা

অনস্বীকার্য যে, এ ধরণের প্রাদেশিক দাবী-দাওয়া জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারার পরিপন্থী ছিল না। বিশেষ করে, সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপটে দেখাতে গেলে একথা বলতে হয় যে, ব্রিটিশরাজ 'বিভাজনের ভিত্তিতে শাসনের' নীতি নানাভাবে বাস্তবায়িত করে ব্রিটিশ প্রশাসকরা মুসলমানদের পৃথক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়রূপে গণ্য করার নীতি অবলম্বন করে। যে ধারণার বশবর্তী হয়ে ব্রিটিশরা এই নীতি অবলম্বন করে তা হ'ল এই যে, ভারতীয় জনসাধারণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং ইউরোপে জাতি (nation) বলতে যা বোঝায় ভারতের ক্ষেত্রে তা' হ'ল ধর্ম। ব্রিটিশরাজ এ-ও ধরে নিয়েছিল ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তাদের স্বার্থ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিকে এভাবে (ধর্মীয়) সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেই বৃটিশরাজ ক্ষান্ত থাকেনি, ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক পর্যায় থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত ব্রিটিশরাজ এরকম ব্যাখ্যা প্রচার করেছে এবং এই ব্যাখ্যা ভিত্তিতেই শাসনযন্ত্র পরিচালিত করেছে।

হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ১৯৩০ সালের সাইমন কমিশনের বক্তব্য এইরকম : "হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মৌল বিরোধ রয়েছে এবং এই বিরোধের প্রতিফলন তাঁদের সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা, তাঁদের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় রেষারেষিতে ঘটেছে।" অতএব ব্রিটিশরাজ সঙ্গত কারণেই হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থের কথা ভেবেছে এবং অনুরূপ ভাবনার ভিত্তিতেই আইনসভা গঠনে ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

জাতীয় আন্দোলন অবশ্য দুর্বল হয়ে পড়েনি। কখনো কখনো বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রসঙ্গ জাতীয় স্তরে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রশ্ন কেবল একটি আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবেই বিবেচিত হয়নি। অবশ্য ঐ সময়ে বাংলা জাতীয় আন্দোলনের পুরোধায় ছিল। সমস্ত ভারতের জনসাধারণই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনের মূল শক্তিকে চূর্ণ করার ফন্দি এঁটেছিল। ফলে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতই সোচ্চার হয়ে ওঠে।

এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে। ভারতবাসীরা জাতীয় আন্দোলনের থেকে আঞ্চলিক দাবীদাওয়াগুলিকে বেশী গুরুত্ব দিলে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারত ক্ষোভে ফেটে পড়ত না। অথচ, ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে শুধু পাঞ্জাবীদেরই নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন আশাতীতভাবে সফল হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ও জনসমর্থন ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকেই পাওয়া গেছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন যে গ্লানিময় ঐতিহ্য রেখে গেছে, তাতে করে জাতীয় ঐক্যের ভিত গড়ে তোলা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তবে আশার কথা এই যে, ব্রিটিশরাজ বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে ইন্ধন জোগালেও স্বাধীন ভারত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের নীতির মাধ্যমে জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত করায় সচেষ্ট হয়েছে। এ কাজটি অবশ্য সহজ নয় এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের পথ মোটেই মসৃণ নয়। ভারতের সমস্ত অঞ্চলের সুষম অর্থনৈতিক বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারতের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে ছোট ছোট রাজ্য এবং ভারতের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত বড় বড় রাজ্যগুলির মধ্যে বৈষম্য দূর করার স্বার্থেই এটা দরকার। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের স্বার্থে সবার জন্যই শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত। কোন একটি বিশেষ ভাষাকে সবার উপরে চাপিয়ে দেওয়া কাম্য নয়, বরং ভারতের হিন্দী ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির চর্চায় উৎসাহ দেওয়া দরকার। আবার, দক্ষিণ ভারতেও হিন্দী ভাষার চর্চা হওয়া দরকার। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও একে অপরের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মানিয়ে চলার মাধ্যমেই ভাষাজনিত বিভেদ

দূর করা সম্ভব। বলপূর্বক কোন একটি ভাষা সকলের উপর চাপিয়ে দিলে তার প্রতিক্রিয়াও হবে সাংঘাতিক। তাতে করে জাতীয় সংহতিরই সমধিক ক্ষতি হবে। ভারতের সরকারই জাতীয় ঐক্যের অতন্দ্র প্রহরী। এজন্য ভারত সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক, সংকীর্ণ গোষ্ঠীভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক, জাতভিত্তিক বা অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে কেউ যেন নির্বাচনে ফায়দা তোলার মত ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের কারণে উৎসাহদান না করতে পারে। এজন্য ভারতের সমস্ত নাগরিক শিশুকাল থেকেই যাতে জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হন সে চেষ্টায় আমাদের ব্রতী হতে হবে।

অনুশীলনী ৪

(১) ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি কিভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে উৎসাহ প্রদান করেছে ? দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(২) আঞ্চলিক সত্তাসমূহের উদ্ভবকে জাতীয় আন্দোলনের দিক থেকে কীভাবে দেখা হয় ? পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(৩) আঞ্চলিক ও ভাষাগত পৃথক সত্তাগুলি কিভাবে জাতীয় মূল স্রোতের মধ্যে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

১৯.৮ সারাংশ

এই এককে ভারতে জাতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায়স্বরূপ কিছু সমস্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এবং এটাও বোঝা গেছে যে, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতা এই সমস্যাগুলির অন্যতম। আমরা আরও দেখেছি, ব্রিটিশ শাসন কিভাবে সে সময়ে সুপ্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে উস্কানি দিয়ে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে এবং কীভাবে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক প্রবণতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এক কথায়, ব্রিটিশরাজ বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের নীতিকে অনুসরণ করে লাভবান হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার প্রবণতা স্বাধীন ভারত উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছে। ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশ ও তজ্জনিত সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যার ফলে সাম্প্রতিককালে এ ধরণের প্রবণতার কাঙ্খিত বিবর্তন হয়নি।

কোন একটি সমাজের বিকাশ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক আলোড়নও দেখা দেবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে করে যদি জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট নয় এবং দেশের ভূখণ্ডগত সংহতি বিপন্ন হয়, তবে সেটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতির ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করার স্বার্থে উপযুক্ত নীতি অবলম্বন করতে হবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ বন্ধ করতে হবে। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষদের সমবেত করার কর্মসূচী গ্রহণ করলে জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত হবে।

১৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Wallace, Paul (ed.) : Region and Nation in India, New Delhi.

Sarkar, Sumit : Modern India 1885-1947, New Delhi.

Chandra, Bipan : Communalism in Modern India, New Delhi, 1984.

১৯.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) (ক) x

(খ) ✓

(গ) ✓

২) ১৯.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন। জাতীয়তাবাদী লেখকরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতেরও ঐক্য ছিল। আপনার উত্তরে তা থাকা দরকার।

অনুশীলনী ২

১) ১৯.৪.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) সরল আদিবাসী জীবনযাত্রায় বহিরাগতদের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ।

(খ) সংরক্ষিত বনাঞ্চল প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ঝুমচাষের উপর বিধি-নিষেধ।

(গ) বনজ সম্পদ পূর্বে আদিবাসীরা ভোগ করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বনজ সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

(ঘ) উপজাতি বিদ্রোহ

২) (ক) ✓

(খ) ✓

(গ) x

(ঘ) ✓

৩) ১৯.৪.৩ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকে হবে :

(ক) ব্রিটিশরাজ কর্তৃক প্রচলিত সংস্কারের সীমিত চরিত্র।

(খ) উপনিবেশবাদের রক্ষণশীল প্রকৃতি।

(গ) স্বীয়শক্তি বৃদ্ধির স্বার্থে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলিকে ব্রিটিশরাজের সমর্থন।

অনুশীলনী ৩

১) ১৯.৫ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) এমন ধারণার উদ্রেক করা যে, ভারত চিরকালই স্বৈরাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে।

(খ) অতীতেও যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ছিল তার উপর জোর দেওয়া।

(গ) ভারতে হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালের পৃথকীকরণ।

২) ১৯.৬ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার স্বল্পমেয়াদী চরিত্র এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দীর্ঘমেয়াদী চরিত্র।

(খ) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকজন লিপ্ত থাকেন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে প্রধানত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন লিপ্ত হয়ে থাকেন।

(গ) সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাতে সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শের ভূমিকা।

৩) ১৯.৬.১ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) ভারতের জনসাধারণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত। এরূপ ব্রিটিশ ধারণার ভূমিকা।

(খ) বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের নীতি। কেন ব্রিটিশরাজ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক পৃথক নির্বাচনক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং কেন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নানা ধরনের সুযোগসুবিধা দান করত সেসবের ব্যাখ্যায় 'বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের' নীতির ভূমিকা।

অনুশীলনী ৪

১) ১৯.৭ অনুচ্ছেদটি ৫-এ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের নীতির ভূমিকা।

(খ) ব্রিটিশ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সমাজের ব্যাখ্যা।

(গ) যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির বিরোধিতা করেছেন ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁদের নির্মমভাবে দমন করেছেন। যেমন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের দমন।

২) ১৯.৭ অনুচ্ছেদটি (তৃতীয় অংশ) দেখুন। আপনাকে দেখাতে হবে কী করে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল :

(ক) বঙ্গভঙ্গ।

(খ) ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসনিক পুনর্গঠন।

(গ) কিভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

৩) ১৯.৭ অনুচ্ছেদটির সর্বশেষ অংশ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভূমিকা।

(খ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দূরীকরণ।

(গ) বিভিন্ন ভাষার উন্নয়ন এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সহযোগিতামূলক বোঝাপড়া।

(ঘ) বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিভেদকামী প্রবণতা অথবা কৃষ্টিগত পার্থক্য যাতে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কেউ কাজে লাগাতে না পারেন সে বিষয়ে স্বাধীন ভারতের সরকারের নজর রাখা।

(ঙ) বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির প্রতিরোধে শিক্ষার ভূমিকা।

একক ২০ ❑ জাতীয় ঐক্যের সমস্যা, জাতপাত ও আদিবাসী

গঠন

২০.০ উদ্দেশ্য

২০.১ প্রস্তাবনা

২০.২ জাতপাত ব্যবস্থা

২০.৩ ঔপনিবেশিক আমলে জাতপাত ব্যবস্থা

২০.৩.১ জাতপাত প্রসঙ্গে ব্রিটিশ নীতি : বিখণ্ডায়নের স্বরূপ

২০.৩.২ ব্রিটিশ শাসনে সমাজ-সংস্কার ব্যবস্থা

২০.৩.৩ জাতপাত সচেতনতা ও সংস্কৃতায়ন

২০.৪ স্বাধীন ভারতে জাতপাত

২০.৪.১ জাতপাত ও নির্বাচনী রাজনীতি

২০.৪.২ জাতপাতের রাজনীতিকরণের ফলাফল

২০.৫ আধুনিকীকরণ, জাতীয় সংহতি এবং জাতপাত

২০.৬ আদিবাসী সংস্কৃতি : বিবিধ রীতি ও সমস্যা

২০.৬.১ ভারতবর্ষে আদিবাসী জনসংখ্যা

২০.৬.২ আদিবাসী গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য

২০.৬.৩ আদিবাসী ভাষাসমূহ

২০.৬.৪ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ও আদিবাসী

২০.৬.৫ আদিবাসী কৃষকদের সমস্যা

২০.৭ নগর পরিমণ্ডলে আদিবাসী

২০.৭.১ শিল্পায়ন ও আদিবাসিত্ব হনন

২০.৭.২ মুদ্রা প্রচলন ও শিক্ষার প্রসার

২০.৭.৩ আদিবাসী মানুষদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন

২০.৮ ভারতে আদিবাসীদের বিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

২০.৮.১ সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

২০.৮.২ আত্তীকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

২০.৮.৩ সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী

২০.৯ সারাংশ

২০.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২০.১২ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ হতে পারে :

- জাতপাত ব্যবস্থার ব্যাখ্যা এবং ঔপনিবেশিক ও স্বাধীন ভারতে তার রাজনীতিকিরণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ।
- জাতপাত ব্যবস্থার রাজনীতিকিরণ ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সামাজিক ফলাফলের বর্ণন।
- ভারতবর্ষের আদিবাসীদের বিচিত্র সাংস্কৃতিক রীতি এবং তাদের নানা সমস্যার অনুধাবন।
- আদিবাসীদের সমাজ জীবনে নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবগুলি সনাক্তকরণ।
- জাতীয় জীবনে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত নানা দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ।

২০.১ প্রস্তাবনা

এই অংশটি শুরু হচ্ছে ভারতের জাতপাত ব্যবস্থার বর্ণনার মাধ্যমে। এখানে জাতপাত-ব্যবস্থাগত অসাম্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে; ঔপনিবেশিক আমলের জাতপাত-আদর্শ এবং স্বাধীনতা-উত্তর নির্বাচনী রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া এখানে তপশীলভুক্ত জাত ও অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তদের নানা ধরণের ক্ষোভ-প্রতিবাদের কথা এবং তার প্রকাশ হিসেবে বিভিন্ন জাতপাত সংক্রান্ত আন্দোলনের কথা আলোচিত হয়েছে।

আদিবাসীদের নানাপ্রকার জাতিগোষ্ঠীগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক চালচিত্রের কথা এই এককের দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে। পরিবেশগত ভারসাম্যের অভাব, ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা, ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি সমস্যাও এই এককে আলোচিত হয়েছে। আদিবাসী সমাজে নগরায়নের ফলে সমাজ পরিবর্তনজনিত ফলাফলগুলি আলোচিত হয়েছে। সব শেষে, আদিবাসী সমাজের বিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যালোচনা হয়েছে।

২০.২ জাতপাত ব্যবস্থা

জাতপাত হ'ল বৈষম্যসৃষ্টিকারী ব্যবস্থা। জন্মগত অবস্থান ও পেশার কলুষতা এবং বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে জাতপাত ব্যবস্থাকে সমর্থন জানানো হয়। জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেবল যে সম্পদগত, উপার্জনগত ও ক্ষমতাগত বৈষম্য রয়েছে তা নয়, কোন কোন গোষ্ঠীর অধিকতর বিশুদ্ধ অবস্থানের অনুমানের ভিত্তিতে জাতপাতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিযুক্তকরণ প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা যাবে। এইসব উপাদানের ভিত্তিতেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক স্তর নির্ধারিত হয়।

ক্রমোচ্চ স্তর-বিন্যাস বর্ণ-ব্যবস্থার ভিত্তিতেই চিরাচরিতভাবে জাতপাতের অবস্থান নির্ণয় করা হয় — ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা), বৈশ্য (বণিক, কারিগর), শূদ্র (কৃষিজীবী, সেবামূলক কাজ) এবং জাত-কাঠামো বহির্ভূত পঞ্চম বর্গ (যাদের অস্পৃশ্য বলা হয়)।

অবশ্য জাতপাত ব্যবস্থার কিছু অভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি হ'ল : উত্তরাধিকার সূত্রে পেশার বিশেষীকরণ, জন্মসূত্রে মর্যাদা ও সভ্যপদ প্রাপ্তি, আচার-অনুষ্ঠানগত বিশুদ্ধতা ও কলুষতার মাত্রা; ফলতঃ সামাজিক বিযুক্তকরণ ও আন্তর্বিবাহজনিত প্রক্রিয়া। সনাতন ধারা অনুযায়ী পেশাগত বিন্যাস ও শ্রমবিভাজনের উপরই

জাতপাতের সামাজিক ক্রমোচ্চ স্তর-বিভেদ তৈরী হয়েছিল। একে যজমানী ব্যবস্থা বা পৃষ্ঠপোষক-গ্রহীতার সম্পর্কভিত্তিক ব্যবস্থা বলা হয়, যার ভিত্তিতে সকল জাতগোষ্ঠীই অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগত পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকত এবং সামাজিক স্তরগুলি নির্দিষ্ট থাকত।

২০.৩ ঔপনিবেশিক আমলে জাতপাত ব্যবস্থা

জাতপাত ব্যবস্থা সামাজিক স্তরভেদ ও শ্রম-বিভাজন নির্দেশক একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি, জাত-পঞ্চায়েতগুলি কয়েকটি স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের সীমানার মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখত। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা ছিল আচারগত নয় বরং সামাজিক ও আর্থনীতিক। দূর-দূরান্তরে কারিগরদের, শ্রমিক শ্রেণীর ও ভাগচাষীদের তৈরী পণ্যের বাণিজ্য চলত। এই সব জাতগোষ্ঠীদের তৈরী উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে ভূস্বামী ও শাসকরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের, এমনকি সাম্রাজ্যেরও ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাম্রাজ্যগুলির ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যে সব প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে (যেমন — জলসেচ, জমি, উন্নয়নের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) এবং কারিগরী শিল্প ও কৃষির উৎপাদনশীলতার যে বিদ্যমান স্তর, তার সঙ্গে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতার স্তরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্য জাতগোষ্ঠী ও জাত-পঞ্চায়েতদের ভূমিকা ছিল খুবই পরোক্ষ এবং সামান্য। তখন জাতগোষ্ঠীগুলির রাজনীতিকরণ হয়নি; অর্থনৈতিক ও পেশাগত গোষ্ঠী হিসাবে তারা কেবল পৃথক পৃথক মর্যাদাগত স্তরের ভূমিকা পালন করত। রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একরকম আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য তারা ভোগ করত। এটাও সত্য যে, স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন ভারতবর্ষে যে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছিল তার কোন চিহ্ন এই দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে ছিল না। বরং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ছিল খুবই বিকেন্দ্রীকৃত।

২০.৩.১ জাতপাত প্রসঙ্গে ব্রিটিশ নীতি : বিখণ্ডায়নের স্বরূপ

ভারতবর্ষের ধর্ম ও জাতপাত সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকদের আগ্রহের অন্যতম কারণ ছিল, যে দেশ তারা শাসন করবে তার জনসাধারণের সামাজিক আচার ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবগত হওয়া। আরও বিশেষ করে তারা এটাই দেখাতে চেয়েছিল যে, ভারতবর্ষ কোন সুসংহত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক একক নয় এবং ফলত সে কখনই একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে পরিগণিত হবে না। যে পদ্ধতিতে তারা জাতপাত ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করেছে তাতে ভারতবর্ষকে একটি সংহত সমগ্র হিসেবে নির্দেশ করার বদলে তাকে বিখণ্ডিত সমাজ হিসেবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসীগোষ্ঠী ও ধর্ম ইত্যাদি সামাজিক এককগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল; অপরদিকে জাতপাতের সঙ্গে আদিবাসীগোষ্ঠীর কিংবা জাতপাত, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির যে নানাধর্মী ও নানামাত্রার পারস্পরিক যোগসূত্র সে সবই সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিগুলির মধ্যে স্ববিরোধী উপাদান লক্ষ্য করা যায়। একদিকে দেখা যায়, আইন ও প্রশাসনিক বিধি রচনা করে নানারকম সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অবদমিত জাতি, আদিবাসী ও সমাজের শোষিত অংশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে তারা যে যথেষ্ট আগ্রহী সেটা প্রকাশ করছে। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে তারা পরিকল্পিতভাবে জাতপাত, আদিবাসী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রাজনীতিকিরণ প্রক্রিয়াকে

জোরদার করছে এবং তার মাধ্যমে সেই সব গোষ্ঠীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পরিচয়ের বৈধকরণের দাবীকে সহায়তা করছে। যে সব সংস্থা এবং আচার-ব্যবস্থা এই নানারকম সামাজিক এককগুলিকে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল একটি সংগঠিত প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত রাখছে সেগুলি তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। এটা অনস্বীকার্য যে, ঐ সব পারস্পরিকতার মধ্যেও অনৈক্যের উপাদান ছিল এমনকি শোষণের সম্পর্কও ছিল; কিন্তু সেই সব যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ পারস্পরিকতার বিষয়কে একেবারেই গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে যেভাবে জাতপাতের স্বরূপতা প্রকট হ'ল তা ছিল দেশের জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপতরীধর্মী এক প্রবণতা।

২০.৩.২ ব্রিটিশ শাসনে সমাজ-সংস্কার ব্যবস্থা

ব্রিটিশ প্রশাসনের তরফে বাহ্যত সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে অনুন্নত জাতগোষ্ঠীগুলিকে (স্বাধীনতার পর যারা তপশীলভুক্ত জাত হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে) চিহ্নিত করার মাধ্যমে। এছাড়া তারা ১৭৬৯ সালে কলকাতায় জাত-কাছারীর (caste-cutchary) বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল যেখানে তখন পর্যন্ত শুধু ব্রাহ্মণরাই হিন্দ জাতপাত বিধির একমাত্র ব্যাখ্যাকর্তা ছিল; ১৮৫০ সালে 'জাতপাতগত অযোগ্যতা দূরীকরণ আইন' পাশ হয় (Caste Disabilities Removal Act) — অবশ্য, ঐ আইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। ১৯২৩ সালে পাশ হয়েছিল, 'বিশেষ বিবাহ বিধি' (Special Marriage Act) যার ফলে বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ বৈধ বলে ঘোষিত হয়। এই সব সামাজিক বিধি-প্রণয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশদের তরফে ভারতবর্ষে একটি যুক্তিবাদী সামাজিক আইনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবু তাদের জাতপাত সংক্রান্ত সামাজিক নীতিতে যে নঞর্থক উপাদান ছিল তা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে সংঘর্ষ ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়েছে। ব্রিটিশরাই প্রথম ১৯০৯ সালে ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তীকালে তারা একইরকম পৃথক ব্যবস্থা করেছে — পাঞ্জাবে শিখদের জন্য, এবং অন্যান্য রাজ্যে ইঙ্গ-ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জন্য। এছাড়া, প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ডঃ আম্বেদকর অবদমিত শ্রেণীগুলির জন্য এবং 'অপরিচ্ছন্ন' কাজে নিযুক্ত জাতগোষ্ঠীদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব হাজির করেন। ঐ প্রস্তাব নীতিগতভাবে গৃহীত হয় তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে। অবশ্য মহাত্মা গান্ধী ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতার করেছিলেন, কেননা তিনি যথার্থই মনে করেছিলেন যে, ঐ প্রস্তাব কার্যকর হ'লে এখানকার জনগণের মধ্যে জাতপাতগত অযোগ্যতাকে স্থায়িত্ব দেওয়া হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজের বিখণ্ডিকরণ প্রক্রিয়াও স্থায়ী হবে। গান্ধী ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমরণ অনশন শুরু করলেন এবং তার ফলে শেষপর্যন্ত ডঃ আম্বেদকরকে দিয়ে তফসিলভুক্ত জাতগোষ্ঠীদের জন্য অন্যান্য নানা ধরনের সংরক্ষণের পাশাপাশি সংসদে ও বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের অনুকূলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী প্রত্যাহার করানো গেল। কোন সন্দেহ নেই যে, জাতপাতের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হ'লে ভারতবর্ষে জাতি গঠনের প্রক্রিয়াটি আরও কঠিন হয়ে পড়ত।

২০.৩.৩ জাতপাত সচেতনতা ও সংস্কৃতায়ন

অন্যদিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাদের নীতির মাধ্যমে এবং তাদের প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন এখানকার স্থানীয় ও আঞ্চলিক সচেতনাকে যেভাবে জোরদার করেছিল তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি। এই ধরণের সচেতনতা ছিল জাতীয় সংহতির দাবীর বিরোধী; ভারতবর্ষের জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার

প্রক্রিয়ার বিরোধী। 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' করার নীতির মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষকে শাসন করেছে।

জাতপাত-ভিত্তিক আদমসুমারীর ফলে জাতগোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামাজিক মর্যাদা আদায় এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির এক যন্ত্র হিসেবে জাত-সচেতনতা ও জাত-পরিচিতিবোধ হঠাৎ বেড়ে যায়। নিজেদের নথিভুক্ত করার জন্য জাতগোষ্ঠী এবং উপ-জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক ব্যাপক সক্রিয়তা শুরু হয় এবং আদমসুমারীকে তারা উচ্চতর জাতের মর্যাদা প্রাপ্তির এক সুযোগ হিসেবে গণ্য করে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, আদমসুমারীর মাধ্যমে উচ্চতর জাতের মর্যাদা প্রাপ্তির সাথে সাথেই অন্যান্য সামাজিক সুবিধাগুলি হয় আপনা আপনি আসবে কিংবা সেগুলি দাবী করা যাবে। নিম্ন জাতের, উচ্চতর জাতের মর্যাদা লাভের এই যে প্রক্রিয়া, যা আদমসুমারীতে দেখা গেল, তা সংস্কৃতায়ন নামে এক বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পেল। আদমসুমারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতপাতের শ্রেণী-কাঠামোর মধ্যে শুধু যে উচ্চতর জাতের মর্যাদা পাওয়ার দাবি এবং প্রতি-দাবি সংক্রান্ত বেশ কিছু মামলা চলছিল তা নয়, এই ধরণের দাবি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জীবনধারার সঙ্গেও যুক্তহয়ে পড়ে। এম.এন. শ্রীনিবাস বর্ণিত এই সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া নিম্নস্থ জাতগোষ্ঠীগুলির, উচ্চতর জাতগোষ্ঠীগুসমূহের আচারগত কর্মকাণ্ড, জীবনধারা এবং আদর্শকে গ্রহণ করে জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চতর মর্যাদা লাভের দাবীকেই উল্লেখ করে। ফলত এর মানে দাঁড়ায় তাদের নিজস্ব প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনধারা বর্জনীয়, কারণ সেগুলি নিম্নমানের। সংস্কৃতায়ন মর্যাদার গতিশীলতার মাধ্যমে নিম্নস্থ জাতগোষ্ঠীর উচ্চতার জাতের মর্যাদা লাভের আকাঙ্খাকেই প্রতিফলিত করে। নূতন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত সামাজিক ও প্রশাসনিক পটভূমিকার মধ্যে এ প্রক্রিয়া তার উদ্দীপনা সংগ্রহ করে। ফলে, জাত-সনাক্তকরণ প্রচেষ্টা এক নূতন অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে। ব্রিটিশ প্রশাসক - নৃতত্ত্ববিদ, জন সি. নেসফিল্ড (John C. Nesfield), ডেনিজিল (Denizil), সি. জে আইবেটসন (C. J. Ibbetson) এবং এইচ. এইচ. রিজলে (H. H. Risley) ১৮৮৫ সালে ভারতে জাতপাত-সম্পৃক্ত সামাজিক, জাতিপরিচায়ক, সাংস্কৃতিক এবং আচারগত বৈশিষ্ট্যগুলির চিহ্নিতকরণে তালিকা তৈরী করেন। এই প্রচেষ্টা ভারতের নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা এবং পরবর্তীকালে আদমসুমারীর সূচনা করে। এই প্রথম জাতপাতকে এক সামাজিক অস্তিত্ব হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ধর্মীয় দল এবং আদিবাসীদের ব্যাপারেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একই কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করে।

অনুশীলনী ১

১) 'জাত বলতে কী বোঝায় ? দু' লাইনে ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

২) আন্তঃবিবাহ মানে জাতের ভিতরেই বিবাহ।

হাঁ ☐ না ☐

৩) যজমানি জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জিনিষপত্র ও সেবার পারস্পরিক আদানপ্রদান ব্যবস্থা।

হাঁ ☐ না ☐

৪) গান্ধীজী কেন অবদমিত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পরামর্শ বাতিল করেছিলেন ? দু'লাইনে উত্তর লিখুন।

.....

.....

২০.৪ স্বাধীন ভারতে জাতপাত

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে অনুসৃত নীতি জাতগোষ্ঠীগুলির রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া দ্রুততর ও আত্মসচেতনতা প্রখর করে তুলেছিল। জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের নীতিগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। তবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এই নীতিগুলি গণপরিষদে উত্থাপিত হয় এবং ভারতীয় সংবিধানে তা গৃহীত হয়। ভারতীয় সংবিধান ব্যক্তির শুধু নাগরিক মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছে। তবে ঐতিহাসিকভাবে সমাজের বঞ্চিত ও অবদমিত অংশের যেমন অবদমিত জাতগোষ্ঠী, আদিবাসী ও সম্প্রদায়কে নাগরিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেছে। তপশিলী জাতগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণধর্মী বৈষম্য সাম্যভিত্তিক সমাজপ্রতিষ্ঠায় আমাদের জাতীয় প্রতিশ্রুতি পালনের অন্যতম ব্যবস্থা। আমাদের সমাজের একটি অংশ যা বহুকাল ধরে শোষিত হচ্ছিল তাদের দ্রুত উন্নয়ন এবং সামাজিক সচলতা জাতীয় ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ় করেছে। জাতি গঠনের পক্ষে সহায়ক আত্মিক ঐক্য ছাড়াও এর ফলে সুষম সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত হয়েছে।

২০.৪.১ জাতপাত ও নির্বাচনী রাজনীতি

জাতগোষ্ঠী, যা এতদিন সামাজিক, দাতব্য এবং শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে কাজ করত, নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করল। জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরী হওয়া শুরু হ'ল। জাতগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতা জাতপাত গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন ধরনের সমঝোতা আনল। এভাবে জাতপাতের কাঠামোর মধ্যে সংশ্লেষ ও বিভাজনের সৃষ্টি হ'ল।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের ফলে ক্ষমতা ও সম্পদ লাভের জন্য জাতগোষ্ঠীগুলি নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। এটি তিনটি স্তরে তাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল।

১) এর ফলে এক দিকে জাতপাতের একাত্মতা বৃদ্ধি পায়, অন্য দিকে জাতি-সংঘর্ষও বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ মহারাষ্ট্রে মাহার ও মারাঠা সংঘর্ষ, অন্ধ্রপ্রদেশে কাম্মা এবং রেড্ডিদের শত্রুতা, কর্নাটকে লিঙ্গায়েত-ভোক্কালিগা সংঘর্ষ, বিহারে রাজপুত-ভূমিহারদের সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে, অধিকাংশ সংঘর্ষই ব্রাহ্মণ-বিরোধীতাযুক্ত।

২) এই জাতপাতের মধ্যে সংঘর্ষ, তীক্ষ্ণ জাত-সচেতনতা অচিরেই জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির দাবীতে জাত-সমঝোতা সৃষ্টি করল, ফলত জাতপাতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংশ্লেষণ শুরু হ'ল। এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ পাবার প্রত্যাশায় রাজনৈতিক ভিত্তির প্রসার করা। এভাবে সংশ্লেষণের মাধ্যমে বহু জাতগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটল। যেমন — গুজরাটে ক্ষত্রিয় মহাসভা, তামিলনাড়ুতে ভানিয়ার কুল সংঘর্ষ, উত্তর প্রদেশে আহীর, জাঠ, গূর্জর, রাজপুতদের (অজগর) সংগঠন উল্লেখযোগ্য। এভাবে 'কৃষক' জাতগোষ্ঠীকে নির্বাচনী রাজনীতির স্বার্থে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালান হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে জাতপাতভিত্তিক বেশ কিছু রাজনৈতিক দল তৈরী হ'ল।

৩) জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছুদিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলার পরে তা তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ বিভাজনের প্রক্রিয়ার স্তরে উপনীত হয়। জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই বিভাজন প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার ফলশ্রুতি যা প্রতিদ্বন্দ্বী জাতপাতগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বন্টনের ফলে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায়।

যেহেতু সংশ্লেষিত জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সব জাতপাতই সমান সংখ্যায় থাকে না অথবা সমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিলাভ করে না, সেহেতু যারা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে তারা অন্যদের পিছনে ফেলে সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের অধিকাংশ ভোগ করে। ফলে নৈরাশ্য ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ফাটল ধরে এবং ভাঙনের সূচনা হয়।

২০.৪.২ জাতপাতের রাজনীতিকরণের ফলাফল

রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে জাতগোষ্ঠীর সংশ্লেষণ ও বিভাজনের গতিধারা আলোচনা করা হ'ল। দেখা যায় যে, জাতপাতের জাতগোষ্ঠীতে পরিবর্তনের প্রতিটি পদক্ষেপ আচারনির্ভর জাত-চেতনা ও জাত-আনুগত্যকে দুর্বল করে, কারণ তা ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতার উন্মেষ ঘটায়। চিরায়ত জাত-আদর্শ ও অস্বস্তিকর মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে পরোক্ষভাবে হ'লেও, তা নাগরিক চেতনা তীক্ষ্ণ হ'তে সহায়তা করেন।

স্বার্থান্বেষী বা প্রতিবাদী গোষ্ঠী হিসাবে জাতপাত

জাতপাতগোষ্ঠীর এবং জাতপাতের সংশ্লেষণ ও বিভাজনের যে ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় তা জাতপাতের স্বার্থান্বেষী বা প্রতিবাদী গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হওয়াই নির্দেশ করে। পৃথিবীর অধিকাংশ আধুনিক সমাজে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির, মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির, একটি স্থান আছে। জাতপাতভিত্তিক একটি সংগঠন এবং ঐ ধরনের কোন সংস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা তার সভ্যপদ লাভের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে জাতপাতের সংশ্লেষণের জন্য যে প্রচেষ্টা তা জন্মসূত্রে সভ্যপদ লাভের রীতিতে এক নূতন মাত্রা নিয়ে আসে, যা জাতপাতের অর্থকে আরো বিস্তৃত করে এবং তার সনাতন আনুষ্ঠানিক তাৎপর্যকে দুর্বল করে। এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐ সমস্ত জাতপাতভিত্তিক সংগঠনগুলির পাঁচমিশেলী গঠন-চরিত্রের মধ্যে। জন্ম ও জ্ঞাতিবাদ — এই দুই নীতির থেকে সরে এসে স্পষ্টভাবে জোর দেওয়া হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার ওপর, যার ফলে বিভেদী জাতগুলি সংশ্লেষিত হয়।

যদি জাতপাতের সংগঠনগুলি শুধু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে এবং যদি ন্যায়সঙ্গত, নাগরিক পদ্ধতি ও পথে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, এবং আর্থ-সামাজিক দাবি-দাওয়াকে মুখর করে, তাহলে ঐ সংগঠনগুলি জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয় না। ভারতে জাতীয় সংহতির পথে যা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হ'ল জাতপাতের অবিবেচক ও সঙ্কীর্ণ প্রকাশ, যা স্বাভাবিকভাবে জাতপাতের সংগঠনগুলির মধ্যে জাত-পরিচয়ের একাত্মভূতি ঘটায়নি।

ভারতে জাতপাতের আন্দোলন

আমরা আগেই আলোচনা করেছি কিভাবে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে জাতপাত-সচেতনতা বাড়িয়ে দেয় এবং এও আলোচনা করেছি কিভাবে স্বাধীনতার আগে তপশিলী জাতের জন্য স্বতন্ত্র ভোটাধিকারের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধী ও ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের দূরদর্শিতার জন্য দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি রদ করা সম্ভব হয়েছিল। যদিও জাতপাতের রাজনীতিকরণ থামানো যায়নি, এবং পরবর্তীকালে তপশিলী জাত ও অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়।

তপশিলী জাত এবং অংগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলন

তপশিলী জাতের আন্দোলনের মধ্যে প্রতিবাদী ও সংস্কারমূলক উভয় আন্দোলনেরই চরিত্র ছিল। সংস্কার সাধনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্বে, যখন অবদমিত জাতগুলি তাদের তথাকথিত অশুদ্ধ জীবনযাত্রা বর্জন এবং 'দ্বিজ' জাতের বিশ্বাস ও জীবনধারা গ্রহণের প্রচেষ্টার সাহায্যে 'সংস্কৃতায়ন' পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, উচ্চতর জাতের মর্যাদা লাভ। তামিলনাড়ুর নাদাররা নিজেদের জন্য ক্ষত্রিয় জাতের মর্যাদা দাবি করে এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 'নাদার মহাজন সংযম' নামে নিজেদের জাতগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে। উত্তরপ্রদেশের চামাররা এবং নুনিয়ারা একইভাবে চৌহান ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা দাবি করে। স্বাধীনতার আগে এবং পরে সংস্কৃতায়নের অনুরূপ অনেক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও তখন অনেক আন্দোলন সংগঠিত হয় যার মধ্যে ছিল জাতবিরোধী একটা প্রবণতা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণ ও জাতপাতের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব। মহারাষ্ট্রে জোতিবা ফুলের আন্দোলন তার এক নিদর্শন। মহারাষ্ট্রের 'সত্যশোধক সমাজ', তামিলনাড়ুর 'আত্মসম্মান' আন্দোলন এবং কর্ণাটকের 'বীরশৈব আন্দোলন' — এ সবই ছিল জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ডঃ আম্বেদকর মহারাষ্ট্রের এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তের তপশিলী জাতগুলিকে নেতৃত্ব দেন এবং তাদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে জাতপাত ব্যবস্থার অসুস্থ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানান। এই আন্দোলন মহারাষ্ট্রে, যেখানে মাহাররা এক বিরাট সংখ্যায় বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হন, সেখানে এক বিরাট সাফল্য লাভ করে। এই আন্দোলন স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের অনেক রাজ্যে বিস্তৃত হয়। এই ধরণের আন্দোলনগুলি প্রতিবাদের আদর্শের ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত ছিল।

তপশিলী জাতের আন্দোলন এছাড়াও এক আদর্শবাদী রূপ নেয়। বর্ণ-ব্যবস্থার ঐশী ব্যাখ্যা বর্জন করে, ক্ষমতার চিরস্থায়ীকরণের উদ্দেশ্যে শ্রেণীপ্রভুত্বের এক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দিয়ে তপশিলী জাতের আন্দোলন এক আদর্শবাদী আকার ধারণ করে। তারা ইতিহাস এবং পুরাণ থেকে প্রমাণস্বরূপ উদাহরণ দিয়ে তাদের যুক্তিগুলিকে আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে।

অনগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলনসমূহ

স্বাধীনতার আগে অনগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলনের ভিত্তিভূমি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মহীশূরের লিঙ্গায়েত শিক্ষা তহবিল সংঘ ও ভোক্কালিগা সংঘ, উত্তরপ্রদেশের যাদব ও কুর্মি মহাসভা এবং মহারাষ্ট্রের মারাঠা আন্দোলন — এর কয়েকটি উদাহরণ। ঔপনিবেশিক রাজত্বের অবসানে অনুরূপ আরো কিছু আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এগুলো ছিল একই সঙ্গে সংস্কার ও প্রতিবাদী আন্দোলন। স্বাধীনতার পরে সংরক্ষণধর্মী বৈষম্যের জন্য তপশিলী জাত ও আদিবাসী ছাড়াও অনগ্রসর শ্রেণীকেও একটা স্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু, জাত, উপার্জন কিংবা শিক্ষা - কিসের ভিত্তিতে সনাক্তকরণ নীতি তা এখনো অস্বচ্ছই রয়ে গেল। এর জন্য দায়িত্ব প্রধানত ভারতরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির ওপর চলে আসে। অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য পদের সংরক্ষণ, চাকরি, শিক্ষা এবং সম্পদের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার - এ সব ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে। যদিও অধিকাংশ রাজ্য তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, তবু বিষয়টি এখনো বিতর্কিতই রয়ে গেছে।

২০.৫ আধুনিকীকরণ, জাতীয় সংহতি এবং জাতপাত

আধুনিকীকরণ, সমাজের পরিকাঠামোয় ও ভাবাদর্শে নতুনতর গতির সঞ্চার করে। এর বৃদ্ধি জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়াকে জোরালো করে। ভারতবর্ষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া বর্তমানে অনেকটাই বিকশিত হয়ে উঠেছে। সংবিধান, গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী রাজনীতি, অসাম্য ও শোষণ দূরীকরণের উদ্দেশ্য প্রণীত আর্থ-সামাজিক সংস্কার আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে সবল করেছে। যোজনার মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি, সমাজ-সংস্কার, ন্যায়-বিচার বন্টন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা জাতগোষ্ঠীর সামাজিক পরিকাঠামো, মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হয় যে, প্রতিবাদী ও সংস্কারমূলক সংগঠন হিসেবে এই জাতগোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব জাতিভেদ প্রথাকে আরো সরল করে তুলবে। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ পূর্বাভাস দেন যে, ভারতবর্ষে জাতপাত প্রথা উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠবে। কিন্তু অচিরেই লক্ষ্য করা যায় যে, জাতগোষ্ঠীগুলি কেবল আধুনিকীকরণের সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক চাহিদার অভিযোজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলিকেই স্পষ্ট করে তুলছে। তারা জাতপাত বা জাতপাত প্রথা-কেন্দ্রিক নয়, তাদের উদ্দেশ্য জাত-পরিচয়ের ভিত্তিতে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় জনগণকে সংগঠিত করা, যেহেতু কোনও বিকল্প পরিচিতি নেই বা তখনও প্রকাশ পায়নি। বিভিন্ন জাতপাতের সংশ্লেষ ও বিভাজনে এই ব্যাপারটি বিশদভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, আত্মীয়গোষ্ঠী বা অবর-জাতের নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোগত পরিসীমাকে লঙ্ঘন করে, জাতপাত আলম্বিক ও আনুভূমিক প্রান্তে উত্তরণ ও বিচরণ করার ক্ষমতা রাখে।

জীবিকাগত সচলতা যত গতিশীল হয়, দেশের শিক্ষা, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রচলন তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। চাপ বাড়তে থাকে জাত-পরিচয়ে। আর্থিক মজুরির ব্যাপক প্রচলন ও গ্রামাঞ্চলে বাজারভিত্তিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ফলে যজমানির অর্থনৈতিক ভূমিকা অর্থহীন হয়ে পড়ে। জীবিকার বংশভিত্তিক বিশেষীকরণের গুরুত্ব অর্থনীতিতে ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। ব্যাপক নগরমুখী অভিবাসনের ফলে জাতপাতভিত্তিক পারস্পরিক আর্থিক ও সামাজিক আদানপ্রদানের বন্ধন ভেঙে যেতে থাকে। জমিদারিপ্রথার বিলোপ ও পঞ্চায়েত রাজের প্রচলন নিম্নবর্গের উপর উচ্চজাত উচ্চশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ও শোষণকে ব্যাহত করেছে। এইভাবে ভারতবর্ষে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া জাতপাত প্রথার সামাজিক, কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে, বর্তমানকালে বংশ পরম্পরাভিত্তিক জীবিকাগুলি আর অলঙ্ঘনীয় নয়; যজমানি সম্পর্ক দেশে বেশীর ভাগ অঞ্চলেই প্রায় বিলুপ্ত। যানবাহনের নতুন মাধ্যমের আবির্ভাব, নগরায়নের ও শিল্পায়নের বৃদ্ধি, সমাজের পারস্পরিক আদানপ্রদানের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে, বিশেষত 'অস্পৃশ্যতা'কে দুর্বল করে দিয়েছে। বর্তমানে এগুলির আচরণ ও সমর্থন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা দেখি যে, সদস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে, বহু স্বয়ংসেবী সংস্থাগুলি জাত-পরিচয়কে নির্ণায়ক হিসেবে ধরে না। সামাজিক উদ্দেশ্য, জীবিকাগত স্বার্থ ও জনহিতকর কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগঠিত হয় এই স্বয়ংসেবী সংস্থাগুলি। তাই, জাতপাত প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে, নয়তো এই প্রথার চিরায়ত অস্তিত্বের কিছু অভিযোজনীয় পরিবর্তন আসবে। এই প্রক্রিয়াসমূহ ক্রমাগতভাবে জাতীয় সংহতি সাধনের শক্তিকে দৃঢ়তর করে তুলবে।

অনুশীলনী ২

১) সংরক্ষণধর্মী বলতে কী বোঝায় ? পাঁচ লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

২) জাতপাতগোষ্ঠী কীভাবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে ব্যাখ্যা করুন। দু'লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

৩) আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ভারতে জাতপাত প্রথাকে দুর্বল করেছে।

হাঁ ☐ না ☐

৪) স্বাধীনোত্তর কালে কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি জাতপাত প্রথাকে প্রভাবিত করেছে ? চার লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২০.৬ আদিবাসী সংস্কৃতি : বিবিধ রীতি ও সমস্যা

ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতিসমূহকে ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম মাত্রা হিসেবে ধরা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকেই কিছু আদিবাসীগোষ্ঠী উন্নতমানের সভ্যতার সান্নিধ্যে আসে। এই তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে যখন 'জাতির' বিপরীত হিসেবে এই গোষ্ঠীগুলিকে 'জন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই মানবগোষ্ঠীর দৈহিক আদল ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, তারা বিচিত্র দেবতার আরাধনা করত ও বনেজঙ্গলে-পাহাড়ে বাস করত।

২০.৬.১ ভারতবর্ষে আদিবাসী জনসংখ্যা

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ আদিবাসী মানবগোষ্ঠী। দেশের চারটি অঞ্চলে আদিবাসী জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে, যথা-অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও মেঘালয়ে এই আদিবাসীগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশ্য, বেশীরভাগ আদিবাসীগোষ্ঠী, গুজরাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের

মধ্যবলয়ে বসবাস করে। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মত রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশী। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থানে এই জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে। অবশ্য ভারতের সম্পূর্ণ মধ্যাঞ্চলে আদিবাসীগোষ্ঠী মাত্র ১৩টি জেলাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আদিবাসী মানবগোষ্ঠীর কেন্দ্রীভবনের তৃতীয় অঞ্চলটি কাশ্মীর থেকে সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত 'সিসহিমালয় (Cis Himalaya) অঞ্চল'। কেন্দ্রীভবনের চতুর্থ অঞ্চলটি সুদূর দক্ষিণে, কিন্তু সেখানে আদিবাসী জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। দৈহিক আকারে পৃথক এই প্রকার প্রায় ৪৫০টি স্বতন্ত্র আদিবাসীগোষ্ঠী ভারতে বাস করে। এদের জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে ২৪ জন। জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম আদিবাসীগোষ্ঠীর জীবনযাপনের ধারা নির্ণয় করে। এদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বিচিত্র, তবে তা মূলত শিকার করা ও খাদ্য-সংগ্রহ করা। কারিগরগোষ্ঠীসমূহ বিভিন্ন কলাশিল্প কাজে নিয়োজিত এবং কিছু শিল্পশ্রমিকের কাজে নিযুক্ত। যদিও আদমসুমারী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, অধিকাংশ আদিবাসীগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মাবলম্বী তবুও বেশ কিছু সংখ্যক আদিবাসীগোষ্ঠী খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। কয়েকটি গোষ্ঠী এখনো তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসকেই মেনে চলেছে। স্থায়ী কৃষিকাজে অনুপযুক্ত অঞ্চলেই যে আদিবাসী জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত এই ধরণের চিন্তাধারা ভ্রান্ত, কারণ ভারতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মালভূমি ও সমতলভূমিভিত্তিক স্থায়ী কৃষিকাজকে জীবিকানির্বাহের পন্থা করে নিয়েছে। যদিও কিছু আদিবাসীগোষ্ঠী এমন অঞ্চলে বসবাস করে যেখানে অসমতল ভূমি হওয়ার দরুন সাধারণ কৃষিকাজ সম্ভব নয়।

২০.৬.২ আদিবাসীগোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য

গাঙ্গেয় সমভূমিতে বসবাসকারী আদিবাসী বা সেই লোকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে তারা যাদের গায়ের রং কালো, মুখ গোল, নাক চাপা এবং কপাল নীচু। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীরা 'মঙ্গোলীয়' দৈহিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। গুজরাত ও কেরলে ওই প্রবণতার চিহ্ন পাওয়া গেছে। সুতরাং অধিকাংশ আদিবসী জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের অঞ্চলের সাধারণ জনগণের থেকে শারীরিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত আত্তীকরণও এই সত্যকে মুছে ফেলতে পারে না যে, একজন নাগার এবং একজন অসমীয় হিন্দুর মধ্যে চেহারায় প্রচুর পার্থক্য আছে এবং একজন কাদের, কোচিনের সাধারণ হিন্দুর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রবল জাতিগত বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে জাতকে ভিত্তি করে কোনও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। এই সার্বিক ঐক্যের অন্যতম কারণ হিন্দু জাতভিত্তিক সমাজের ভাবাদর্শে অন্তর্নিহিত; যে ভাবাদর্শ এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, মনুষ্য জাত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অন্তঃবিবাহরীতি ও সামাজিক অন্তর্মুখিতা যেহেতু অন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেহেতু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সামাজিক দূরত্ব স্থাপনের প্রয়োজন হয় না।

২০.৬.৩ আদিবাসী ভাষাসমূহ

ভারতে আদিবাসী জনগণ যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করে থাকে সেগুলিকে ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড়-বিভাজনের মধ্যে ফেলা যায়। ইন্দো-আর্য ভাষার মধ্যে কয়েকটি ভাষা আদিবাসী সম্পর্কিত বলে নির্ধারিত হয়েছে, যেমন — ভিলি। ভাষা কিন্তু কোন অপরিবর্তনীয় উপাদান নয়। একটি আদিবাসী সম্প্রদায় নিজের লোকগোষ্ঠীগত আত্মপরিচিতের পরিবর্তন না করেও প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হ'ল দ্বি-ভাষাতত্ত্ব। কখনও এটি পরিবর্তনশীল স্তর হিসেবে কাজ করে এবং ক্রমশ আদিবাসী ভাষার অবক্ষয় ও বিলুপ্তি ঘটে। এই প্রক্রিয়া শত শত বছর

ধরে ঘটে চলেছে। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ই, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি, তাদের আদি ভাষা হারিয়ে ফেলেছে এবং বর্তমানে তারা ভারতের প্রধান ভাষাগুলির একটিতে কথা বলে। মধ্য ভারতের গোণ্ড সম্প্রদায় নিজ ভাষা জানেও না, তারা যে অঞ্চলে বসাবাস করে তার ভিত্তিতে হিন্দী, মারাঠি ও তেলেগু ওড়িয়া ভাষায় উচ্চারিত হয়। যখন একটি আদিবাসী সম্প্রদায় ভাষাগত আত্তীকরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সেই সম্প্রদায় বিবিধ এবং বিচিত্র ব্যবহারিক আদর্শকেও গ্রহণ করে নেয়।

২০.৬.৪ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ও আদিবাসী

প্রকৃতি আদিবাসী জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়ার ওপর নির্ভর করে আদিবাসী অর্থনীতির কয়েকটি ধারা বিবর্তিত হয়েছে। বহুকাল ধরেই আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে পেয়েছে স্বস্তিদায়ক বাসস্থান এবং সেখানে তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের এক পরিমিত মান বজায় রেখেছে। কিন্তু অনেক বনাঞ্চলে বিভিন্ন কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে; অতিরিক্ত হারে লাভ ও প্রমোদ উদ্দেশ্যে পশু শিকার হওয়ার দরুন বন্যজীবন বিনষ্ট হয়ে গেছে। বনসম্পদের অবক্ষয় ও প্রাকৃতিক বর্ধন-প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক বিকল্পের প্রচলন হওয়া উদ্ভিদ জীবনের পরিবর্তন এসেছে।

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার হ্রাস পাওয়ায়, যেমন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবহারে বাধা আসা, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত না হওয়ার ফলে আদিবাসীদের বিস্বাদ ও অখাদ্য শিকড় ও কন্দ খেয়ে জীবনধারণ করতে হচ্ছে অথবা বেশ কিছু কালের জন্য অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। অনেক অঞ্চলেই বাসস্থান নির্মানের উপাদানও দুর্লভ। সুতরাং তারা খাদ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই আদিবাসীগোষ্ঠীর সাক্ষরতার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে এবং এদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া প্রায় স্থগিত। প্রগতিশীল আদিবাসী ও অনাদিবাসীরা এই জনগোষ্ঠীর উপর সার্বিক চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু বিশেষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে এক অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্তারের অভুজমান, উড়িষ্যার বন্দো পরোজা, আন্দামানের ওঙ্গে ও জারোয়াগোষ্ঠীর উল্লেখ করা যায়।

২০.৬.৫ আদিবাসী কৃষকদের সমস্যা

ভারতে আদিবাসীদের ইতিহাস এই গোষ্ঠীর কৃষক হয়ে ওঠার ইতিহাস। সরকারি নীতি হ'ল ঝুম চাষের বিস্তার হ্রাস করা, ধানচাষ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা, আদিবাসী অঞ্চলে নতুন কৃষি-কৌশল প্রয়োগ করা ও কৃষিখাতে পুঁজি বিনিয়োগ বর্ধিত করা। এই অঞ্চলগুলিতে সরকারি এজেন্সীর দ্বারা উন্নত কৃষিপ্রযুক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। এমন অভিনব কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যা খরাপ্রবণ এলাকা ও পার্বত্যঞ্চলে ফলদায়ক হবে। বর্তমানে স্থায়ী কৃষিকাজের অধিকাংশই জীবিকানির্বাহের স্তরেই সীমিত এবং আদিবাসীদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর অধিকাংশই বাজারে বিক্রীর সুযোগ হয় না। অনেক সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করবার জন্য তারা শস্য আপৎকালীন বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অবশ্য আধুনিক কৃষিকাজ প্রচলিত হয়েছে ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও ওঁরাও, মধ্যভারতের গোণ্ড ও কর্কু এবং নীলগিরি অঞ্চলের বদগা ও মুল্লু কুরম্বা আদিবাসীদের মধ্যে। নারকেলাদি পণ্যশস্য নিকোবারিদের এবং বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ে পরিণত করেছে। পণ্যশস্য চাষের প্রয়োগের খবর পাওয়া গেছে গুজরাত, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের

আদিবাসী সমাজে।

কৃষক অর্থনীতির ধ্রুপদী বিবরণের সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে ভারতের আদিবাসী সমাজের বৃহদাংশে। এই অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা সামান্য প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের প্রয়োগ করে থাকে এবং জীবিকানির্বাহের জন্য মূলত নিজেদেরই উৎপাদিত পণ্যের উপর নির্ভর করে থাকে।

ভূমি-ক্ষুধা, ভূমি-বিচ্ছিন্নতা এবং ভূমিহীনতা

আদিবাসী কেন্দ্রীভবনের মধ্যাঞ্চলে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় মূল হ'ল কৃষি সংক্রান্ত বিষয়। পশ্চিমাঞ্চলে ভূমির অভাব ও ভূমি-ক্ষুধা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ বলশালী রাজপুত, মারাঠা ও অন্যান্য হিন্দু কৃষক সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের বহিষ্কার। ভূমি-ক্ষুধার অন্যতম সহযোগী কারণগুলি হ'ল ভূমির কম উৎপাদনশীলতা, আদিম পদ্ধতিতে চাষ; আদিবাসী স্বার্থ রক্ষণার্থে কোন আইনি ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য জাতের দ্বারা আদিবাসীদের ক্রমাগত শোষণ এবং আদিবাসী অর্থনীতির অ-বিভিন্নতা।

মধ্যভারতের সব অঞ্চলেই, আধিবাসীদের হাত থেকে অ-আদিবাসীদের মধ্যে ভূমি-বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় আইনি ব্যবস্থা ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ফলে। এই ত্রুটিগুলি পরে আবিষ্কৃত হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ধেবর কমিশন অনেকগুলি সুপারিশ করে। আদিবাসী অঞ্চলে কৃষিসংক্রান্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের কাছে কোন পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত নেই এবং খরাপ্রবণ এলাকায় বর্ষা না হ'লে অপরিমিত দুর্দশার সৃষ্টি হয়। অনেক অঞ্চলেই সংকটাকীর্ণ অবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

ঋণগ্রস্ততা এবং দাস-মজুর (Bonded labour)

প্রায় সমগ্র আদিবাসী অধুষ্যিত অঞ্চলে, নগদ-ধারে সাবেকি প্রথা, শোষণের চরমতম রূপের একটি। আদিবাসী মানুষ এখনও এই প্রথার কবলে রয়েছে। ঋণগ্রস্ততার অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য হ'ল দাসমজুরি। অনেক স্থানেই এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। আইনি প্রতিকার দ্বারা দাস-মজুর প্রথার বিলোপের প্রচেষ্টা চালানে হয়েছিল, কিন্তু এই সত্য উপলব্ধ হয়নি যে, সনাক্তকরণ ও পুনর্বাসন দাসত্ব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পুনর্বাসন প্রকল্প তখনই সফল হবে, যখন এই প্রচেষ্টার যথেষ্ট গতিবৃদ্ধি হবে।

অনুশীলনী ৩

১) আদিবাসীরা প্রধানত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উৎপাদন করে।

হাঁ ☐ না ☐

২) পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা আদিবাসীদের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে।

হাঁ ☐ না ☐

৩) 'মঙ্গোলয়েড' শব্দটি সম্পর্কিত (সঠিক উত্তরে ✓ দাগ দিন)

(ক) আদিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। ( )

(খ) আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে। ( )

(গ) আদিবাসীদের অর্থনীতির সঙ্গে ( )

৩) আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের মধ্যে পরস্পরিক আদানপ্রদানের ফলে আদিবাসীরা অধিক পরিমাণে ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার পেয়েছে।

হাঁ ☐ না ☐

৫) আদিবাসী কৃষকদের প্রধান সমস্যাগুলি উল্লেখ করুন। তিন লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

২০.৭ নগর পরিমণ্ডলে আদিবাসী

ভারতে আদিবাসীদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই শহরে বাস করে। একথা সত্য যে, বহুকাল যাবৎ এই আদিবসীরা নগর সভ্যতা থেকে বেশ দূরেই অবস্থান করত। তবে বর্তমানে বিশেষত কিছু সংখ্যক আদিবাসী প্রশাসনিক সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও ব্যাপক শিল্পায়নের জন্য শহরে এসে বসবাস করছে।

২০.৭.১ শিল্পায়ন ও আদিবাসীত্ব হনন

যেখানে নগরায়ন অত্যন্ত ধীর গতিতে চলে এবং শহুরে মূল্যবোধ গ্রহণ করতে মানুষের কিছু সময় লাগে সেখানে শিল্পায়নের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। শহুরে ব্যবস্থায় এই অভিবাসিত আদিবাসীরা সচেষ্ট হয় এক স্থানে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে। যদিও বেশ কিছু সময়ের পরে এটা সম্ভব হয় না এবং এই মানুষগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর দেশে যখন ব্যাপক শিল্পায়ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তখন দেখা যায় যে, ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার কিছু অঞ্চল অত্যন্ত উপযুক্ত। কারণ ঐ স্থানে লোহা ও কয়লা দুই-ই পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলগুলির আদিবাসী অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। এমনকি স্বাধীনতার আগেও ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনি এলাকায় বহুল পরিমাণে আদিবাসী পরিলক্ষিত হয়। এভাবে দেখা যায়, জামশেদপুরের ইস্পাতনগরী 'হো' নামের আদিবাসীদের বাসভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত। গুয়া এবং নোয়ামুণ্ডীর কয়লা ও লৌহখনি, মোসাবনীর তাম্রখনি এবং লোহারডাগার বক্সাইট খনি এসবই ঐ একই অঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই শিল্পায়ন কেবল আদিবাসী সমাজের শিল্পে কর্মরত ব্যক্তিদেরই রূপান্তরিত করেনি তাদের ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যক্তিদেরও করেছে।

২০.৭.২ মুদ্রা প্রচলন ও শিক্ষার প্রসার

মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলিত হবার পর থেকেই শহরবাসী আদিবাসী মানুষদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেল। তারা সনাতন গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বদলে ব্যক্তিগত সাফল্য ও ব্যক্তিগত জীবিকার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। এর ফলে পরিবারের কাঠামো এবং পরিবারসহ নারী-পুরুষের ভূমিকারও আমূল পরিবর্তন হ'ল। শিল্প-সমাজে বয়স্কদের প্রতি

কনিষ্ঠদের, পুরুষদের প্রতি নারীর বা সর্দারের প্রতি সাধারণের যে শ্রদ্ধা-ভক্তিএসবের স্থান খুবই সামান্য। এই নব্য শিল্প-সমাজ নেতৃত্বের ধরন ও প্রকতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। একজন মানুষ, যে শ্রমিক হিসেবে প্রবেশ করেছিল, পদোন্নতির ফলে পরবর্তীকালে সে যখন ফোরম্যান হয়ে যায় তখন সে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে। এ ধরনের সামাজিক সচলতা আগে অজ্ঞাত ছিল। এভাবে একটি আত্মসচেতন মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠীর এবং শেষ পর্যন্ত শ্রেণী ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়, যার অস্তিত্ব আগে মধ্য-ভারতের আদিবাসীগোষ্ঠীতে ছিল না এবং এটি হ'ল আদিবাসী সমাজের নিয়মনীতির বিরোধ।

শহরাঞ্চলে সহজলভ্য আধুনিক শিক্ষার সুযোগ মানুষকে কার্য-কারণ তত্ত্ব বা হেতুবাদ সম্পর্কের গুরুত্বে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই নতুন বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে তারা কুসংস্কার, ডাকিনীবিদ্যা প্রভৃতির প্রতি আর বিশ্বস্ত থাকে না। শিল্প ব্যবস্থায় মানুষ তার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। প্রকৃতপক্ষে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি সর্বদাই এই ধারণাগুলিকে জোর দেয়। কাজেই শহুরে আদিবাসী মানুষদের যথেষ্ট সুযোগ থাকে তাদের ক্ষোভের কথা জানানোর এবং নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের দাবী করার।

২০.৭.৩ আদিবাসী মানুষদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন

সব থেকে বড় মৌলিক পরিবর্তন হ'ল সমজাতীয়তার হানি। অভিবাসী আদিবাসী শ্রমিকরা শহরের বস্তি এলাকায় অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যেই বাস করে এবং এই অবস্থায় তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অস্বচ্ছ হয়ে যেতে থাকে; আর অবশেষে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার উদ্ভব হয়। রাঁচী ও জামশেদপুরের আশেপাশে সমীক্ষা করে দেখা গেছে আদিবাসী তরুণরা বিভিন্ন দুষ্কৃতকারী দলগুলির সঙ্গে জড়িত এবং তারা সেখানে যথেষ্ট সক্রিয়। শ্রমিক বস্তির মধ্যে আপেক্ষিক পরিচয়হীনতা আদিবাসীদের মধ্যে প্রভূত সমাজ বিরোধী প্রবণতার জন্ম দেয়। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, সাবেক গ্রামের সর্দার প্রভৃতিদের দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শহরে অনুপস্থিত থাকে। শহর শিল্প মহলে আদিবাসীদের বাইরে গোষ্ঠী পরিচিতি বিস্তৃত করার প্রবণতা দেখা যায়। আন্তঃআদিবাসী বিবাহ, ট্রেডইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের আদিবাসী অস্তিত্বকে অতিক্রম করে যায়। রেডিও, সিনেমা, সংবাদপত্র ও সাম্প্রতিক কালে টি.ভি প্রভৃতি তাদের কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করে যা গ্রাম্য সমাজে কল্পনার অতীত ছিল। এইভাবে পৃথিবীর গণ্ডী ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা বিস্তৃত হয় এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার স্তর আরো বাড়তে থাকে।

আগে আদিবাসী মানুষরা দুর্দিনে, বেকারীত্বের সময়ে অথবা অসুস্থকালে তাদের গোষ্ঠীর লোকেদের সাহায্য চাইত। বংশ, আত্মীয়তার বন্ধন নিরাপত্তার প্রতীক ছিল। বর্তমানে তাদের দাম্পত্য জীবন আত্মীয়তর বন্ধনের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অবসরকালীন কাজকর্ম সমাজ পরিবর্তনের সূচক। এর মাধ্যমে আমরা উত্তেজনা, হতাশা, মূল্যবোধ প্রভৃতি দেখতে পাই। তাদের বেশীরভাগ কাজকর্ম শুধু যে আনন্দ পাবার জন্য তাই নয়, বরং এগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক। আদিবসী গ্রামগুলিতে তারা ধেনো মদ পান, যৌনসংসর্গ, নাচগান, উপকথা, হেয়ালি প্রভৃতি করত; প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করত; জ্ঞাতি-আত্মীয়দের সাথে নানা ধরনের গল্পগুজব করত। এধরনের কাজে নারী, পুরুষ ও শিশুর নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। শহরাঞ্চলে এর বেশীর ভাগই সিনেমা দেখা, থিয়েটার কিংবা ফুটবল খেলা দেখার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে।

এদের খাদ্যাভাসেরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামে তারা ভাত, সবজী, ডাল বা কখন কখন আমিষ আহারেই সন্তুষ্ট থাকত। এখন তরা খুব বেশী পরিমাণে রুটি, শাকসবজী, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ প্রভৃতি ব্যবহার করছে। চা পান করা তাদের নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

শহরে আদিবাসী ও অন্যান্য মানুষদের মধ্যে স্বাধীনভবে মেলামেশার সুযোগ থাকে। এদের মধ্যে বেশ কিছু বিবাহের কথাও জানা গেছে। তাদের মধ্যে শহুরে ভাষা গ্রহণ করার প্রবণতাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিবাসী জীবনে ধর্মের প্রভাব কমেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, শহুরে পরিস্থিতিতে আদিবাসীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা বৃহত্তর জনসমাজেরই একটি অংশ হিসেবে গড়ে উঠছে। তারা ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী হবার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সংমিশ্রণের আকারটি গড়ে ওঠার পথে। অবশ্য, আমরা দেখতে চাই যে, আদিবাসী মানুষরা পুরোপুরি শহুরে শিল্প ব্যবস্থার জোয়ারে ভেসে যায়নি বরং তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে।

২০.৮ ভারতে আদিবাসীদের বিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

আদিবাসী মানুষরা তাদের অনুন্নত কৃৎকৌশল সার্বিক অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচিতির ফলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার জটিল সমস্যার কারণে জতির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আদিবসী সমস্যা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল-সংরক্ষণবাদী, আত্তীকরণবাদী ও সংহতিকামী।

২০.৮.১ সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র করে রাখার প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সরকার এই আদিবাসীদের অন্যান্য জনগণের থেকে আলাদ করে রাখার পক্ষপাতী ছিল। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক ছিল। কারণ, প্রশাসনের এক্তিয়ার পাহাড় ও বনাঞ্চলে পৌঁছাত না। বহু ব্রিটিশ প্রশাসক অনুভব করতেন যে, আদিবাসীদের জীবনধারায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তা দেশের অন্যান্য এলাকার জীবনধারার চেয়ে অনেক সন্তোষজনক ছিল। তবে, এটি ছিল জনগণকে জাতীয় আন্দোলনের উদ্বেল থেকে দূরে রাখার ঔপনিবেশিক নীতি।

এই স্বতন্ত্রীকরণ নীতি নৃতত্ত্ববিদদের ওপর ভ্রান্তভাবে আরোপ করা হয়েছিল। কারণ, মনে করা হ'ত, তারা তাদের গবেষণার স্বার্থে আদিবাসী সংস্কৃতির প্রাচীন রূপকেই সংরক্ষণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। একদা ভেরিয়ার এলউইন (Verrier Elwin) যাতে অনিয়ন্ত্রিত সংযোগের ফলে বহিরাগতদের দ্বারা আদিবাসীদের প্রবল শোষণ না ঘটে সেজন্য 'পার্কল্যান্ড তত্ত্ব' প্রয়োগ করার কথা বলেছিলেন।। অবশ্য স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তিনিই আদিবাসী অঞ্চলে গঠনমূলক হস্তক্ষেপের নীতির সব থেকে বড় সমর্থক ছিলেন।

২০.৮.২ আত্তীকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

আত্তীকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ আদিবাসী এলাকায় মানবিক কাজের সঙ্গে জড়িত সমাজসেবী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি প্রস্তাব করেছিল। তারা সেবা ও আদর্শের ধ্যানধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যদিও তাদের সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আদিবাসী অনুভূতিকে আহত করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস হ'ল অধ্যাপক ঘুরের (Ghurye) তত্ত্ব যেখানে তিনি বলেছেন যে, আদিবাসীরা হ'ল পশ্চাৎপদ হিন্দু যাদের কৃৎকৌশলের দিক থেকে অগ্রণী জনগণ বন ও পাহাড়

অঞ্চলে সরিয়ে দিয়েছে।

এই মতবাদের ভিন্ন প্রবক্তরা হ'লেন খ্রীস্টান মিশনারীরা, যাঁরা অনুভব করেছিলেন আদিবাসী সমস্যা দূর করার একমাত্র উপায় হ'ল তাদের খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। যদি আদিবসীদের একটি নতুন বিশ্বাসে ধর্মান্তকরণের ফলে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পায় এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে মনে না করে ও আধুনিক জীবনে ভালভাবে যোগ দিতে পারার উপযুক্ত হয় তবে এই ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু, এর ফলে যদি এটি তাদের বিকল্প সন্তুষ্টি অনুভবের বদলে বিচ্ছিন্ন ও অদিবাসী চরিত্র হনন করে, তবে এ ধরণের গূঢ় সমস্যার জন্যে এই মতবাদ কোনও আন্তরিক সমাধান নয়।

২০.৮.৩ সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী সংরক্ষণবাদী, যেখানে বলা হয়েছে যে, আদিবাসীদের বিশেষ স্বকীয়তাকে নষ্ট না করেই জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে তাদের অংশীদার করার প্রচেষ্টা করা হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি হ'ল নকশার মত যেখানে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। নৃতত্ত্ববিদরা আদিবাসীদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক ও কাম্য উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ ধরণের পরিকল্পনার জন্য তারা যথেষ্ট সতর্ক ও যত্নবান হবার পরামর্শ দিয়েছেন এবং কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সন্দেহজনক মূল্যবোধ তৈরীর ক্ষেত্রে আপত্তি করেছেন। এই সমস্যার বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদদের চিন্তাধারার একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি জাতীয় নীতিতে গৃহিত করা হয়েছে। তাঁরা আদিবাসী সংস্কৃতির গুরুত্বকে বোঝার উপর জোর দিয়েছেন; কেবল তাদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করাই নয়, তাদের জীবনের সংহতিকারী শক্তিগুলি, যা তাদের সংস্কৃতির কাঠামোর সঙ্গে অপরিহার্য্য যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে, সেগুলি বোঝার ওপরও জোর দিয়েছেন। তাঁরা আদিবাসীদের প্রয়োজনকে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার জন্য যথেষ্ট সতর্কভাবে উন্নয়নের নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন। তাঁরা যে সমস্ত ব্যবস্থা চালু করার ফলে তাদের সামাজিক সংহতি নষ্ট হবার এবং তাদের বাঁচার আনন্দ নষ্ট হবার সম্ভাবনা সেই উপাদানগুলি নির্মূল করার জন্য সতর্ক দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনের সুপারিশ করেছেন।

আদিবাসী উন্নয়নের পথপ্রদর্শিকা নীতি হিসেবে আমদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর চিন্তাধারাকে ভেরিয়ার এলউইন যথাযোগ্যভাবে 'আদিবাসী পঞ্চশীল' নামে চালু করেছিলেন। পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি হ'ল যথাক্রমে — আদিবাসী জনগণ তাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নতি করবে; প্রভাবশালী জনগণ কোনকিছু তাদের উপর চাপিয়ে দেবে না; ভূমি ও বনাঞ্চলে আদিবাসীদের অধিকারকে মানতে হবে; উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব আমাদের গড়ে তোলা উচিত; ঐ অঞ্চলে কোন প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশাসন থাকবে না; তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমেই কাজ চালানোর প্রচেষ্টা রাখতে হবে এবং সবশেষে এসবের ফলাফল অর্থ-ব্যয়ের পরিমাণের উপর নয় বরং কি ধরনের মানবিক চরিত্র বিকাশের মাধ্যমে হ'ল তার উপর নির্ভর করবে।

ভারতের আদিবাসী গঠনমূলক চিন্তা ও পরিকল্পিত সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি আনার ভাল সুযোগ এনে দিয়েছে। বর্তমানে একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, আদিবাসী সমস্যা কেবল গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সমস্যার আরেকটি সংযোজন নয়। যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি একে অপরের থেকে পৃথক নয় বরং সহযোগী। আমরা অবশ্যই আদিবাসীরা তাদের যে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে সেরা মনে করে সেগুলিকে সংরক্ষণ করব, এবং তারাও অন্যান্য জনগণের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গ্রহণ এবং স্বীকরণ

করবে, আর এভাবে তাদের সঙ্গে শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, মানসিক ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ হবে। যতদিন না এই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে, ততদিন ভারতে জাতি গঠনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

অনুশীলনী ৪

১) আদিবাসিত্ব হনন কাকে বলে ? দু'লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

২) শহুরে ব্যবস্থায় আদিবাসীদের সমজাতীয়তা বর্তমান থাকে।

হাঁ ☐ না ☐

৩) জাতীয় জীবনে আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার জন্য তিনটি মতবাদের নাম কী ?

.....

.....

.....

৪) ব্রিটিশরা আদিবাসী উন্নয়নের জন্য সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল।

হাঁ ☐ না ☐

৫) 'আদিবাসী পঞ্চশীলের' পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কী কী।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২০.৯ সারাংশ

ব্যবস্থা হিসেবে জাতপাত বৈষম্যবাদী। এই অসাম্যের সৃষ্টি কেবল সমাজের বিধিগত গঠন থেকেই নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকেও। জাতপাত এবং প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।

ব্রিটিশরা জাতপাত ব্যবস্থাকে জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তাদের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি

একদিকে সাংস্কৃতায়নের গতিকে সুদৃঢ় করেছিল, অন্যদিকে জাতপাত সম্বন্ধে সচেতনতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

স্বাধীনোত্তরকালে নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ (বিভিন্ন জাতের সংশ্লেষ ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ভিত্তি প্রসার) জাতপাতের আচারগত দিকটিকে দুর্বল করেছে।

প্রগতির ধারার উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় যে, জাতপাত ব্যবস্থা তার চিরায়ত অস্তিত্বের থেকে অভাবনীয়ভাবে পরিবর্তিত হবে।

ভাষা এবং অর্থনীতির দিক থেকে ভারতের আদিবাসীরা ভিন্নতর গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সাম্প্রতিকালে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার জন্য আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও, আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে জমি থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, ভূমিহীনতা, ঋণগ্রস্ততার সমস্যা রয়েছে। শিল্পায়ন, শিক্ষা, মুদ্রা প্রচলন ও নগরায়ন শহরবাসী আদিবাসীদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুততর করেছে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মানুষের আদানপ্রদানে আদিবাসীরা বিশেষ লাভবান হয়নি। ভারতের আদিবাসীদের বিভিন্নতা বিবেচনা করলে একথা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয় যে, জাতীয় জীবনে উন্নতির জন্য তারা সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। এটা তাদের প্রয়োজনানুসারে উন্নতির কথাই বলে।

২০.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

জাতপাত : উচ্চনীচ, পবিত্র-অপবিত্র এবং বংশানুক্রমিক জীবিকার ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত আন্তঃবিবাহমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

জাত-দ্বন্দ্ব : অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করে জাতপাত-গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব।

যজমানি : বিভিন্ন জাতপাত-গোষ্ঠীর মধ্যে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের ভিত্তিতে বস্তু ও সেবার পারস্পরিক আদান-প্রদান ব্যবস্থা।

জাতীয় ঐক্য : বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যমূলক স্বীকরণ পদ্ধতি।

সংস্কৃতায়ন : ব্রাত্য জীবনধারা পরিত্যাগের পদ্ধতি ও নিম্নশ্রেণীর জাতের দ্বারা উচ্চতর জাতের মর্যাদা অর্জনের জন্য উচ্চতর জাতের জীবন-ধারা ও বিশ্বাস গ্রহণের প্রচেষ্টা।

ঝুম-চাষ : পাহাড়ী এলাকায় শস্য উৎপাদনের এক পদ্ধতি। এ ব্যবস্থায় শীতকালে পাহাড়ের গায়ের ঝোপ-জঙ্গল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাই জমিতে ছড়িয়ে পড়ে সারের কাজ করে। একস্থানে এক বা দুই ঋতু চাষের পর আবার অন্যস্থানে একই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়।

পণ্য-শস্য : কেবলমাত্র বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের জন্য উৎপাদিত শস্য।

আদিবাসীত্বহনন : আদিবাসী মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রথা এবং জীবন-ধারা ত্যাগের পদ্ধতি।

২০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Beteille, A : *The Idea of Natural Inequality and Other Essays*, Delhi : Oxford University, 1983

Rao, M. S. A. : *Social Movement and Social Transformation : A study of Tow Backward Class Movements in India, Delhi.*

Sarkar, Sumit : *Modern India : 1885-1945*, Delhi : Macmillan, 1983.

Singh, Yogendra : *Social Stratification and Social Change in India*, Delhi : Manohar, 1977.

Srinivas, M. N. : *Caste in Modern India and other Essays*, 1962. Asia Publishing House.

২০.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) জাতপাত সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রথাগত ব্যবস্থা। ব্যবস্থা হিসেবে জাতপাত বৈষম্যবাদী। বংশ অথবা আরোপিত সামাজিক মর্যাদা, বিশুদ্ধতা ও কলুষতার ধারণা এবং জীবিকার বিশেষীকরণের ভিত্তিতে একে সমর্থন জানানো হয়।

২) হ্যাঁ

৩) হ্যাঁ

৪) এটি এখানকার জনগণের মধ্যে জাতপাতগত অযোগ্যতাকে স্থায়িত্ব দিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজের বিখণ্ডিকরণ প্রক্রিয়াকেও স্থায়িত্ব দিত।

অনুশীলনী ২

১) এটি তপশীলী জাতি ও আদিবাসীদের জন্য বিধানসভায় ও সংসদে আসন সংরক্ষণ, সরকারী চাকরী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকার সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে সংরক্ষণধর্মী বৈষম্যের ব্যবস্থা করেছিল।

২) এগুলি ন্যায়সঙ্গত নাগরিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক,, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দাবীগুলিকে উত্থাপিত করে।

৩) হ্যাঁ।

৪) সংবিধান প্রণয়ন, নির্বাচনী রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, যোজনা এবং সংস্কার আন্দোলন জাতপাত ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে।

অনুশীলনী ৩

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

৩) আদিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে।

৪) না।

৫) আদিবাসী কৃষকদের প্রধান সমস্যাগুলি হ'ল ভূমি-বিচ্ছিন্নতা, ভূমিহীনতা, ঋণগ্রস্ততা, দাস-মজুরত্ব, কেবল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চাষবাস এবং প্রযুক্তির পশ্চাৎপদতা।

অনুশীলনী ৪

১) এটি আদিবাসী সাংস্কৃতিক রীতি হরণের প্রক্রিয়া।

২) না।

৩) সংরক্ষণবাদী, আত্তীকরণবাদী ও সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী।

৪) না।

৫) (ক) তাদের নিজস্ব ধারায় উন্নতি।

(খ) বরিষ্ঠ জনগণের গৃহীত নীতি প্রয়োগ নয়।

(গ) তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

(ঘ) কোন অতি-প্রশাসন নয়।

(ঙ) মানব-চরিত্রের গুণগত উৎকর্ষের ভিত্তিতে ফলাফল বিচার করা।

একক ২১ ❑ জাতীয় ঐক্যের সমস্যা : আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা

গঠন

২১.০ উদ্দেশ্য

২১.১ প্রস্তাবনা

২১.২ অঞ্চল এবং আঞ্চলিকীকরণ

২১.৩ ঔপনিবেশিক বিকৃতিসমূহ এবং আঞ্চলিক গঠন

২১.৩.১ ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির চিত্র

২১.৩.২ ঔপনিবেশিক যুগে শিল্পের বিকাশ

২১.৪ স্বাধীনতার পর কৃষি বিকাশের পরিবর্তনশীল আঞ্চলিক ধারা

২১.৫ স্বাধীনতার পর শিল্পের বিকাশ এবং অঞ্চলসমূহ

২১.৬ অগ্রগতির হার এবং আঞ্চলিক বিকাশ

২১.৭ আঞ্চলিক বিকাশের ভারসাম্য রক্ষার উপাদান

২১.৮ পরিকল্পিত বিকাশ, আঞ্চলিক বিশেষীকরণ এবং ক্ষেত্রগত নির্ভরশীলতা

২১.৯ সারাংশ

২১.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২১.১২ উত্তরমালা

২১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে আঞ্চলিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জাতীয় ঐক্যের কিছু কিছু সমস্যা এই সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে উত্থিত হয়, যা আবার আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে - যেখানে দেশের কোন কোন অঞ্চল অন্য অঞ্চলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এই এককটি পাঠ করলে আপনি ভারতে আঞ্চলিক বিকাশের সমস্যা এবং নীচে উল্লেখিত বৈশিষ্টগুলিকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন :

- একটি ধারণা হিসেবে 'অঞ্চল'।
- ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং আঞ্চলিক গঠন।
- কৃষি ও শিল্পে আঞ্চলিকীকরণের পরিবর্তনের ধারা।
- সুসমঞ্জস্য আঞ্চলিক বিকাশের জন্য পরিকল্পনা।

২১.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি আপনাকে ভারতে আঞ্চলিক বিকাশের সমস্যা ও স্তর সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেবে। আঞ্চলিক বৈষম্য আমাদের জাতি গঠনের অসমাপ্ত কাজের পরিণতি। এগুলি একান্তভাবেই প্রতিফলিত করে স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের বিকাশের জন্য গৃহীত নীতির অপর্যাপ্ততাকে এবং ঔপনিবেশিক শাসন যেসব বিকৃতি ঘটিয়েছিল সেগুলি সংশোধন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাকে। এই সমস্যা ভয়ঙ্কর মাত্রা পেয়েছে এবং জাতি রাষ্ট্রের মূলেই আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। সেজন্য এটি দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আঞ্চলিকীকরণের ধারাকে আরও ভালভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তাকে, আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার প্রকৃতিকে এবং সময় জুড়ে তাদের পরিবর্তনশীল গঠনকে।

২১.২ অঞ্চল এবং আঞ্চলিকীকরণ

ডাডলে স্ট্যাম্প, পিথাওয়ালা এবং কুরিয়ান ছাড়া চল্লিশের শেষ অবধি ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের উপর খুব বেশী কাজ হয়নি। অবশ্য বিখ্যাত অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক আর. সি. দত্ত ব্রিটিশ ভারতের ভূমিব্যবস্থার আঞ্চলিক পার্থক্যের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন — যেমন পূর্বভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দক্ষিণ ভারতে অস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি। ব্রিটিশরা তাদের 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' নীতি অনুসরণ করে বাংলাকে রাজনৈতিক কারণে ভাগ করতে চেয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের মূল ভাবটি, যা অংশত উত্থিত হয় সফল বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, সেটি নতুন শক্তিসঞ্চয় করে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ধারণার মধ্যে। ফলে পরবর্তীকালে, যদিও ভারতের সংবিধান গড়ে ওঠে ভারত সরকারের আইন ১৯৩৫-কে অবলম্বন করে, যার ভিত্তিতে স্থাপিত হয় আঞ্চলিক সরকারের গঠন, আঞ্চলিকীকরণ এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যের প্রশ্ন পিছনে চলে যায়।

যাই হোক, দেশের মধ্যেকার আর্থ-সামাজিক পার্থক্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দ্রুত বাড়তে আরম্ভ করে এবং রাজ্য পুর্নগঠন নিগম এই বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। তবে প্রারম্ভিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে এবং নির্বাচিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে কেন্দ্রীভূত করে অর্থনীতির অগ্রগতির হারের দ্রুত বৃদ্ধি করা। এর কাজ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে প্রাপ্ত শহরের শিল্প পরিকাঠামোকে কাজে লাগানো।

মূলত গঠনতান্ত্রিক উপাদানের উপর নির্ভর করে পাঁচের দশকে নীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে কিছু আঞ্চলিক নকশা রচনা করা হয়। ভারতের আদমসুমারী (১৯৫১) প্রাকৃতিক অঞ্চলের ধারণার পুনঃপ্রবর্তন করে এবং পাঁচটি সম্ভাবনা পূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিত করে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠনগত ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদানের উপর নির্ভর করে একটি আঞ্চলিক প্রকল্প রচনা করে। ব্যক্তিগতভাবে অনেক গবেষক সচেষ্ট হন উক্ত উপায়ে আঞ্চলিকীকরণে। পাঁচের দশকের মধ্যবর্তী কাল থেকে কৃষি অঞ্চলের সীমানা নির্দ্ধারণে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এটা উল্লেখ্য যে, ভারতে আঞ্চলিকীকরণের প্রক্রিয়া মুলত পাঁচের দশকে ভূতত্ত্ববিদ্, ভূগোলবিদ্ এবং কৃষি বিশেষজ্ঞরাই শুরু করেন আঞ্চলিক উপাদানের নক্সা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে। কিন্তু নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়াতে হয় আঞ্চলিক মাত্রা পূর্ণমাত্রা অবজ্ঞা করা হয় — যেমন ১৯৫৬ সালের ঘোষিত শিল্প নীতিতে (যেখানে সম্পূর্ণভাগে আঞ্চলিক প্রেক্ষিতটি অনুপস্থিত ছিল), অথবা ভাষা এবং জনগোষ্ঠীগত উপাদানকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার প্রকাশ ঘটে ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন নিগমের প্রতিবেদনে। আঞ্চলিকীকরণের আর্থ-সামাজিক বিষয় উপযুক্ত গুরুত্বলাভ করেনি ভারতের আঞ্চলিকীকরণের গঠন পর্বে।

আঞ্চলিকীকরণ এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা সম্পর্কে অনুসন্ধান অর্থপূর্ণ আকারে আর্থ-সামাজিক মাত্রায় একীভূত করার প্রচেষ্টা শুরু হয় ছয়ের দশকের গোড়াতে। এক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের ভারতের আদমসুমারী কর্তৃক প্রকাশিত সেনগুপ্ত এবং স্পাস্যুকের (১৯৬১) ভারতের অর্থনৈতিক আঞ্চলিকীকরণ, একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ১৯৬২ সালে পরিকল্পনা কমিশন গবেষণা শুরু করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিকে আর্থ-সামাজিক সূচকের দ্বারা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে। কমিশন কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা দেবার জন্য জনসংখ্যা, আয়, কর সংগ্রহের প্রচেষ্টা এবং উন্নয়নখাতে ব্যয় প্রভৃতি বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে, যা গ্যাডগিল ফর্মূলা নামে খ্যাত। এটির ভিত্তিও ছিল ,কটি পরোক্ষ আঞ্চলিকীকরণের ভাবনা। ১৯৬১ সালে জেলাগুলির আর্থ-সামাজিক বিকাশের স্তর নিরূপণের জন্য একটি বিস্তৃত গবেষণা করেন অশোক মিত্র (১৯৬১) এবং ভারতের আদমসুমারী এটিকে একটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করে। তৃতীয় ও তার পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি এবং ছয়ের দশকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিভাগের দ্বারা গৃহীত নানা কর্মসূচী দেশের মধ্যে এবং এক একটি রাজ্যের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যকে সরাসরি স্বীকার করে নেয়। এই অবস্থায় প্রয়োজন দেখা দেয় উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবনে আঞ্চলিক মাত্রাটি বিবেচনা করার। সুতরাং, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় আঞ্চলিক মাত্রার গুরুত্ব বৃদ্ধি, অঞ্চল বিষয়ে গবেষণা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ নতুন মাত্রা ও গুরুত্ব লাভ করে। কৃষি সম্পর্কে জাতীয় নিগম (১৯৭৬) বিস্তারিতভাবে কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চল নিরূপণে সচেষ্ট হয়।

অনুশীলন ১

১) ভারতে 'অঞ্চল'কে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে —

(ক) কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতের নিরিখে।

(খ) কেবলমাত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার নিরিখে।

(গ) কেবলমাত্র ভাষার নিরিখে।

(ঘ) কেবলমাত্র শস্য-উৎপাদনের ধারার নিরিখে।

(ঙ) কেবলমাত্র শহরের জনসংখ্যার ঘনত্বের নিরিখে।

(চ) পূর্বোক্ত সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ে এবং অন্য কতকগুলি আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসহ, যেমন, জমির মালিকানার বণ্টন, ব্যাঙ্ক-ঋণের সহজলভ্যতা, ভূমিহীনতার উপস্থিতি, উপজাতিদের উপস্থিতি ইত্যাদি।

আপনি উপরোক্ত ছয়টি বিকল্প উত্তরের মধ্যে যেটিকে সঠিক বলে মনে করেন সেটিকে (✓) চিহ্ন দিন। আপনার পছন্দ করা উত্তরটি যে সঠিক তার সমর্থনে চারটি বাক্য লিখুন। যদি আপনি মনে করেন যে, পূর্বোক্ত ছয়টি উত্তরের বাইরে কোন উত্তর আছে, তাহলে সেই উত্তরটিও যুক্তিসহ লিখতে পারেন।

.....

.....

.....

.....

২১.৩ ঔপনিবেশিক বিকৃতিসমূহ এবং আঞ্চলিক গঠন

২১.৩.১ ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির চিত্র

ভারতবর্ষের বিশাল পলিজ সমভূমি এবং সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই এই দেশ অন্যতম মুখ্য কৃষি অঞ্চল হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা এবং মৌসুমী বায়ুর খামখেয়লীপনা-জনিত সমস্যা মোকিলার জন্য বাঁধ, পুকুর এবং কুয়োর সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা সুদূর অতীতকাল থেকেই এখানে চলে আসছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে সভ্যতার বিকাশ ঘটে মূলত কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের ফলে। সেজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সমসাময়িক অগ্রগতির মানদণ্ডে ভারতবর্ষকে একটি যথার্থ উন্নত কৃষিক্ষেত্র হিসেবে দখল করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে কেমনভাবে প্রভাবিত করেছিল ? প্রথমত, এই ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল কাজের লোকের আনুপাতিক হার বিবর্ধিত হচ্ছিল; দ্বিতীয়ত, চাষের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছিল এক বৃদ্ধাবস্থা। তৃতীয়ত, ভূমি এবং সেচ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রান্তিক; এবং পরিশেষে, কৃষি উৎপাদনের দায়িত্ব ক্রমাগত স্থানান্তরিত হচ্ছিল তাদের উপর, যারা জমির প্রকৃত মালিক ছিল না। এই সমস্ত ঘটনা লক্ষণীয়ভাবে জমি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করে। কৃষিক্ষেত্রে এই সমস্ত উপাদানের কু-প্রভাব দেশে সব অঞ্চলে অবশ্য এরকম ছিল না। ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির উৎপাদনশীলতাকে কেন্দ্র করে উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে ক্রমাগত পার্থক্য বেড়ে চলেছিল। প্রথমোক্ত অঞ্চলে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেলেও পূর্বাঞ্চল কৃষিক্ষেত্র অত্যন্ত বিশ্রীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কলকাতাকে শীর্ষে রেখে পূর্ব ভারতে রেল লাইন তৈরির কাজে মোটা টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সেচের জন্য অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তাছাড়া, সামঞ্জস্যহীনভাবে অত্যন্ত অল্প অর্থ, যা সেচের কাজে ব্যয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকে, ব্যয়িত হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পনের বছরে, সেচের কাজে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মিলিত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র পাঁচ শতাংশ, অপরদিকে পাঞ্জাবে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সাধারণভাবে চল্লিশ শতাংশের উপর। ফলে স্বাধীনতার সময়ে ভারতবর্ষ উত্তরাধিকার হিসেবে পেল একটি অচল ও প্রকটভাবে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীন কৃষিক্ষেত্র।

২১.৩.২ ঔপনিবেশিক যুগে শিল্পের বিকাশ

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের শিল্পের ভিত্তি রচিত হয়। এই প্রারম্ভিক সময়ে শিল্পক্ষেত্রে গভীরভাবে নিহিত ছিল যে দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা, তাই পরবর্তীকালে, এমনকি সমসাময়িক ভারতে, শিল্পের ধারাতে, বিশেষ করে তার আঞ্চলিক প্রেক্ষিতকে, ক্রমাগত প্রভাবিত করে।

ব্রিটিশ শক্তি পৃথিবীর আপেক্ষিকভাবে অন্যতম উন্নত শিল্প-অর্থনীতির অধিকারী হয় যখন তাঁরা ভারতবর্ষকে জয় করে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে। ভারতীয় শিল্প নিগম (১৯১৬-১৮) এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, "যখন ব্যবসায়ী অভিযানকারীরা পশ্চিমী দেশ থেকে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তখন এই দেশের শিল্পায়ন কোনও অংশে অগ্রবর্তী ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ে ছিল না।"

ইতিহাসের ঐতিহ্যের নিরিখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশ কেবল হস্তশিল্পে এবং কৃৎকৌশলেই সমৃদ্ধশালী ছিল না; শিল্পসম্পদের ক্ষেত্রেও এটি ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ। ভারতীয় শিল্প নিগম এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, 'খনিজ সম্পদে এই দেশ প্রধান প্রধান শিল্পের চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল।' এই কথা তথাকথিত তদানীন্তন অনেক উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও বলা যেত না।

কেমন করে ব্রিটিশরা তাঁদের এই উপনিবেশের সমৃদ্ধ শিল্পধারার উত্তরাধিকার এবং অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাল ? তারা প্রাচীন ও মধ্য যুগের কৃষি-শিল্প সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে 'ইংল্যান্ডের একটি কৃষিকার্যে' রূপান্তরিত করে। সরকারের শিল্পনীতি, বিশেষ করে প্রাক্ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ পর্যায়ে, ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শ্রেণীর নির্দেশমত ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সরবরাহের উপাঙ্গে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে রূপান্তরিত করে। ফলে ভারতবর্ষে বি-শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

ঔপনিবেশিক যুগে শিল্পের অগ্রগতির জন্য গৃহীত প্রক্রিয়া ছিল দুর্বল এবং ভোগ্যদ্রব্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এই প্রক্রিয়া অগ্রগতিকে বিপরীতমুখী করে। মূলধনীদ্রব্যের ক্ষেত্রের অনুপস্থিতির ফলে যা ইউরোপীয় জাতিগুলিকে স্ব-নির্ভর শিল্পায়নের পথে এগোতে সাহায্য করেছিল, এদেশের শিল্প কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও ব্রিটিশরা জেনেভা সম্মেলনে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর একটি অন্যতম 'শিল্পোন্নত দেশ' বলে বর্ণনা করে, বস্তুত এটি ছিল মাটির পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক অতিকায় মূর্তির মত।

ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ থেকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে প্রচেষ্টা গৃহীত হয় তা কেবল গঠনগতভাবে বিপরীতমুখী ছিল না, আঞ্চলিকভাবে বিকৃতও ছিল। প্রাচীন, বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলি যেমন — সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং ছোট ও মাঝারি বহু শহর যেগুলি আধুনিক শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের কেন্দ্র হতে পারত সেগুলি দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। একটি মাথাভারি জায়গা দখলকারী ক্রমোচ্চ ব্যবস্থায় বন্দর-শহর যেমন- কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ শীর্ষ বন্দর-শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অল্প কিছু অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল এবং ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের স্থাপন করা হয় বন্দর সংলগ্ন এলাকায় এবং ছোট ছোট শহরে। সেগুলি গড়ে উঠেছিল বন্দর-শহরের লেজুড় হিসেবে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিল্পে নিম্নমুখী অংশগ্রহণের উপরে বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। তাছাড়া, তৎকালীন রাজ্যগুলি এই সীমিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল।

এক বন্দরভিত্তিক বিকেন্দ্রীমুখী পরিবহণ ব্যবস্থা যা ছিল মূলত রেল-নির্ভর, গড়ে তোলা হ'ল বিস্ময়কর ব্যয়ে। ফলে, বন্দর-নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শিল্পায়নের এক ধরনের অবরুদ্ধ ঘাঁটি। সেজন্য দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্প-মানচিত্রে সম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চল শিল্পে অনুন্নত; অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শিল্পে এবং পরিবহণে যে নতুন উন্নয়ন ঘটে সেগুলি ছিল খুবই স্থানীয় এবং এর প্রভাব সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে ছিল খুবই প্রান্তিক। একে বলা হয় অবরুদ্ধ ঘাঁটির ধাঁচের উন্নয়ন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলিতে, যেখানে পূর্বোক্ত বন্দর-শহর ছিল, শিল্পক্ষেত্রের কর্মীবাহিনীর এবং দেশের উৎপাদনের সত্তর ভাগের বেশী অংশ ছিল। ইঞ্জিনীয়ারিং ও বৈদ্যুতিক পণ্য এবং রসায়ন শিল্পে মোট উৎপাদনে এই সমস্ত রাজ্যের অংশ ছিল যথাক্রমে ৮৩ শতাংশ এবং ৮৭ শতাংশেরও বেশী। অপরদিকে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের মোট শিল্পক্ষেত্রে কর্মী বাহিনী যোগানের অংশ ছিল কুড়ি শতাংশেরও নীচে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ নীতি শিল্পায়নের পদ্ধতিকে পরিমাণগতভাবে দুর্বল করে এবং এবং গঠনগতভাবে করে তোলে বিপরীতমুখী, কারণ একটি গড়ে ওঠে মূলত

অপর্যাপ্তভাবে গড়ে ওঠা মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে। তাছাড়া, এটি খনিজ সম্পদে ভরপুর মধ্যপ্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা, কর্নাটক প্রভৃতি অঞ্চল অধরা রাখে। পক্ষান্তরে, শিল্পোন্নত কিছু অঞ্চল, যেগুলি পারদর্শী হয়ে ওঠে কিছু মূল প্রক্রিয়াকরণ এবং ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন শিল্পে, সেগুলি দ্বীপের মত গড়ে ওঠে বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করে।

অনুশীলনী ২

১) ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক গঠনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি দেখা যায়—

(ক) উত্তর-পশ্চিম এবং ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বাঞ্চলের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের পার্থক্য বর্ধিত হয়।

(খ) রেলপথ গড়ে ওঠে কোলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজের মত মুখ্য বন্দরগুলির সঙ্গে তাদের পশ্চাদ-প্রদেশের যোগাযোগ ঘটাবার জন্য।

(গ) রেলপথ উন্নয়নের জন্য সেচের ক্ষতি করে মোটা টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

আপনি কি মনে করেন এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দেশের ইতিবাক উন্নয়নের সহায়ক ছিল ? যদি বলেন - না, তাহলে কেন ? তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার উত্তর দু'টি বাক্যে লিখুন।

.....

.....

২১.৪ স্বাধীনতার পর কৃষি বিকাশের পবির্তনশীল আঞ্চলিক ধারা

ভারতীয় অর্থনীতির কৃষিক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। পাঁচের দশকে কৃষিক্ষেত্রে যে সংস্কার সাধন করা হয় তা সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলে এবং ব্যাপকভাবে কৃৎকৌশলগত উপাদান ব্যবহারের পথ প্রশস্থ করে। এর ফলে পরিবেশগত বাধা দুর্বল হয়ে পড়ে। পাঁচের দশকে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের অগ্রগতির পৌনঃপুনিক হার ছিল তিন শতাংশের বেশী, ষাটের দশকে এই হার কমে দাঁড়ায় প্রায় আড়াই শতাংশে। সাতের দশকে এই বৃদ্ধির হার আরও কমে দাঁড়ায় দুই শতাংশের নীচে। আটের দশকে এই বৃদ্ধির হার ক্রমশ উর্ধমুখী হয়, তবে এই বৃদ্ধি হয় খুবই অস্থায়ী, কারণ বছর বছর ফসলের উৎপাদনের তারতম্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। বৃদ্ধির হার বেশী অস্থায়ী হয় সেই সমস্ত অঞ্চলে, যেখানে কুয়ো এবং পুকুরের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কৃৎকৌশলগত উপাদানের ব্যবহারের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজমির আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেক্টর পিছু বিস্ময়করভাবে ট্র্যাক্টরের সংখ্যা, টিউবওয়েলের সংখ্যা, সার ব্যবহারের পরিমাণ প্রভৃতির বৃদ্ধি ঘটেছে। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, অন্যান্য প্রাথমিক ক্ষেত্রের সঙ্গে একত্রে কৃষিক্ষেত্রের জাতীয় আয়ে অবদান কমতে থাকে। পাঁচের দশকে অবদানের পরিমাণ ছিল প্রায় ষাট শতাংশ, আটের দশকে তা দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ শতাংশের নীচে। অনুরূপভাবে, শ্রমশক্তির গঠনে কোন রূপান্তর দেখা যায়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় সম্পদে কৃষির অবদান কালক্রমে কমতে থাকে, তবে জনসংখ্যার যে অংশ এর সঙ্গে যুক্ত তাদের সংখ্যা কমবেশী একই থাকে। সাম্প্রতিক আদমসুমারী (১৯৮১) এবং জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (২৩তম, ৩২তম এবং ৩৮তম) প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সাতের দশকের শেষ ভাগ থেকে আটের দশকের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কৃষির উপর নির্ভর মানুষের সংখ্যার প্রান্তিক হ্রাস ঘটেছে। যাই হোক, জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান প্রচণ্ডভাবে কমে গেছে যার ফলে কৃষি-শ্রমিকের এবং অ-কৃষি শ্রমিকের

উৎপাদনশীলতার পার্থক্য বেশী করে নজরে পড়ে। এটি নিশ্চিতভাবে গ্রাম-শহরের বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিশেষ করে ছয়ের দশক থেকে, সম্ভব হয়েছে মূলতঃ কৃৎকৌশলগত উপাদানের মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, যেমন বীজ, সার, বস্ত্র ইত্যাদি। পাঁচের দশকে আবার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল মূলতঃ কৃষি জমির আয়তন বাড়ার মাধ্যমে। সরকারের তরফে অতি সচেতনভাবে 'সম্ভাবনাময়' কিছু জেলা বেছে নিয়ে সীমিত মূলধন নিয়োগ করা হয় খাদ্য সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ সমস্ত জেলায় জমি এবং কৃষি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঐ জেলাগুলির সঙ্গে মূলতঃ পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশ, সমুদ্র তীরবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দেশের অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে বেড়ে যায়।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এবং একটি রাজ্যের মধ্যে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার বৈষম্য যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বিভিন্ন গবেষকরা উল্লেখ করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা স্থাপিত ওয়ার্কিং গ্রুপ তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য (পরিবর্তনশীলতার সহগ দ্বারা পরিমাপ করা হয়) ১৯৬১ এবং ১৯৮১ সালের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে।

'সবুজ বিপ্লব' ধারণাটির সাহায্যে ছয়ের দশকের প্রথম দিক থেকে সাতের দশকরে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিকে বোঝায় যা মূলতঃ সার-বীজ, সেচ-ট্র্যাক্টর প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ঘটে। এটি অবশ্য ঘটেছিল কিছু অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। ৪৯তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় যে সতেরটি অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রের তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ চাষের এলাকায় ১৯৬২-৭৫ সালের মধ্য উৎপাদনের পরিবর্তন হয় নেতিবাচক অথবা ইতিবাচক হলেও অগ্রগতির হার অত্যন্ত কম, অর্থাৎ, বৎসরে হেক্টর পিছু মাত্র ১০ টাকা। অন্যান্য বহু অঞ্চলে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা নিম্নমুখী হয় সাতাশটি অঞ্চলে, যা চাষের এলাকার পঞ্চাশ শতাংশের বেশী ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলকে একত্রে বলা হয় দেশের 'ক্ষুধার্ত উদর'। যার বিস্তার ছিল চতুর্দিকে, উত্তরে উত্তরপ্রদেশের হিমালয় থেকে দক্ষিণে নীলগিরি পর্বত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে থর মরুভূমি থেকে পূর্বে উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত। সাতের দশকের প্রথম দিকে যে চৌদ্দটি অঞ্চল জমির অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য খ্যাত ছিল সেখানে সারা দেশের যথাক্রমে ৪৪, ৫০ এবং ৬০ শতাংশ সার, টিউবওয়েল এবং ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা হয় দেশের ২০ শতাংশ জমিতে ৩৬ শতাংশ ফসল উৎপাদনের জন্য। হেক্টর পিছু সার, টিউবওয়েল এবং ট্র্যাক্টরের ব্যবহারের হার ছিল আরো বেশী। যেহেতু উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি সম্ভাবনাময় অঞ্চলে উৎপাদনের হারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধির জন্য কৃৎকৌশলগত উপাদানের ব্যবহারকে নিবিড় করা, এই পরিবর্তন ধনী ও গরীব অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য আরো বাড়িয়ে তোলে।

২১.৫ স্বাধীনতার পর শিল্পের বিকাশ এবং অঞ্চলসমূহ

দেশে ব্যাপকভাবে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পাঁচের দশকে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের বার্ষিক হার ছিল ছয় শতাংশ। এই হার মোট জাতীয় উৎপাদনের গড় ব্যয়ের থেকে বেশী ছিল। এই হার ছিল ৩.৫%, ছয়ের দশকের প্রথম দিকে কল-কারখানাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় — বার্ষিক হার ছিল আট শতাংশের বেশী। ১৯৬৫-৬৬ সালে বৃদ্ধির হার এক শতাংশ কমে যায় এবং এই ক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরগুলিতে প্রকৃত অর্থে এই হার কমতে থাকে। পরে আর কোন সময়ে

ছয়ের দশকের প্রথমের মত, এমনকি পাঁচের দশকের মত উৎপাদনের হার বাড়েনি। আটের দশকে অবশ্য ক্রমশঃ শিল্পক্ষেত্রে তথা সমগ্র অর্থব্যবস্থায় অগ্রগতি দেখা যায়।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্পক্ষেত্রে যে পশ্চাদ্‌গমন দেখা যায়, ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দা সূচিত করে, তার ফলে আঞ্চলিক স্তরে শিল্পের প্রসারের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়।

ভারতে পরিকল্পনায় প্রথম শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির বৈষম্য বড় হয়ে দেখা দেয়। পাঁচের দশক শিল্পে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অসাম্য বৃদ্ধির কাল হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণায় জাতীয় পরিষদ যে তথ্য উপস্থাপন করে তাতে দেখা যায় যে, রাজ্যে রাজ্যে গৌণ ক্ষেত্র থেকে মাথাপিছু আয়ের ভেদাঙ্ক ১৯৫০-৫১ সালে ৫০ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৬০-৬১ সালে। তবে ঐ গবেষণায় উপসংহারে বলা হয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে এই অবস্থা থাকলেও পরে রাজ্যে রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে বৈষম্য ক্রমাগত কমতে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যুরো যেসব তথ্য প্রকাশ করে, যা ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদের মূল্যায়নকে সমর্থন করে, তাতে দেখা যায় যে, ১৯৬০-৬১ সালের বৈষম্যের সূচক ৫৮ শতাংশ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৪৭ শতাংশে নেমে আসে।

আবাসন এবং শহর উন্নয়ন (১৯৮৩) সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন যে টাস্ক ফোর্স গঠন করে তার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজ্যে রাজ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে শিল্পক্ষেত্রের দ্বারা সৃষ্ট মাথাপিছু মূল্যের অসাম্য ১৯৬১-৮১ কালপর্বে কমে আসে। ১৯৬০-৬১ সালে ভেদাঙ্ক ছিল ৯২ শতাংশ যা ১৯৭০-৭১ সালে কমে হয় ৬৭ শতাংশ। ১৯৮০-৮১ সালে এটি হয় মাত্র ৬২ শতাংশ। শিল্পপিছু উৎপাদন, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের অংশ, অ-গৃহ শিল্পে শ্রমের সমানুপাতিক পরিমাণ, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট অথবা উক্ত ক্ষেত্রে প্রতি হাজার নিয়োগ, ইত্যাদি সূচক এই তথ্য উদঘাটন করে যে, রাজ্যগুলির অসাম্য, যা ১৯৫১-৬১ কালপর্বে বৃদ্ধি পায়, পরবর্তী দশকগুলিকে কমতে থাকে বা স্থির থাকে।

যাই হোক্, ১৯৭৩-৭৮ কালপর্বে শিল্পের স্থানিক ও ক্ষেত্রগত পরিবর্তন শিল্পের বাৎসরিক সমীক্ষাতে উল্লেখিত হয়েছে। একটি গবেষণা প্রমাণ করে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্যের হ্রাসকে একেবারে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। এটি আরও প্রমাণ করে যে, উপরের দিকের তিনটি রাজ্যের মোট শিল্পের সংখ্যা, উৎপাদন এবং স্থায়ী মূলধন একত্রে বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেই নিম্নমুখী; অপরদিকে, উপরের দিকের নয়টি রাজ্যের অংশ প্রান্তিকভাবে ঊর্দ্ধমুখী হ'তে দেখা যায়। অতি সম্প্রতি বাৎসরিক শিল্প-সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিল্পের আঞ্চলিক বিকীর্ণতার তত্ত্বটি সঠিক নয়। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যেটা দেখা যায় সেটা হ'ল মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার আপেক্ষিক পরিবর্তন। এর কারণ বম্বে ও কলকাতাতে শিল্পের কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ার হারের নিম্নগামীতা। জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং আরও বহু জিনিষের অভাব, যা শিল্পের কেন্দ্রীভবনের অনুকূল নয়, এই নিম্নগামীতার জন্য দায়ী। বিদ্যুতের ঘাটতি, শ্রম ও আনুষঙ্গিক বস্তুর অভাবের জন্য সাতের দশকের প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে এই অবস্থা দেখা যায়। এর জন্য সরকারে শিল্প বিকীর্ণতার নীতি দায়ী নয়।

আন্তঃরাজ্য বৈষম্য হ্রাসের জন্য শহর উন্নয়নের নীতি দায়ী। এই নীতি প্রায় সব রাজ্যে স্বাধীনতার পর অনুসরণ করা হয়। রাজ্য-রাজধানীতে এবং আরও কয়েকটি কেন্দ্রে রাজ্য সরকারগুলি উচ্চস্তরের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং শহরের সুযোগ-সুবিধা দিতে এগিয়ে আসে। অতিমাত্রায় ভরতুকি প্রদত্ত এইসব সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য প্রবীণ আমলা, পেশাজীবী মানুষ, শিল্পোদ্যোগী মানুষ এবং দক্ষ শ্রমিক ঐ সমস্ত স্থানে জড়ো হয়। সরকার নিজের বিভাগের মাধ্যমে

সরাসরি অথবা বিভিন্ন নিগমের মাধ্যমে ঐ সব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই সরকারী কোষাগার থেকে আসে। কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্বের যোগান থাকায় পুরসভাগুলি বেশি করে নাগরিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করতে পরে অন্যান্য ছোট শহরের তুলনায়। সুতরাং, এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি ভরতুকিপ্রাপ্ত পরিকাঠামো এবং পরিষেবা লাভ করে যা অনুন্নত এলাকায় মূলধন-ভরতুকি ও অন্যান্য উৎসাহ প্রদানকারী সাহায্যকে ছাড়িয়ে যায়। শিল্পপতিরা সেজন্য শহরের মধ্যে অথবা আশপাশে শিল্প স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়। এটি তাঁদের বিভিন্ন বিভাগের আর্থিক সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের সাহায্য করে, যেহেতু এগুলি শহরে অবস্থিত। পরিশেষে, এই ব্যবস্থা তাঁদেরকে তাঁদের কারখানার জন্য দক্ষ শ্রমিক, প্রশাসক প্রভৃতি পেতে সাহায্য করে, কারণ, দক্ষ শ্রমিক, প্রশাসক প্রভৃতি ভাল বাসস্থানের পরিমণ্ডলের দ্বারা আকৃষ্ট হন, যা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য শহরের কিছু কিছু অংশে তৈরি হয়েছে।

২১.৬ অগ্রগতির হার এবং আঞ্চলিক বিকাশ

আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার পরিবর্তনীয় কাঠামো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বিকাশের মোট সাফল্যের মানদণ্ডে, যা প্রকাশিত হয় মাথাপিছু রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (এস. ডি. পি) বা অন্যান্য মোট হিসেবের মানদণ্ডে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে একটি গবেষণায় পাঁচের দশকের ভারতে আন্তঃরাজ্য বৈষম্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং এতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় ঐ দশকের গোড়ায় শুরু হয়, যার বৈশিষ্ট্য ছিল স্থাপিত ভারসাম্যহীনতার বৃদ্ধি। এতে দাবী করা হয় যে জাতীয় বিকাশ এবং আঞ্চলিক বৈষম্য উল্টান U-এর মত বঙ্কিমভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। এটি পরোক্ষভাবে এই ইঙ্গিত দেয় এই প্রাথমিক পর্বের পর ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা সম্ভবত হ্রাস পাবে।

এই সিদ্ধান্তসমূহকে অর একদল গবেষক চ্যালেঞ্জ করেন এবং বলেন যে, আন্তঃরাজ্য বৈষম্য পাঁচের দশকে কমে আসে। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হ'ল যে, গবেষকরা প্রায় সকলে একমত হন যে, তাঁদের সে বৈষম্য কমেনি বরং পরবর্তী দশকগুলিতে বিবর্ধিত হয়েছে। বিশেষ করে সাতের দশকে বৈষম্য অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করে। পরিকল্পনায় কমিশনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত টাস্ক ফোর্স আবাসন এবং নগর উন্নয়নের উপর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, মাথাপিছু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (এস. ডি. পি)-এর পরিবর্তনীয়ের সঙ্গে ১৯৬১ সালে ২৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৭১ সালে ২৬ শতাংশ হয়। ১৯৮১ সালে এটি বেড়ে হয় ৩৩ শতাংশ।

সামগ্রিক উন্নয়নের পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে মাথাপিছু আয়ের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে গবেষকরা সচেষ্ট হন অধিক সংখ্যক সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচকের সাহায্যে উন্নয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়া পরিমাপের। তথ্যনির্ভর এই বিশ্লেষণও প্রমাণ করে যে, ছয়ের দশকের পর থেকে আন্তঃরাজ্য বৈষম্য কমেনি। এটা লক্ষণীয় যে, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার সূচক, যেমন — বৈদ্যুতিক সংযোগপ্রাপ্ত গ্রামের হিসেব, সাক্ষরতার হার, বিদ্যালয়ের যাওয়ার হার, ব্যাঙ্ক এবং প্রতি হাজারে চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, আন্তঃরাজ্য বৈষম্য প্রান্তিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সামগ্রিক অগ্রগতির ভারসাম্যহীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ যা মাথাপিছু এস. ডি. পি. কৃষি অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসমতা বৃদ্ধিকে অংশতঃ ব্যাখ্যা করে। এটা আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন — সেচের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সেচ-সেবিত এলাকার সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন, সারের ব্যবহার, ট্র্যাক্টরের ব্যবহার ইত্যাদি, প্রতি হেক্টরেও আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে ছয়ের এবং সাতের

দশকে। এর ফলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং এই যুক্তি দেখান যেতে পারে যে, রাজ্যে রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে, আর্থিক পরিকাঠামো এবং সরকারী পরিষেবার ক্ষেত্রে অসম বিকাশ কম হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য কমেনি এবং এর প্রধান কারণ কৃষিতে অসম অগ্রগতি, যেখানে দেশের মোট শ্রমশক্তির সত্তর ভাগ নিযুক্ত হয়।

শিল্পের স্থানিক উন্নয়নের ধারা ও আর্থিক পরিকাঠামো প্রভৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি আন্তঃরাজ্য বৈষম্যতার আংশিক চিত্রটি তুলে ধরে। এতে যুক্তি দেখান হয় যে, অল্প কয়েকটি শহরে পরিকাঠামোগত এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে এবং যার ফলে এই সমস্ত কেন্দ্রে শিল্পের একত্রীকরণ ঘটেছে। এর ফলে রাজ্যের সীমানার সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রাম-শহরে বিভাজন ঘটেছে। সুতরাং শিল্পের বিকীর্ণকরণ এবং অনুন্নত এলাকায় পরিকাঠামো রচনার এবং প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নীতি আংশিক সাফল্য লাভ করেছে।

অনুশীলনী ৩

১) আপনি কি মনে করেন যে, স্বাধীনতার পর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ফলে রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে ? যদি তা মনে করেন, তাহলে পাঁচটি বাক্যে ঐরূপ উন্নয়নের সূচকগুলিকে বর্ণনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২) যদি কোন রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন রাজ্যের মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (এস. ডি. পি.) দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তাহলে বিভিন্ন রাজ্যে এই সূচকের অগ্রগতির হারটি কীভাবে ও কেন একটি চেহারা নিয়েছে তিনটি বাক্যে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২১.৭ আঞ্চলিক বিকাশের ভারসাম্য রক্ষার উপাদান

আমাদের দেশে অঞ্চলগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্যতম উপাদান হ'ল সরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, দরিদ্রতর রাজ্যগুলিতে পাঁচের এবং ছয়ের দশকে মাথাপিছু বিনিয়োগের হার বেশী ছিল। এটা ঘটে, কারণ ঐ সমস্ত রাজ্যে লোহার আকরিক, চুনাপাথর প্রভৃতি কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত এবং শিল্পের অগ্রগতির জন্য ঐগুলি ব্যবহার করা হয়। ছয়ের দশকে রাজ্যে মোট

কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিহার এক-তৃতীয়াং, মধ্যপ্রদেশ দুই-তৃতীয়াংশ এবং ওড়িশা নব্বই শতাংশ ব্যয় করে শুধু ইস্পাত কারখানা স্থাপনে। যাই হোক, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, দরিদ্রতর রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতমূলক বিনিয়োগ আশানুরূপ ফল দেয়নি। ছয়ের দশকের শেষের দিক থেকে সাতের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ কমিশনের মাধ্যমে পরিকল্পনাবহির্ভূত খাতে সম্পদ হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও অনুন্নত রাজ্যগুলির স্বার্থে সুনির্দিষ্ট একটি ধারা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। ঐ সময়ে বরং মাঝারি আয়বিশিষ্ট রাজ্যগুলি পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে বেশি অংশ পেতে সক্ষম হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে রাজ্যগুলিকে সম্পদ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যই ছিল বিকাশের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করা। ১৯৫১-৮১ কালপর্বে উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের ন্যায় অনুন্নত রাজ্যগুলি মাথাপিছু হিসেবে বেশি অর্থ লাভ করে। তবে অল্প কিছু উন্নত রাজ্যেও যেমন পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি পরিকল্পনা বরাদ্দ মাথাপিছু হারে বেশী পায়।

নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুনের মাধ্যমে বেসরকারী শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করে, শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুরীর ধরণ দেখলে সেগুলি বিশেষ কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয় না। হাজারী কমিটি লাইসেন্স প্রদানের নীতি, যা শিল্প (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৫১ নামে খ্যাত, পর্যালোচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, এটি দেশের মধ্যে আঞ্চলিক বিকাশের সহায়ক হয়নি। এটি লক্ষণীয় যে, মোট আবেদন এবং লাইসেন্স প্রদানের মধ্যে একটা যথার্থ সমানুপাতিক সম্পর্ক ছিল, যা প্রমাণ করে যে ইতিমধ্যে শিল্পে অগ্রণী রাজ্যগুলি নতুন শিল্প লাইসেন্স বেশী করে পেতে সক্ষম হয়। এটি ঘটে, করণ, এই সমস্ত রাজ্য নিজ নিজ শিল্পোন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে দরবার করতে সক্ষম হয়, এবং প্রায়ই তারা নিজ নিজ এলাকা থেকে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন মঞ্জুর করিয়ে নিতে সফল হয়।

১৯৫৩-৮৫ কালপর্বে লাইসেন্স প্রদানের স্থানিক ধরনটি বিশ্লেষণ করলে লাইসেন্স নীতির কর্মপদ্ধতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা কয়েকটি শিল্পোন্নত রাজ্যে নিম্নমুখী হতে দেখা যায়। এর ফলে অবশ্য শিল্পে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলির লাভ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির ভূমিকা নিম্নমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝারি আয়বিশিষ্ট, রাজ্যগুলি, যেমন — গুজরাট, কর্নাটক প্রভৃতি রাজ্য শিল্প-মানচিত্রে বিশেষ জায়গা করে নেয়; যেমন কেরালা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের লাইসেন্স প্রাপ্তির সংখ্যা সমানুপাতিক হার ঐ সময়ে কমলেও মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যগুলির নিম্নমুখী অবস্থা পাঁচের দশকের হারে অপরিবর্তিত থাকে। যদিও মোট প্রদত্ত লাইসেন্সের এক তৃতীয়াংশের বেশী লাভ করে মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং তামিলনাড়ু। এই তিন রাজ্যে আটের দশকের মাঝামঝি পর্যন্ত, এই সংখ্যা পূর্ববর্তী বৎসরগুলির তুলনায় গড় অনুপতে কম ছিল।

কৃষির বিকাশে এবং শিল্প লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এই ভারসামাহীনতাই বৈষম্যমূলক প্রাতিষ্ঠনিক ঋণ বন্টনের জন্য অংশত দায়ী। দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের অর্থ বরাদ্দকারী উন্নয়ন ও আর্থিক সংস্থা যমন — ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, জীবন-বীমা নিগম, রাজ্য অর্থনিগম প্রভৃতি মাথাপিছু আয় মাত্র ২০ টাকা হারে অর্থ বরাদ্দ করে যেখানে জাতীয় গড় ছিল ১১৬ টাকা। দরিদ্রতর রাজ্যগুলি যেমন — বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং রাজস্থান অতি অল্প পরিমাণ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ লাভ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে শিল্পোন্নত রাজ্যগুলি বেশি পরিমাণ অর্থ আগাম হিসেবে লাভ করে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থকে দেশের বৃহত্তম ঋণদানকারী সংস্থা আই. ডি. বি. আই. ঋণ প্রদানের নীতির পরিবর্তন করে। এই প্রতিষ্ঠান মোট ণের একটি মোট অংশ ঘোষিত অনুন্নত জেলাগুলির জন্য বরাদ্দ করে।

২১.৮ পরিকল্পিত বিকাশ, আঞ্চলিক বিশেষীকরণ এবং ক্ষেত্রগত নির্ভরশীলতা

এক নিশ্চল কৃষিক্ষেত্র এবং একটি দুর্বল ও বিকৃত শিল্পভূমি ভারতবর্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। স্বাধীন ভারত ঐ সহায় সম্বল নিয়ে উন্নয়নের গতি বাড়ানোর এবং অর্থনীতির আঞ্চলিক কাঠামোর ঔপনিবেশিক বিকৃতি সংশোধন করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। সরকার ব্যাপকভাবে মূল ও ভারী শিল্পে বিনিয়োগ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। নির্বাচিত কিছু এলাকায় প্রাপ্ত সম্পদের কেন্দ্রীকরণ করা হয় এবং এইসঙ্গে অর্থ বন্টন করা হয় প্রত্যেক রাজ্যে কৃষির স্থিতিশীলতার জন্য, শিল্পক্ষেত্রের এবং পরিষেবার বিকাশ বৃদ্ধির জন্য। এর ফলে আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের দু'টি মানচিত্রের উদ্ভব ঘটে। প্রথমত, 'একত্রীকৃত ধরন', — যা মূলধন-নির্ভর এবং গড়ে ওঠে অল্প বড় শহরে এবং তার আশেপাশে। দ্বিতীয়ত, 'বিকীর্ণকরণ ধরন' — যা কম মূলধন-নির্ভর এবং ছোট ছোট শহরে ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত।

শিল্পায়নের এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই দুই সুস্পষ্ট ধারার নির্দেশ-নির্ভর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আট কোটি 'একত্রীকরণ' উন্নয়ন ভারতীয় শিল্প মানচিত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। এগুলির মধ্যে পাঁচটি কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর এবং জামশেদপুর শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এবং এদের চারপাশে নিম্ন পর্যায়ের বিকীর্ণ শিল্প গড়ে ওঠে। প্রথম তিনটি কেন্দ্র ঔপনিবেশিক ভারতের বন্দর শহরে গড়ে ওঠে এবং এটাই প্রমাণ করে যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থানিক কাঠামোটি এখনও শিল্পের মূল ভিত্তি বলে বিবেচিত হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোর এবং জামশেদপুর-ধানবাদ অঞ্চলের অগ্রগতির সূচনাও ঔপনিবেশিক যুগে শুরু হয়, তবে স্বাধীনতার পর এদের উচ্চহারে অগ্রগতি হয় মূলত সরকারী আনুকূল্যের জন্য। বন্দর শহরের মত এখানেও আঞ্চলিক অর্থনীতিতে 'একত্রীকৃত শিল্পায়নে'র প্রভাব দুর্বল। এই প্রক্রিয়া প্রায়ই কৃষি উৎপাদনরে নঞর্থক প্রভাব ফেলে এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রভাব দেখা যায়। অর্থাৎ, ছোট ছোট শহরে এবং চারপাশের গ্রামীণ এলাকাতে প্রচলিত শিল্পের এবং হস্তশিল্পের গৌরব অস্তমিত হয়। অপর তিন 'একত্রীকৃত শিল্প'-কেন্দ্র দিল্লী, আমেদাবাদ এবং লুধিয়ানা-জলন্ধর শহরকে কেন্দ্র গড়ে ওঠে, তবে এগুলির সঙ্গে সঙ্গে 'বিকীর্ণ শিল্পে'র ও বিকাশ ঘটে। শিল্প বিকাশের বিকীর্ণ ধারা প্রসারিত হয় দক্ষিণে কেরালায়, অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে, এবং কর্নাটকে, উত্তরে দিল্লী, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে এবং মধ্যাঞ্চলে গুজরাট, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে ও মধ্যপ্রদেশে। গ্রামীণ ও ছোট ছোট শহর নির্ভর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কেরালা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং এই ধারা দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য এলাকাতেও দেখা যায়। ব্যাঙ্গালোর ছাড়া ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাতে 'একত্রীকৃত শিল্পায়নে'র অনুপস্থিতি তাদের অগ্রগতি হার কমিয়ে দেয়। গুজরাট, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা কিছু সাফল্য লাভ করে বিকীর্ণ শিল্পায়নের সঙ্গে একত্রীকৃত শিল্পায়নের সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে। এই অঞ্চলের কৃষির বিকাশ শিল্পায়নকে সহায়তা দান করে উল্লেখযোগ্যভাবে।

এটা বলা যেতে পারে যে, ভবিষ্যৎ বিকাশের ভিত্তি হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক কাঠামোকে গ্রহণ করার ফলে কৃষির বিকাশ ব্যাপকভাবে অসম হয়ে পড়ে। এর ফলে এলাকাভিত্তিক শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্র সীমিতভাবে গড়ে ওঠে স্থানীয় উপাদানের সাহয্যে এবং তৈরী প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে কম উন্নত এলাকার মধ্যে শক্তিশালী সংযুক্তিগড়ে ওঠেনি। যখন অনুন্নত রাজ্যে ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, যার সঙ্গে প্রযুক্তির শক্তিশালী সংযুক্তি আছে ইস্পত শিল্পের, গড়ে উঠল অল্প কয়েকটি বৃহৎ শহরকে কেন্দ্র করে। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থার নিত্যনতুন এবং লাভজনক অংশ অনুন্নত এলাকা থেকে শহরের শিল্প কেন্দ্রে 'পাচার' করার মাধ্যমে উৎপাদনক্ষেত্রগুলি খণ্ডিত হয়। এই চিত্র দেখা যায় ভিলাই, বোকারো, ভূপাল প্রভৃতি স্থানে, যেখানে নতুন শিল্প-কেন্দ্র গড়ে ওঠে ব্যাপক সরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে। এই সমস্ত শহরের অধিকাংশক্ষেত্রে একজন কুড়ি/তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে অতি উন্নত লৌহ ধাতুশিল্প বা বৃহৎ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্পকেন্দ্র থেকে নব্যপ্রস্তুরযুগীয়

পশ্চাৎ প্রদেশের দেখা পাবেন।

বিকীর্ণ শিল্পায়নের সুফল অপরদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষ লাভ করে। তবে এই প্রক্রিয়ার দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, এটি বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না বা বেশীদিন স্থায়ী হয় না, যদি না এটি সঙ্গে 'একত্রীকৃত শিল্পায়নে'র সংযুক্ত ঘটে এবং সেটির মাধ্যমে জাতীয় বাজারের। অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জাতীয় কমিশন (শিবরামন কমিটি) তর প্রতিবেদনে সুপারিশ করে একশটি 'একত্রীকৃত শিল্পায়ন' কেন্দ্র স্থাপনের, যার সঙ্গে আঞ্চলিক অর্থনীতির সম্পর্ক স্থাপিত হবে উৎপাদন এবং বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। অতীতে দেখা গেছে যে, বিকীর্ণ না হয়ে একত্রীকরণ কতকগুলি বদ্ধ ঘাঁটির জন্ম দিয়েছে, আবার একত্রীকরণ ছাড়া বিকীর্ণায়ন প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা এবং অদক্ষতার জন্ম দিয়েছে। সুতরাং আঞ্চলিক অর্থনীতিতে শিল্পায়নের এবং কৃষি বিকাশের দু'টি ধারার ঐক্য সাধন প্রয়োজন। কোন অঞ্চলের উৎপাদন ব্যবস্থা অবশ্যই এমনভাবে গড়ে উঠবে যার ভিত্তি হবে স্থানীয় সম্পদ এবং জাতীয় বাজারের সঙ্গে স্থানীয় বাজারের সংযোগ স্থাপন। এটি সম্ভব হবে যদি জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে পরিকল্পনা রচিত হয় আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে। ভবিষ্যতের ভারতে অগ্রগতির আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্য রূপায়নের জন্য পরিকল্পনার এবং সরকারের হস্তক্ষেপের ভূমিকার ও গুরুত্বের প্রতি এটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভারসাম্য আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিপ্রস্তর।

অনুশীলনী ৪

কেমন করে আঞ্চলিক বিকাশের ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে এবং সেজন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন, এই বিষয়ে পাঁচটি বাক্যে আপনার মতামত লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২১.৯ সারাংশ

ভারতবর্ষ একটি উপমহাদেশের মত দেশ। এখানে একদিকে যেমন আবহওয়া, জমি, খনিজদ্রব্য, বন, জনসম্পদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তেমনি ভাষা, জনবিন্যাস, আর্থ-সামাজিক প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। অর্থনৈতিক শক্তি এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় উপাদানের সর্বোত্তম ব্যবহারের দ্বারা আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষায় সক্ষম অথবা কেবলমাত্র ঐগুলির ব্যবহারের দ্বারা আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়িয়ে দিতে পারে। ঔপনিবেশিক ভারতে অর্থনৈতিক শক্তি বিভিন্ন অঞ্চলে বিকৃত উন্নয়ন ঘটায়। অনুন্নয়নের সমুদ্রে শিল্পের একত্রীকরণ ঘটে বন্দর শহরগুলিতে এবং কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ শহর রেলের সংযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে, যেটুকু শিল্প ও কৃষির বিকাশ ঘটে তা কেবল কয়েকটি অঞ্চলে আবদ্ধ থাকে। স্বাধীনতাউত্তরকালে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপক আকারে শুরু হয়, কিন্তু

ঔপনিবেশিক যুগের বিকৃতি পুরোপুরিভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, নতুন প্রযুক্তি, যেমন কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব, অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্যকে প্রকট করে তোলে। যখন রাজ্যে রাজ্যে ভারতের শিল্পের বিকাশ আগের তুলনায় কম অসম, তখন আবার এমন নজিরও আছে যাতে দেখা যায় যে, আন্তঃরাজ্য ও গ্রাম-শহরের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান বেড়েছে। ভারসাম্য ঘেঁষা আঞ্চলিক বিকাশ এবং বিশেষীকরণ অত্যন্ত সতর্কভাবে আঞ্চলিক সম্পদ নির্ভর বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ সাধনের মাধ্যমে সম্পাদিত করতে হবে।

২১.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

যৌগিক গড় : পরিবর্তনীয়ের মানসমষ্টিকে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত গড় মান।

পরিবর্তনের স্থানাঙ্ক : এটি তথ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের একটি আপেক্ষিক মাপ, যেটি গাণিতিক গড়ের 'স্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিয়েশনের' শতকরা হিসেবকে বোঝায়।

পারস্পরিক সম্পর্ক : যখন দু'টি পরিবর্তনীয় একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন বলা হয় যে তারা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। যেমন- কোন অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সাধারণত ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ অর্থাৎ এই দুই পরিবর্তনীয় একই দিকে অগ্রসর হয়। যখন দু'টি পরিবর্তনীয় পরস্পরের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয় তখন তাদের সম্পর্ক হয় নেতিবাচক।

স্থায়ী পুঁজি : এটি উৎপাদনের স্থায়ী উপকরণকে বোঝায়, অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতিতে যেগুলি একবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহারে নিঃশেষিত হয়ে যায় না। যেমন-হাতিয়ার, যন্ত্র, কারখানার শেড ইত্যাদি।

জাতীয় মোট উৎপাদন এবং স্থির মূল্য : উৎপাদন প্রক্রিয়াতে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয় তার মূল্য বাদ দিয়ে একটি দেশ যত উৎপাদন করে তার মোট মূল্যকে জাতীয় মোট উৎপাদন বলা হয়।

নিট বপন এলাকা : যে-কোন সময়ে চাষের মোট এলাকাকে নিট বপন এলাকা বলে। যদি এটি বছরকে বোঝায়, তাহলে একবছরে কতবার চাষ হচ্ছে সেটা ধরা হয় না। কোন এলাকা একাধিকবার চাষ করা হলেও একবার ধরা হয়।

পরিকল্পনা-বহির্ভূত সম্পদ : সাধারণত উপাদানকে-ভৌত ও আর্থিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আর্থিক উপাদানকে, পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সরকারী ব্যয়ের পরিকল্পনা-বহির্ভূত ক্ষেত্রের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তাকে পরিকল্পনা-বহির্ভূত উপাদান বলে। যেগুলি বর্তমান পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত হয় না সেগুলিকে পরিকল্পনা-বর্হিভূত বিষয় বলা হয়। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য হ'ল, প্রতিরক্ষায়, আইন ও শৃঙ্খলা, প্রশাসন ইত্যাদি। প্রশাসনিক সুবিধার্থে পরিকল্পনায় কমিশন পরিকল্পনার জন্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করে এবং অর্থ কমিশন পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয়ের জন্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : ঔপনিবেশিক ভারতে এমন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ব্রিটিশ প্রবর্তন করে যেখানে ভূমির উপর চিরস্থায়ী খাজনা আদায়ের চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রদান করা হয় ব্রিটিশ সরকারকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বাৎসরিক কর প্রদানের বিনিময়ে।

ভৌত উপাদান : কোন দেশের বা অঞ্চলের ভৌত এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন-আবহাওয়া অর্থাৎ তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জমির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

উৎপাদনশীলতা : উপকরণের অনুপাতে কোন এককের উৎপাদনের পরিমাণ, যেমন-শ্রমের উৎপাদনশীলতা বলতে বোঝায় শ্রমের একটি একক কোন উপকরণের সাহায্যে কতটুকু উৎপাদন করছে সেটা তার উৎপাদনশীলতা।

অঞ্চল : অঞ্চল বলতে দেশের অর্থনীতির কোন ভৌগোলিক এলাকাকে বোঝায় যার প্রাকৃতিক, ভৌত উপাদান, জনসংখ্যা এবং আর্থ-সমাজিক উপাদান অন্য এলাকা থেকে তাকে পৃথক করে। কোন্ উপাদানের ভিত্তিতে অঞ্চলকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে সেটা নির্ভর করে কী উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক ক্রমোচ্চতা : আর্থ-সামাজিক বিকাশের ধারায় জাতীয় অর্থনীতির আঞ্চলিক এককের পরস্পর নির্ভরতার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে উপাদান, পরিকাঠামো, যেমন-যোগাযোগ, রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন এলাকা অনেক বেশী এগিয়ে যায় এবং অন্য এলাকা ঐ এলাকার নীচে অবস্থান করে। আঞ্চলিক অর্থনীতির এই ধারাকে আঞ্চলিক ক্রমোচ্চতা বিশ্লেষণে ভূষিত করা হয়।

সাধারণ বিচ্যুতি : যৌগিক গড়ের কাছাকাছি পরিবর্তনীয়ের বিকীর্ণ পরিমাপ।

রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন : রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলতে বোঝায় মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদনের জন্য মোট ব্যবহৃত দ্রব্যের মূল্য বাদ দিয়ে যে মূল্য থাকছে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে। রাষ্ট্রের বাইরে বসবাসকারী মানুষের অবদানও যুক্ত হতে পারে।

রাজ্যের মাথাপিছু আয় : রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী মানুষের দাবি বাদ দেওয়া হয় এবং রাজ্যের বাইরে থেকে রাজ্যবাসীর আয় যোগ করা হয়। প্রাপ্ত ফলকে রাজ্যের জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তা রাজ্যের মাথাপিছু আয়।

ক্ষেত্রগুলির বাড়তি মূল্য যোগান : এর অর্থ হ'ল জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদনের অবদান। এটি পরিমাপ করা হয় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যয় বাদ দিয়ে প্রাপ্ত মোট মূল্য দিয়ে, এর মধ্যে অন্য ক্ষেত্র থেকে ক্রয়কে বোঝান হয়। এর মধ্যে শ্রম, জমি, মূলধন এবং সংগঠকের পাওনাও ধরা হয়।

২১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Bhalla, G. S. and Alagh, Y. K. : 1979, *Performance of Indian Agriculture - A Districtwise Study, Sterling*, New Delhi.

Davis, Kingsley : 1951, *The Population of India and Pakistan*, Princeton University Press, Princeton.

Mishra, G. P. : *Regional Structure of Development and Growth in India* Volume I Ashish Publishing House, New Delhi.

Mitra, A. : 1961, *Levels of Regional Development in India*, Census of India, Vol. I, Part IA (i), Government of India, New Delhi.

Sengupta, P and Sdasyuk, G. V. : 1961, *Economic Regionalisation of India-Problems and Approches*, Census of India, Vol. : I, No. 8, New Delhi.

Government of India 1976, *Report of the National Commission on Agriculture*, Part-4, Publication Division, New Delhi.

২১.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

একটি অঞ্চল সংজ্ঞায়িত হয় বিভিন্ন মানদণ্ডে-কৃষি নির্ভর দেশে বৃষ্টিপাত, ত্রাণ এবং শস্য চাষের ধরণ অত্যন্ত জরুরী। এগুলি ভৌত উপাদান। অনুরূপভাবে, জমির মালিকানার বন্টন, ব্যাঙ্ক-ঋণ, ভূমিহীনতা, উপজাতিদের উপস্থিতি ইত্যাদি আর্থসামাজিক উপাদান হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নগরায়ন এবং পেশার ধরণ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। সুতরাং একটি অঞ্চলকে এই সমস্ত উপাদানের সমাহারে যেগুলি কম বেশী সমজাতীয়, সংজ্ঞায়িত করাই শ্রেয়।

অনুশীলনী ২

২১.৩ অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পাঠ করলেই আপনার উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী ৩

২১.৪ এবং ২১.৫ অনুচ্ছেদগুলি ভালভাবে পাঠ করুন এবং উন্নয়নের সূচক বার করার চেষ্টা করুন, যেমন-শ্রমের এবং জমির উৎপাদনীলতা, মাথাপিছু ক্ষেত্রের আয় ইত্যাদি, এবং আপনার উত্তর পাবেন। ২১.৬ অনুচ্ছেদটি যত্নসহকারে পড়ুন এবং উন্নয়নর পরিমাপের জন্য ও তার সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্যও মাথাপিছু আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিবর্তনীয়তা লক্ষ্য করুন। এবারে উত্তরগুলি লিখতে পারবেন।

অনুশীলনী ৪

অনুচ্ছেদ ২১.৭ এবং ২১.৮ ভাল করে পড়ুন। অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য লাইসেন্স প্রদানের নীতির, ব্যাঙ্ক-সম্পদের বিতরণ, রাজ্যের মধ্যে ঋণদানের প্রতিষ্ঠানের শর্তের প্রভাব পরখ করুন এবং উন্নয়নে 'একত্রীকৃত' ও 'বিকীর্ণ' প্রক্রিয়া বিশ্লেষণকে বিবেচনা করে উত্তর রচনা করুন।

একক ২২ ❑ বহুধর্মীয় কাজ : ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি

গঠন

২২.০ উদ্দেশ্য

২২.১ প্রস্তাবনা

২২.২ পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা

২২.২.১ উৎপত্তি

২২.২.২ ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র

২২.৩ ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা

২২.৩.১ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতীয় ঐতিহ্য

২২.৩.২ ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় আন্দোলন

২২.৩.৩ ভারতবর্ষ কী কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল

২২.৪ ভারতীয় সংবিধান : ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি

২২.৫ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরুর দৃষ্টিভঙ্গী

২২.৬ ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সমস্যাবলী

২২.৬.১ অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সমস্যা

২২.৬.২ রাজনীতি ও ধর্ম

২২.৬.৩ সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহ ও ধর্মনিরপেক্ষতা

২২.৬.৪ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের মনোভাব

২২.৭ ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

২২.৭.১ শিক্ষা

২২.৭.২ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

২২.৮ সারংশ

২২.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২২.১১ উত্তরমালা

২২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এর সমস্যাগুলি অনুধাবন করা। এই এককটি অনুশীলন করে আপনি যা জানতে পারবেন তা হ'ল :

- পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা।
- ভারতবর্ষে কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হ'ল তার বর্ণনা।
- ধর্মনিরপেক্ষতার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি নির্দেশ করা।
- প্রতিবন্ধকতাগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা নির্দেশ।

২২.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষ বরাবরই নানা ধর্মের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে। খুব অল্প সমাজব্যবস্থাই ভারতবর্ষের মত এরকম বহুধর্মীয় ব্যবস্থা। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের সহাবস্থান, যাদের মধ্যে দু'একটি একেবারেই একে অন্যের বিপরীত, এই দেশের ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও সহনশীলতার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই দেশের বিশেষত্ব ও খ্যাতি এই বহুত্ববাদ খ্যাতি এই বহুত্ববাদের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত।

এ কথা কখনই বলা যাবে না যে, ভারতীয় সমাজ যাবতীয় ধর্মীয় উত্তেজনা ও সংঘর্ষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকেছে। কিন্তু তিন হাজার বছর বা তারও বেশী সময় ধরে ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ ইতিহাস, সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তিক্ত ধর্মীয় সংঘর্ষের বা যুদ্ধের বিশেষ কোন উদাহরণ নেই। এমন কি মুসলমানদের আগমনের ফলেও কোন বড় আকারের ধর্মীয় যুদ্ধ হয়নি। বরং কয়েকজন অসহিষ্ণু শাসকের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্বকালে ধর্মীয় বিভেদের বদলে ধর্মীয় ঐক্যই বজায় ছিল। (অন্যদিকে ঐ সময়ে ইউরোপ ছিল মারাত্মক ধর্মীয় সংঘর্ষের কবলে)। মুসলমান রাজত্বের পতনের পর ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথমদিকে ধর্মীয় সহনশীলতা ও সহাবস্থানের ভারতীয় ঐতিহ্যটি ভালমতই বজায় ছিল। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানেরা মিলিত ভাবেই অংশ নিয়ে ছিল।

অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। ব্রিটিশরা যে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া উন্মোচন করেছিল তার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রকাশ ঘটে এবং সেই প্রতিযোগিতা থেকেই ধর্মীয় বিভেদের বীজ বপন শুরু হয় এবং মাত্র অর্ধ-শতাব্দী কালের মধ্যেই ভারতবর্ষের সমাজ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও হিংসার ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের মত দলগুলি ভারতীয় রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিগ্রহণে বাধ্য করল; ইতিহাসের এটাই পরিহাস যে ১৯৪৭ সালে মানব ইতিহাসের অন্যতম মারাত্মক রক্তাক্ত পর্বের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ মুক্তি পেলে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে। দেশ বিভাগ ও দেশ বিভাগের পিছনের ঘটনাবলী হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে এমনই তিক্ততার পর্যায়ে নিয়ে গেল, যা দেখে মনে হ'তেই পারে যে, এই দেশের ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্যটি বুঝি চিরতরে বিলুপ্ত হ'ল।

কিন্তু দেশ বিভাগের মাত্র দু'বছর পরে, যখন স্বাধীন ভারতের প্রথম সংবিধান তৈরী হ'ল তখন, নেহেরুর উৎসাহে এবং পরিচালনায় জাতীয় নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিল। বলা হ'ল, 'ভারতবর্ষ এমনই এক রাষ্ট্র হবে যেখানে সব ধর্মকে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সব নাগরিককে সমানভাবে এবং পক্ষপাতবিহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা হবে'। সংবিধান রচনার সময়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবগত তিক্ততাকে এবং সাম্প্রতিক অতীতের সংঘর্ষগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। পাকিস্তান যে ধর্মীয় ভেদাভেদের আদর্শ নিয়েই নতুন রাষ্ট্র

হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেটিকে উপেক্ষা করেই ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিল; সিদ্ধান্ত হ'ল যে, ভারতবর্ষ একটি বহুধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে এবং তার সব নাগরিকের জন্যই ধর্মের অধিকার, এক নাগরিকত্ব এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে।

অন্য একটি দিক থেকেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তটি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সমাজের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে ধর্মের প্রতি অবিচল আগ্রহ, অঙ্গীকার এবং অনুরাগ। এটি অতিরঞ্জন হবে না যদি বলা হয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ গঠনে ধর্মই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন ধর্মীয় রাষ্ট্র হওয়া এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ এল, ভারতবর্ষে তখন কিন্তু প্রথম পছন্দটি বেছে নিল না।

এই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে বিচার করতে হয়, কোন্ উপাদান বা কারণগুলি ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রূপটি বেছে নিতে সাহায্য করেছে এবং কিভাবেই বা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাগুলি ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রভাবিত করেছে।

সাম্প্রতিককালের ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্বটি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন এবং উপলব্ধি করার কাজটি বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে এই আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, ভারতীয় সমাজে যেন দ্রুত হিন্দুত্বের পুনরুভ্যুদয় এবং মুসলমান ও শিখ মৌলবাদের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতা সংবিধান প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

২২.২ পাশ্চাত্ত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি প্রথম চয়ন করেন জর্জ জেকব হলইয়ক্ (১৮১৭-১৯০৬) ১৮৫১ সালে। শব্দটি লাতিন 'সেকুলাম' থেকে নেওয়া হয়েছে। লাতিন শব্দটির অর্থ হ'ল 'বর্তমান যুগ'; অবশ্য লাতিন ভাষায় এই শব্দটিকে 'পৃথিবী' শব্দটির বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন তাই ধর্মনিরপেক্ষ বলতে 'ধর্ম' বা 'পবিত্র' অবস্থানকে বোঝান হয়েছে। অবশ্য শব্দটি হলইয়ক্-এর রচনায় আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার আগেই পশ্চিমী সমাজে ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রক্রিয়া/আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

২২.২.১ উৎপত্তি

ইউরোপ এবং ইংল্যাণ্ডে বহু প্রাচীনকাল থেকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্যাথলিক চার্চের পূর্ণ আধিপত্য কায়েম ছিল। তাদের চূড়ান্ত ক্ষমতার জোরে পোপ থেকে শুরু করে তাঁর অধস্তন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষগণ পর্যন্ত অনেকেই সাধারণ মানুষের এমন কি রাজার উপরও নিপীড়ন চালাতেন। তাই সাধারণ মানুষ এবং রাজন্যবর্গ উভয়েই সংগ্রাম চালিয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে এবং দৈনন্দিন রুটিনমাফিক জীবনকে চার্চ ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তকরতে। শোষণ-নিপীড়নের ব্যবস্থা এবং সমর্থন তৈরী করছিল বলেই ধর্ম এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে পুরোহিতদের তরফে পীড়নমূলক ক্রিয়াকলাপ এতই নির্মম হয়ে পড়েছিল যে, তাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন ধর্মবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত না হওয়াটাই ছিল আশ্চর্য্যজনক। এই কারণেই পশ্চিমী সমাজে ধর্ম শক্তিশালী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'ল, বিশেষ করে সেই সব শক্তির যেগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে (যার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের

কর্মধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল) ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিল। চার্চ এবং তার ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলি সক্রিয় হ'ল সেগুলি 'ধর্মনিরপেক্ষ' নামে পরিচিতি পেল; আর যে সব প্রক্রিয়া ও আন্দোলন ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের পতন এবং যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করল সেগুলি ধর্মনিরপেক্ষকরণ নামে পরিচিত হ'ল।

মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা এই পার্থিব জীবনের বিষয় নিয়েই, মানুষের অবস্থার উন্নতিসাধনে এবং জনকল্যাণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে : ফলত, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদর্শ ধর্মের ভূমিকাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন বিশ্বাসের জগতের বাইরে বা পরলোকের চিন্তার ক্ষেত্রের বাইরে, গুরুত্বহীন করে তুলেছে।

পশ্চিমী জগতের ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া সেখানকার মানুষের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মানুরাগের তরলীকরণে সহায়তা করেছে। এর একটি প্রধান ফলাফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি, বিশেষত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি উত্তরোত্তর যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এরই সঙ্গে লক্ষণীয় ইউরোপীয় সমাজের সংহতিসাধনকারী শক্তি হিসেবে ধর্মের একচেটিয়া প্রাধান্যের বিলুপ্তি। বরং দেখা যাচ্ছে, ক্রমশই জাতীয়তাবাদের মত ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ সেখানকার সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যসাধনকারী নীতি হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে।

ব্যক্তির তরফে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিকাশের অর্থ হ'ল অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ, একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এবং সেই সমাজে কর্মে নিযুক্ত থাকার সুযোগ। ম্যাক্‌কী বলেন, 'সামাজিক পৃথিবী যেমন বহুবাদী, তেমনি বিশ্ববীক্ষণও বহুবিধ'। মানব ইতিহাসে যখন আধুনিক বিজ্ঞান ঠিকমত বিকাশ লাভ করেনি, যখন মানব জীবন সনাতন প্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, তখন কিছু দুঃসাহসী এবং দায়িত্বশীল মানুষ অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে মানুষের চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাকে একপ্রকার বিপ্লব বলেই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

২২.২.২ ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র

ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববীক্ষণের স্বীকৃতি ও প্রসার ধর্মের গুরুত্ব ও ভূমিকার তরলীকরণে সাহায্য করেছে বটে, তাই বলে তা, এমন কি পশ্চিমী জগতের ক্ষেত্রেও, ধর্মের পরিপূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিয়েছে এমন বলা যাবে না।

তবুও ধর্মের পরিব্যাপক ভূমিকা হ্রাস পাওয়ার ফলে অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা একে অপরের বিপরীত এবং বৈরী। সঠিকভাবে বলতে গেলে এই ধারণাটি সত্য নয়। বৈরীভাবমূলক হওয়ার বদলে বলা যায় এই দুইয়ের সম্পর্ক হ'ল পারস্পরিক অনন্যতার সম্পর্ক। ধর্মের প্রধান কথা হ'ল কোন ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাস এবং পরলোক সংক্রান্ত বিশ্বাস। এগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয় নয়; ধর্মনিরপেক্ষতা সানন্দে এগুলিকে ধর্মের হাতে ছেড়ে দেয়।

ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের কথা মনে রেখে লাউয়ের বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষকরণের পাশাপাশি ধর্মও বিকশিত হতে পারে মানুষের নৈতিকতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে এবং মানুষের অস্তিত্ব সংক্রান্ত কোনও অলৌকিক ভাবনা উপস্থাপনার ব্যাপারে ধর্মের বিশেষ বিকাশ ঘটতে পারে।' সুতরাং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'ধর্ম'কে বিপরীতমুখী অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। লাউয়ের বলেছেন, বড়জোর ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন সধন করে, ধর্মের বিলুপ্তিসাধন করে না'। আবার এই সিদ্ধান্ত মেনে এটা ভুললেও চলবে না যে, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতর মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের

সম্পর্ক রয়েছে। ম্যাক্‌কী যে কারণে বলেছেন, 'সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষকরণ পৃথিবীর পবিত্র (দৈব) চরিত্রের ধারণাকে বর্জন করতে সাহায্য করে, যে কারণে মানুষ সমাজকে প্রাথমিক ভাবে আর ধর্মীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে অনুধাবন করে না'। তিনি আরও বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা হ'ল অন্য জগতের ধারণা থেকে সরে আসার প্রক্রিয়া এবং এই পার্থিব জগতের দিকে নজর ফেরানোর প্রক্রিয়া'। 'ধর্ম' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে একে অপরের বিপরীত ও বৈরী হিসেবে অভিহিত না করার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা দরকার যে, উভয়ের 'অবশ্যম্ভাবী' বিরোধের এই ভুল ধারণাটি গড়ে ওঠার মূল কারণ হ'ল নানাপ্রকার কুসংস্কার, অর্থহীন আচার এবং কিছু বদ্ধমূল বিশ্বাসকে ভ্রান্তিবশত ধর্ম বা ধর্মীয় বিয়ে হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা। আগেই বলা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা নিঃসন্দেহে এই সব ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে চায়। কিন্তু গোপাল দেখিয়েছেন, যদি ধর্ম 'জীবনের উচ্চতর বিষয়' নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে উভয়ের মধ্যে কোন সংঘাত হওয়ার কোন কারণ নেই।

এই আলোচনা শেষ করার আগে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সেটি হ'ল এই যে, শেষ বিচারে ধর্মনিরপেক্ষতা হ'ল একটি দৃষ্টিভঙ্গী, একটি মনোগত ভাব, যা একদিকে যেমন যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রাধান্যকে গুরুত্ব দেয়, তেমনি অপরদিকে মানুষে মানুষে সমতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে; একজন ব্যক্তি যে অপর একজনের মতই ভাল হতে পারে এই সত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানেই রয়েছে দুইয়ের মিলনস্থল-ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে এইভাবেই বলা যায় একই মুদ্রার দুই পিঠ।

অনুশীলনী ১

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছে.....নিপীড়ন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম থেকে।

(খ) ধর্মের বিষয় হ'ল.....জগৎ। অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র হ'ল..... .....জগৎ।

২. ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা কি একে অপরের বিরোধী ?

.....

২২.৩ ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা

এবার আমরা ভারতবর্ষে পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা করব।

আগের আলোচনায় দেখেছি, পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রক্রিয়া এই পার্থিব জগৎ থেকে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব হ্রাস ও দূর করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুগপৎ সংঘটিত হয়েছে। এই হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'ধর্মহীনতা' প্রায় অভিন্ন বোধ হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা কেবল রাষ্ট্রের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। তাই আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথাই কেবল শোনা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের কথা কখনও বলা হয় না। এরকম হওয়ার কারণ অংশত এই যে, ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত যে ভাবনাগুলি ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে সেগুলি পশ্চিমের ধ্যানধারণা থেকে বহুলাংশেই ভিন্ন। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলত সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী শক্তি হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এটাই বোঝান হয় যে, এখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্মের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলবে না, বরং প্রতিটি ধর্মের সঙ্গে একইরকম সখ্যতা বা সমদূরত্ব বজায় রাখবে। নিরপেক্ষতার এই নীতির উপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র যাবতীয় আন্তঃ গোষ্ঠীয় দ্বন্দ্বসংঘাতকে প্রতিহত করবে ও নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং একই সঙ্গে আমাদের সমাজের দ্বন্দ্বমুখর বহু বিচিত্র প্রতিযোগী ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে একটি অভিন্ন জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত করবে। এটাই ভাব হয়েছে যে, এই জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশে সহায়তা করবে, যে চেতনা ধর্মকে অস্বীকার না করেও বিশেষ বিশেষ ধর্মীয়বোধের উর্দ্ধেই বিরাজ করবে। এর তাৎপর্য হ'ল এই যে, নাগরিকগণ, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত সকলেই, জনজীবনের একদিকে তাদের অধিকার ও কর্তব্যের ও অপরদিকে তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস ও আচার-আচরণের পার্থক্য বজায় রাখবেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যায় ভিন্নতার কারণ হ'ল উভয়ের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য।

২২.৩.১ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতীয় ঐতিহ্য

ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে, পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসেবে। ভারতবর্ষে ইউরোপের অনুরূপ কোনও সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের দৃষ্টান্ত নেই। হিন্দু বা ইসলাম কোনও ধর্মেই ব্রাহ্মণ বা উলেমান সংগঠিত চার্চের সংগঠিত যাজকদের মত জনসাধারণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পায়নি। তাই প্রাক্-মুসলিম কিংবা মুসলমান আমলে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজার বা জনসাধারণের সংঘর্ষের কোনও ইতিহাস নেই। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালের কথা বাদ দিলে, ভারতবর্ষের সমাজে আন্তঃগোষ্ঠীস্তরেও সাধারণভাবে ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্যটাই বজায় ছিল।

মুসলমান আমলেও ইসলামকে সরকারীভাবে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। দু' একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে মুসলমান শাসকগণ সাধারণভাবে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। কালক্রমে হিন্দুরা মুসলমান রাজাদের প্রশাসনিক কাঠামোতে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অর্জন করেছে এবং তাই মসুলমানদেরও সাধারণ নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, 'নিজে বাঁচ এবং অপরকেও বাঁচতে দাও।' পরবর্তীকালে যখন ব্রিটিশরা ভারত দখল করল, তখন তার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনধারার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী নির্বিকারে থেকে ছিল। তাছাড়া, ব্রিটিশ রাজ 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র ধারণা ও আচরণ চালু করল যাতে জাতি, ধর্মগত বিশ্বাস নির্বিশেষে সব নাগরিকই সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। এই ব্যাপারটা প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আগেকার ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্যের ইতিহাসের সঙ্গে ব্রিটিশরাজ যুক্ত করল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (যথা, ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সংশ্রব না রাখা এবং আইনের দৃষ্টিতে সাম্য)। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এভাবেই সূত্রপাত।

২২.৩.২ ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় আন্দোলন

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখা গেল যে, ব্রিটিশরা তাদের পুরোন নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের সেই বহু পরিচিত 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' করার নীতি গ্রহণ করেছে, যার পরিণতিস্বরূপ ভারতীয় রাজনৈতিক জীবন মারাত্মকভাবে সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিগ্রহ করে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতীয় নেতারা বুঝেছিলেন যে ধর্মীয় অনৈক্য কেবল যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যহত করবে তা নয়, যখন প্রকৃতই স্বাধীনতা আসবে তখন ঐ বিভেদ দেশের পক্ষে এক প্রবল সমস্যা হয়ে দেখা দেবে।

এই অস্বাস্থ্যকর বিভাজন দূর করার প্রয়াসে নেহেরু ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে একটি প্রাক্-সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিলেন। সেই অধিবেশন গৃহীত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে তিনি এই ধারাগুলি সংযোজিত করলেন যে, ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক বিবেকের অধিকার এবং যে কোন ধর্ম গ্রহণের ও অনুসরণের অধিকার লাভ করবে; সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে গণ্য হবে। জাত, ধর্ম লিঙ্গ নির্বিশেষে কোনও ব্যবসা বাণিজ্য বা পেশার ক্ষেত্রে কিংবা কোন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন নাগরিককে ভেদাভেদের ভিত্তিতে অযোগ্য বলা যাবে না এবং রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। গোপালের মতে এটা হ'ল 'ভারতীয় পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার প্রথম বাস্তব রূপদান, যা কিনা পরবর্তীকালে বহু বছর পরে ভারতীয় সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারাটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।'

এই প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতির জগতে পাকিস্তানের দাবি ওঠেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নেহেরু যে প্রাক্-সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ নিয়ন্ত্রণে কোন সাহায্য করল না এবং দেশ শেষ পর্যন্ত বিভাজনের পথেই গেল।

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সংবিধান রচনার কাজে যুক্ত হয়ে পড়লেন। এই কাজে নানা বিরোধী প্রবণতা ও স্বার্থ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। একদিকে সমস্যা ছিল পাকিস্তানের, যার আবির্ভাব হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ এবং ধর্মোন্মাদনাকে ব্যবহার করে, যা কিনা শেষ পর্যন্ত মানব ইতিহাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলির অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

অন্যদিকে ছিল গান্ধী, নেহেরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের চিন্তা, ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন যে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক বিকাশ ধর্মীয় বিভেদকে অতিক্রম করে যাবে। এই নেতৃবৃন্দ কখনই ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে তোলার জিন্নার তত্ত্বকে মেনে নেননি। কিন্তু জাতীয় নেতারা যে আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, যার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, সেগুলি সব পিছনে পড়ে রইল দেশ বিভাজনের দাঙ্গার মুখে, যেখানে সাম্প্রদায়িক শক্তি উস্কানী যোগাল উন্মত্ত জনতাকে। পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত যদি একটি নতুন আদর্শ হয়-তবে ভারতবর্ষও একটি ধর্ম ভিত্তিক হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারত; কেননা এখানেও সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগই হিন্দু। কিন্তু সেই কঠিন সময়ের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে নেহেরু ও তাঁর সহকর্মীগণ তাদের ১৯৩১ সালের অঙ্গীকারকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখে ভারতবর্ষকে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবেই ঘোষণা করতে বদ্ধপরিকর হইলেন, অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়েছে কেবলমাত্র ১৯৭৬ সালে।

২২.৩.৩ ভারতবর্ষ কী কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল

ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্তটি দেশভাগের উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে অদ্ভুত মনে হলেও এটি ছিল নানাধরনের প্রভাবেরই পরিণতি।

প্রথমত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিতেই ধর্মের প্রভাবমুক্ত এই জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান বৈরীতার অন্ধকারতম পর্বেও এই ব্যাপারে কোনও আপোষ হয়নি, পাকিস্তান নিয়ে দাবি জোরদার হওয়ার পরেও নয়। বরং দেশবিভাগ যতই সুনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ততই গান্ধী, নেহেরুর মত নেতৃবৃন্দ আরও দৃঢ়ভাবে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত জাতীয়তাবাদক আঁকড়ে ধরেছিলেন। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ

রাষ্ট্র গঠনের ঐ পথ থেকে কোন প্রকার বিচ্যুতি ঘটলে তা জতীয়তাবাদী নেতাদের দীর্ঘদিনের লালিত আদর্শের বিরোধী ঘটনা হ'ত। ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে তা জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা দিত।

দ্বিতীয়ত, আদর্শগত বিবেচনা ছাড়াও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক দিকও ছিল। ভারতবর্ষ বরাবরই বহুবিচিত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর দেশ; স্বাধীনতার পরও তার এই বহুবাদী চরিত্র অব্যাহত ছিল। আসলে মুসলমানদের একটি বড় অংশ পাকিস্তান যেতে চাইল না; তাঁরা এই দেশের অন্যান্যদের সঙ্গেই নিজেদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ গেঁথে রাখলেন। মুসলমান ও অন্যান্যদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা জন্মেছিল এই দেশের আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে; সবাই বুঝেছিলেন যে শান্তিতে ও মর্যাদার সঙ্গে তাঁরা এই দেষা বসবাস করতে পারবেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এই বহুত্বের জন্যও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

এই সব কিছুর উপরে হ'ল ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা। ওই মর্মান্তিক ঘটনা হিন্দু-অহিন্দু সকলকেই বিচলিত করেছিল এবং আপামর ভারতীয়দের মনে এই ধারণা তখন আরও জোরালো হয়েছিল যে, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই হবে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার সর্বোত্তম নিরাপত্তাবিধান। এই সত্যটি তখন উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, রাজনীতি ও ধর্মের পৃথকীকরণ না হ'লে সাম্প্রদায়িক বিভেদ দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের স্বার্থে অন্তর্ঘাতী বিবাদগুলি বন্ধ করা একান্তই জরুরী ছিল।

সুতরাং এটা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তার রাজনৈতিক অবস্থান, উভয়ই ভারতীয় রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে পরিচালিতত করতে সহায়তা করেছে। তাই ১৯৫০ সাল যে সংবিধানটি গৃহীত হ'ল সেকানে দেখা গেল বেশ কয়েকটি ধারা-উপধারার মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটি স্পষ্ট ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র দেওয়া হয়েছে। স্মিথ্-এর কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়:

'ভারতীয় সংবিধান হ'ল এক মৌলিক বিধি যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরী করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম সংক্রান্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি তাদের বর্তমানরূপে বজায় থাকছে ততক্ষণ এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বর্জনের কথা ভাবা যায় না।

২২.৪ ভরতীয় সংবিধান : ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি

কোন্ অবস্থায় ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটা সংক্ষেপে বিবেচনা করার পর এখন আমরা সাংবিধানিক ধারাগুলি সম্পর্কে পরিচিত হতে পারি, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সমর্থন জানানো হয়েছে এবং যেগুলির মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি ও চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে।

সংবিধানের ১৫.১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। ১৬ নং ধারায় রাষ্ট্রের অধীনে চাকরীতে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া, এই ধারা অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে চাকরীর ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ বা অযোগ্যতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ২৫ নং ধারায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবেকের স্বাধীনতা এবং যে কোন ধর্ম আচরণ ও প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নানাপ্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা বা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করা যাবে। বিশেষ করে রাষ্ট্র হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সব শ্রেণীর হিন্দুর জন্যই খুলে দিতে পারে।

সকল ধর্মীয় সংস্থারই অধিকার থাকবে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সংগঠিত করা এবং সেগুলি রক্ষা করা; এছাড়া ধর্মীয় উদ্দেতোরা সম্পত্তি অর্জন ও রাক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। কোন বিশেষ ধর্মকে সাহায্য করার জন্য বা তার উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকেই কর দানে বাধ্য করতে পারবেন না।

কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। সরকারী বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে কোন ব্যক্তির ভর্ত্তির আবেদন নাকচ করা যাবে না। ওই সব প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তিকে ধর্মীয় শিক্ষাদানে বা প্রার্থনায় অংশ নিতে বাধ্য করা যাবে না।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার থাকবে তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে ওই সব প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদানের প্রশ্নে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এছাড়া সংবিধানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের চিন্তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে।

এটা বলা দরকার যে, ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কিংবা রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, কোনটাই চূড়ান্ত নয়, বরং সীমিত। ধর্মীয় স্বাধীনতা এখানে সীমিত কারণ 'শান্তি বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যের ও নৈতিকতার প্রয়োজন'। ভারতবর্ষের সমাজের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ভোগ করবে —'দেবদাসী'র মত ধর্মীয় প্রথা, মানুষ উৎসর্গ করা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা যেখানে রয়েছে।

২৫ এর ২(ক) নং ধারাতেও এরকম বিধিনিষেধের ব্যবস্থা আছে যেখানে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত যে কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করার। ২৫ এর ২(খ) নং ধারায় সামাজিক কল্যাণসাধন এবং সমাজসংস্কারের কথা বলা হয়েছে। অভিন্ন পুরবিধি গড়ে তোলার প্রসঙ্গে সাংবিধানিক নির্দেশ অনুসরণের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে।

হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে, হিন্দুধর্মে এমন কোন পুরোহিততান্ত্রিক সংগঠন নেই যাতে কিনা ভিতর থেকেই এর সংস্কারসাধন সম্ভব হতে পারে। আর তাছাড়া, বাইরের এই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে একটি অভিন্ন পুরবিধি গড়ে তোলার জন্য।

অনুশীলনী ২

১) ভারতীয় ঐতিহ্য ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সহায়ক কেন ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক) ধর্মীয় বিভেদকামীতা প্রতিরোধের জন্য করাচীতে ১৯৩১ সালের অধিবেশনে মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবে ..... অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

খ) ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ..... অন্তর্ভূক্ত হয়।

৩) ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে সব যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মধ্যে থেকে দু'টি যুক্তির উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২২.৫ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরুর দৃষ্টিভঙ্গী।

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ বপন এবং লালনের ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহেরু যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তার উল্লেখ না করলে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কাহনীটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নেহেরু ধারণা অবশ্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাস্তবিকই মৃত্যুর অল্পকাল আগে তিনি লিখেছিলেন : "আমাদের সংবিধান আমাদের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলেছে, কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, আমাদের জনজীবনের এবং জনগণের চিন্তায় তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি।'

দেখা যাচ্ছে, নেহেরু অনেক গভীরভাবে আগ্রহ ছিলেন আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সার্বিক বিকাশ ঘটানোর জন্য। এই দিক থেকে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি ছিল পশ্চিমে মডেলের কাছাকাছি। তাই ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা তাঁর মতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র।

জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত নেহেরু ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পথে ধর্মনিরপেক্ষতার বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর যে চমকপ্রদ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল যার জন্য তিনি ভারতবর্ষের মানুষের উপর একটা ভাবাবেগের আবেদন রাখতে সক্ষম ছিলেন তার জোরে তিনি স্বচ্ছন্দে দমনমূলক পদ্ধতির সাহায্যেই ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা, আচার ও আচরণ প্রসারে সচেষ্ট হতে পারতেন, যেমনটি করেছিলেন কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের ইসলামিক রাষ্ট্র ও সমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণে। কিন্তু মূলত একজন উদারনীতিক গণতন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনি কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি বর্জন করেছিলেন। পরিবর্তে তিনি অর্থনৈতিক বিকাশের উপর আস্থা রেখে এই আশা করেছিলেন যে, দেশের মানুষের কাছে যখন অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াবে তখন ধর্মীয় বিভেদগুলি আপনা থেকেই দূরে সরে যাবে এবং অভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হবে।

অবশ্য অর্থনৈতিক বিকাশের ধীর গতির জন্য এবং যেটুকুও বা উন্নতি হয়েছিল তা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে বিনষ্ট হওয়ার জন্য জনসাধারণের এক বড় অংশকেই আর্থিক বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক রক্ষণশীলতা ঐ অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। এর ফলে জনসাধারণের যে বিরাট অংশ অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং সেকেলে ভাবনায় আচ্ছন্ন তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। বৃহদায়তন নগরায়ন ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তার সত্ত্বেও শহরের অনেক শিক্ষিত মানুষের মধ্য ধর্মীয়, সাবেকী, বিশ্ববীক্ষা স্থায়ী আসন নিয়ে আছে। অপরদিকে বেশ কিছু শহর ও নগর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলগ্রস্ত হয়ে এখন এগুলি ধর্মীয় মৌলবাদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরাঞ্চলে এমন কিছু আচার ও উৎসবের জন্য অর্থব্যয় হয় যার সঙ্গে যুক্তি-বুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক ভাবনা চিন্তার কোন সম্পর্ক নেই।

কিছুমাত্র চিন্তাভাবনা না করে নিতান্ত অভ্যাসবশতই মানুষ এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।

সুতরাং নেহেরুর আশা ও বিশ্বাস যে, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং আধুনিকীকরণ আন্তঃ সাম্প্রদায়িক বিভেদকে দূর করবে এবং জন্ম দেবে এক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির। সেই আশা ফলবতী হয়নি। বোধকরি, দ্রুত বিকাশের পূর্ব শর্তটি পূরণ হয়নি কিংবা বলা যায় আমাদের সমাজ এখনও শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃত বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

আবার এটাও হতে পারে যে, আমাদের মত বহুধর্মের সমাজে সাধারণ মানুষ হয়ত তদের নিজেদের অস্তিত্বের কথা ভেবেই আরও বেশী করে নিজের নিজের ধর্ম আঁকড়ে থাকবে। আবার এটাও বলা যায় যে, ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত অন্য কোনও নেতা তাঁর মত উৎসাহ এবং অঙ্গীকার নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে উদ্যোগী হননি। অথবা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত এমন কিছু কি আছে, কিংবা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক নীতিটি কেবল পশ্চিমী জগৎ থেকে আমদানি করা নীতি হিসেবেই গণ্য হবে এবং কখনই প্রকৃত অর্থে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হবে না ? বলা বাহুল্য, এই সব বিষয়ে খুব নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান কঠিন। বরং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটির বাস্তব রূপায়ণের পথে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি এখন পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

২২.৬ ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সমস্যাবলী

পূর্ববর্তী অংশে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ভারতীয় পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতা হ'ল কেবলমাত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে সীমিত একটি বিষয়। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে তার ওপর ধর্মনিরপেক্ষতার বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ রাখবে এটা কেউ আশা করে না। তার ফল হ'ল এই যে, স্বাধীনতার সময় যা ভাবা গিয়েছিল তার বিপরীতেই যেন অধিকাংশ ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবনা খুবই শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

তাই দেখা যায় যে, ধর্মগুরু এবং ভেল্কিবাজী যাঁরা দেখান তাঁদের অনুগামীর সংখ্যা অনেক; ঠিকুজী-কুষ্ঠীতে আস্থা বৃদ্ধি এবং জ্যোতিষীদের রমরমা বাড়ছে; রথযাত্রা এবং অনুরূপ ধর্মীয় শোভাযাত্রায় হচ্ছে অসংখ্য মানুষের ভিড় এবং এখনতো সরকার নিয়ন্ত্রিত ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমগুলিও ধর্মীয় বিষয়গুলি যথেষ্ট সময় দিয়ে প্রচার করছে এবং নিছকই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা যখন

কেবলমাত্র রাষ্ট্রের তরফে বিভিন্ন ধর্মের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে তখনই এই ভারতবর্ষে যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব কীভাবে ? কিন্তু এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়ার আগে জানা প্রয়োজন কী ধরণের সমস্যা আমাদের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ পথে চলতে বাধা দিচ্ছে। এটা জানলে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

২২.৬.১ অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সমস্যা

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিতর্কিত প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করলেই বোধ করি সবচেয়ে ভাল হবে। আমাদের সংবিধান নির্মাতাগণ দেশের সব নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। এটা অনুভব করা হয়েছিল, জাতীয় সত্তা গড়ে তোলার জন্য এবং সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সংহতি সাধন করে একটি অভিন্ন নাগরিকতা প্রতিষ্ঠানর জন্য 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' একান্ত প্রয়োজনীয়। এটা না হলে এই দেশের নাগরিকেরা সর্বদাই দ্বিধাবিভক্ত থাকবে; প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষ তার ধর্মের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিধির দ্বারা পরিচালিত হবে। তাই স্বাধীনতার পরে এটা আশা করা হয়েছিল যে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার জন্য 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' রচনার বিশেষ পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনও অগ্রগতি হয়নি এবং আজ মনে হচ্ছে সংবিধান রচনাকালে যাও বা সুযোগ ছিল এখন সেটি অনেক বেশী সমস্যাসঙ্কুল। যেমন বলা যায়, ১৯৮৬ সালে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সরকারকে বাধ্য করল স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নে তাদের 'ব্যক্তিগত বিধি' অনুযায়ী আইন রচনা করতে, যাতে সেই আইন তাদের ধর্মীয় নির্দেশ মত গ্রহণযোগ্য হয়। আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে, কিংবা মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব নিয়েছিল তাদের মতামতকে, সরকার কোন গুরুত্ব দিল না।

একইভাবে খ্রীষ্টান ও শিখ সংখ্যালঘুরা যেভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নির্মাণ অসম্ভব ব্যাপার।

অবশ্য এই ঘটনাটি মেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ যেহেতু উদারনীতিক গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে চলছে সেই কারণে এখানে কোন সরকারই নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মতামত না নিয়ে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন আইন রচনা করবে না। এই সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে ধর্মীয় বিধির মত অত্যন্ত আবেগজড়িত আইনকানুনের ক্ষেত্রে। আর এইসব সীমাবদ্ধতা এই সত্যকেই নির্দেশ করে যে, ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার পথটি অসংখ্য প্রতিবন্ধকতায় পরিকীর্ণ।

২২.৬.২ রাজনীতি ও ধর্ম

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় এক ধরণের উভয়সঙ্কট দেখতে পাব। দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতার পর এবং তার সঙ্গে যুক্ত নানা ঘটনার ভিত্তিতে এটা আশা করা গিয়েছিল যে, এবার ভারতবর্ষের রাজনীতি স্পষ্টতই ধর্মকে বাদ দিয়ে পরিচালিত হবে। এই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, কেননা আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সাম্প্রদায়িক, জাতপাত নির্ভর এবং আঞ্চলিকতা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বেশীমাত্রায় স্থায়ী পাচ্ছে। আরও খারাপ ঘটনা হ'ল, রাজনৈতিক মুনাফা আদায়ের জন্য ধর্মীয় এবং জাতপাতের বিভেদগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে,

এমন তথ্য প্রমাণও রয়েছে যা দিয়ে দেখান যায় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছে। এইসব কৌশল খুবই দুঃখজনকভাবে নির্বাচনী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (যেগুলি মূলত পৌর এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়) অ-ধর্মীয় এবং অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করেছে।

উপরন্তু, আমাদের রাজনীতির বল্গাহীন সাম্প্রদায়িকীকরণের ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক জটিল ও বিষাক্ত আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে যতই ধর্মীয়-রাজনীতির চাপের কাছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নতি স্বীকার করবে ততই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের কথা দূরে থাক্।

ভারতের সীমিত ধর্মনিরপেক্ষতাও যেভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে তার দায়িত্ব বর্তাবে নেহেরু-উত্তর নেতৃবৃন্দের উপর। এই নেতৃবৃন্দের অনেকেই চিন্তার দিক থেকে মুক্তমনা নন; এঁরা এখনও তাঁদের সনাতনী ভাবনায় পরিচালিত-প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য বুঝতে এঁরা অক্ষম। এই নয়া সাবেকী মনোভাবের জন্য তাঁরা ভারতীয় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সেভাবে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারেন নি; কেবল ধর্ম থেকে মুক্ত মনোভাব গঠনে নয়, সাধারণ যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঠনেও এঁরা অপারগ। নেতৃত্বের এই ব্যর্থতার ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে ক্রমে ধর্ম থেকে পৃথক করার কাজটি ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

২২.৬.৩ সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রক্রিয়াটি আরও একটি বিপদের সম্মুখীন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্ম এখানে প্রায় একটি 'জাতীয়' ধর্মের মত, বিশেষত , যখন এই দেশের ভৌগোলকি সীমারেখার মধ্যেই এই ধর্মটি সীমাবদ্ধ রয়েছে (অবশ্য নেপাল একমাত্র ব্যতিক্রম)। ফলত, সবার ক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ হিন্দুর কাছেই হিন্দুধর্ম জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন। স্মিথ এই ধারণাটি সমর্থন করতে গিয়ে বলেন, 'রাষ্ট্র যখন জাতীয় আদর্শ গড়ে তুলতে সচেষ্ট তখন তা কার্যত ধর্মকেই উৎসাহদান করেছে'।

ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের এই যোগাযোগকে, যা হিন্দুদের কাছে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক মনে হতে পারে, ঠিকমত বুঝে নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে যে, এই দেশে সংখ্যাগুরু—সংখ্যালঘু সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির অনেকটাই এই ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকেই জন্ম নিয়েছে। তাই দেখা যায় ভূমি-পূজা, নারকেল ভাঙা (কোনও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বা কোনও পুণ্য কাজে) আরতি বন্দনা, অতিথি-অভ্যাগতদের কপালে তিলক এঁকে দেওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুরা তাঁদের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ভাবের প্রকাশকেই দেখেন। কিন্তু অহিন্দুদের কাছে এগুলি হ'ল নিতান্তই হিন্দু-সংস্কৃতির ব্যাপার। এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এবং সেই কারণে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং, যে রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি সমভাবাপন্ন আচরণে বিশ্বাসী তাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে 'ভারতীয়' মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কাজে যুক্ত থাকতে হবে, যাতে 'ভারতীয়তার' নামে কেবলই হিন্দু মূল্যবোধের প্রসার ঘটান না হয়। অবশ্য যেহেতু দেশের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হিন্দু তাই এটা বলা যায় যে, হিন্দুত্বের বেশ কিছু সংখ্যক সাংস্কৃতিক প্রতীককে একইসঙ্গে 'ভারতীয়' বলে গণ্য করা যাবে। কিন্তু তাই বলে সংখ্যালঘুদের প্রতীকগুলিকেও বা তাদের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাবে না, যখন রাষ্ট্র যাবতীয় ধর্ম থেকে সমদূরত্বে অবস্থানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

'হিন্দু' এবং 'ভারতীয়' এই দুই ধারণাকে নিয়ে বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ হ'ল গত পঞ্চাশ বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার সাংস্কৃতিক মাত্রাটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকা। সব ধর্মীয় উপ-সংস্কৃতিকে একত্রিত করে একটি সংহত সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তোলার কোন চেষ্টা আমরা করিনি; ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ বা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীকের উপর ভিত্তি করেও নতুন কোন সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা হয়নি। অবশ্যই এই ধরণের কাজ খুব সহজ নয়, তবে কিনা এ বিষয়ে কোন উদ্যোগও দেখা যায়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘটনাটি খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হ'ল হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলিকে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা। বলা যেতে পারে, মুসলমান ও হিন্দু মৌলবাদের উত্থানের সঙ্গে জড়িত এ এক 'হিন্দু প্রতিক্রিয়া'। কিন্তু এই সব ব্যাখ্যা দিয়ে বা কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রের তরফে যে ত্রুটি হয়েছে তা উপেক্ষা করা যায় না। কেননা, সংখ্যালঘুদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি ঔদাসীন্য ও অনাগ্রহ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে নষ্ট করে দেয়।

কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে সীমিত থাকার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার এই সীমাবদ্ধ ধারণাটি ভারতীয় নাগরিকদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় সত্তাকে এবং অন্যান্য উপ-সংস্কৃতিমূলক পার্থক্যগুলিকে আরও জোরদার করেছে। যে সব সমাজে এই ধরণের পার্থক্যগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গুলি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্বের অন্যতম একটি পরিণাম হ'ল এই যে, আমাদের জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের মধ্যে অভিন্ন নাগরিকত্ব, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সুযোগের সমতা ইত্যাদি ধারণাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। ফলত, চাকুরী ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করার সাংবিধানিক ব্যবস্থাটি ঠিকমত বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না। ইমতিয়াজ আহ্‌মদের কথায়, 'সাম্প্রদায়িক বোধগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বেড়ে চলেছে এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববীক্ষার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে...' তাই বলা যায়, চাকুরীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

২২.৬.৪ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের মনোভাব

যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, সাম্প্রদায়িক সংস্কার নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কোন ক্ষেত্রেই তেমন দূষিত করে তুলছে না, তাহলেও দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘুর মানসিকভাবে এতই নিরাপত্তাবোধহীন যে তারা নিজেদেরকে পক্ষপাত দুষ্টতার শিকার বলেই মনে করে। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কাছে প্রকৃত বৈষম্যমূলক আচরণ যতটা ক্ষতিকর অনুরূপ আচরণ সম্পর্কে তাদের ধারণাও ততটাই ক্ষতিকর — এই মানসিকতা তাদের যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যম ও সাফল্যকে প্রভাবিত করে। খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে নেহেরু বলেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের চিন্তাতে নয়, সংখ্যালঘিষ্টরা কী মনে করছে সেটাই হবে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক পরীক্ষা।

শিক্ষা এবং চাকুরীর ক্ষেত্র ছাড়া আন্তঃগোষ্ঠী হিংসা ও সংঘাতের ক্ষেত্রেও পক্ষপাত ও বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এখন তো যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ দিয়েই এটা দেখান যায় যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোটি ক্ষেত্র বিশেষে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে না; দেখা যায় যাদের দায়িত্ব হ'ল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তারা ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী পথে কাজ করছে এবং তার শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা।

গোষ্ঠী ভাবনা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের উৎসব অবশ্যই নিহিত রয়েছে ব্রিটিশ শাসন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের মধ্যে। তা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার যথার্থ প্রচেষ্টা থাকলে আমাদের দেশের মানুষেরা নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে ভারতীয়ত্বের অভিন্ন বন্ধনে নিজেদেরকে সুসংহত করতে পারত।

উপরের আলোচনায় যে বিষয়টি উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তা হ'ল এই যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বাস্তবায়িত করা কঠিন হয়ে পড়বে, বিশেষত যখন আমাদের জাতীয় এবং পৌর জীবনের সব ক্ষেত্রেই ধর্ম তার প্রাধান্য বজায় রেখে চলেছে। আসলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যও একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হ'ল ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববীক্ষার বিস্তার; পশ্চিমের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষকরণের সাধারণ সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটেছে। ইমতিয়াজ আহমদ ঠিকই বলেছেন, ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট হিসেবে ঘোষণা করার যে অনন্য এবং বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার বাস্তব রূপদানের জন্য প্রয়োজন ছিল অসাধারণ উদ্যম ও প্রচেষ্টার। একইরকম প্রয়োজন ছিল সচেতনভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের সমাজের ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী শক্তিগুলিকে নিরুৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রিত করা।

২২.৭ ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

এখন আমরা যে প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি তা হ'ল : একটি যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা প্রসারের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ? গোপাল বলেছেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের উপরই একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার জন্য জনসাধারণের মনোভাব পাল্টান প্রয়োজন। নেহেরু আশা করেছিলেন জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পাবে। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করে দেখেছি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্তত এই প্রত্যাশা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অপর বিকল্পটি হ'ল শিক্ষা, যা অনেকের মতে অর্থনৈতিক উন্নতির তুলনায় (নির্দিষ্ট সমস্যাটির সমাধানে) বেশী কার্যকরী। সুতরাং, ধর্মনিরপেক্ষতার বিস্তারে শিক্ষার ভূমিকা কিরকম তার পর্যালোচনা করা যাক্।

২২.৭.১ শিক্ষা

আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারে শিক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার সার্বিক ভূমিকা নিয়ে অতিরঞ্জনের সুযোগ হয়ত আছে, তবুও এটা অনস্বীকার্য যে, যে দেশগুলি জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে তাদের জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্ববীক্ষায় আধুনিকতাকে প্রবিষ্ট করাতে শিক্ষার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করতে হচ্ছে।

অতীতে পাঠশালা, গুরুকুল এবং মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা সাবেকী ধর্মীয় বিদ্যাচর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং উন্নত কারিগরী বিদ্যা অর্জনকে গুরুত্ব দেয়। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যার্থীদের, বিশেষত অল্পবয়স্কদের মনের উপর এটি প্রভাব ফেলে। যেহেতু তরুণ মনে নতুন চিন্তা ও নতুন মূল্যবোধ সহজেই ছাপ ফেলে তাই নীবনদের উপর শিক্ষার প্রভাব পড়ে সর্বাধিক। তাছাড়া এদের অনুসন্ধিৎসাও বেশী এবং যা শেখান হয় সেগুলিকে এরা সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখে এবং সেইভাবে গ্রহণ করে। সুতরাং আশা করা হয় যে, তারাই

সমাজে পরিবর্তন সাধনের কাজ করবে।

ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা অনেকটাই নির্ভর করছে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর, যারা আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদের আলোকে আলোকিত হচ্ছে।

অবশ্য, এই তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকাশে কতটা সাফল্য আসবে তা অন্য অনেক উপাদানের উপর নির্ভরশীল, কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে ক্রিয়াশীল থাকে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এর আগে আমরা এই এককটিতে দেখেছি যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যেমন বলা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীটি স্পষ্ট। কিন্তু এই ব্যবস্থা শিক্ষা-পাঠক্রম, সেটি যুক্ত যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে, সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেয় না। পাঠক্রমের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট মূল্যবোধ গড়ে তোলার সঙ্গে যুক্ত; তাই দেখা দরকার কীভাবে তা ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সৌভাগ্যবশত এট দেখার জন্য উপযুক্তমাধ্যম ও ব্যবস্থাদিও আছে। উদাহরণস্বরূপ, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং-এর কথা বলা যেতে পারে , যেখানে বিদ্যালয় স্তরের উপযোগী পাঠ্যবই রচনার কাজ হয় এবং সেই সব বইতে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধগুলি গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপরন্তু, মাঝে মাঝেই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রচলিত পুস্তকগুলির সমীক্ষা করান হয় যাতে কোথাও কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার অবকাশ না থাকে। এই সংক্রান্ত যে কোন তরফ থেকে আনীত অভিযোগকে গভীরভাবে বিবেচনা করা হয় এবং সত্যিই যদি কোন ত্রুটি হয়ে তাকে তা দ্রুত শোধরানোর চেষ্টা হয়। জ্ঞান ও মূল্যবোধের বিস্তারে এগুলিই হ'ল উপযুক্তব্যবস্থা যা সংস্কারমুক্তএবং কোন সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধাচরণকে প্রশ্রয় দেয় না। এছাড়া ঘন ঘন আলোচনাসভা ও সম্মেলনের আয়োজন করে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সেই সব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের প্রচেষ্টা হয়ে থাকে যা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের গঠনমূলক ও সদর্থক দিকগুলিকে প্রকাশ করে এবং সেই অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকেও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রসারিত কর যায়। এসব পদক্ষেপ এই সত্যটিকেও প্রতিষ্ঠিত করে যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যবোধবর্জিত নয়। মূল্যবোধহীন শিক্ষা নিষ্প্রাণ; বিদ্যার্থীকে কোন পথের সন্ধান দেয় না। যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারে শিক্ষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে ১৯৮৬ সালে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার প্রয়াসে কিছু সর্বজনীন মূল্যবোধ বিকাশের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এছাড়া এটাও বলা হয়েছে যে, শিক্ষার মাধ্যমেই অজ্ঞাত, পশ্চাৎমুখীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, হিংস্রতা, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি ক্ষতিকারক প্রবণতাগুলিকে দূর করার জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই সমস্যাগুলিকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপনের ফলে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি কী কী তার প্রতি এই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শিক্ষানীতির এই দলিলটিতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের অপর যে মাত্রাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হ'ল 'সাম্যের জন্য শিক্ষা'। তাই এই নতুন নীতিতে বৈষম্য দূর করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের সমতা আনার কথা বলা হয়েছে, বিশেষত এতকাল যারা সমতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদেব বিশেষ দাবী ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে। এই নতুন গুরুত্ব প্রদান বিশেষভাবে উপকৃত করবে মহিলা, তপশীলীভুক্ত জতি ও উপজাতি সম্প্রদায়গুলিকে, অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রভৃতি দুর্বলতর শ্রেণীগুলোকে। ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের

শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যে কোন ব্যক্তিরই প্রাথমিক সামাজিকীকরণ হয় মায়ের সংস্পর্শে থেকেই এবং ফলত, যা কিছু মূল্যবোধ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় তা তার মার কাছে থেকেই পাওয়া। অশিক্ষিত মায়েরা যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করবে এটা আশা করা যায় না। প্রধানত আলোক প্রাপ্ত মায়েদের সাহায্য নিয়েই আমাদের সমাজের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি নির্মাণ করা যাবে। তাই এটা আশা করা খুব যুক্তিযুক্ত যে, যতই ভারতবর্ষের নারী সম্প্রদায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় ততই অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজে ব্যাপক ও সুগভীর পরিবর্তন দেখা দেবে।

২২.৭.২ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে শিক্ষাব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, বিশেষত যদি সমাজটা পশ্চাৎমুখী, কুসংস্কারসম্পন্ন এবং মৌলবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর জন্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে এবং জনমত তৈরী করতে হবে। জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে অংশগ্রহণের জন্য সংখ্যালঘুদের উৎসাহিত করতে হবে। সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় ও সমতার নীতিকে জনসমাজের সব স্তরেই প্রসারিত করতে হবে। এই সব মূল্যবোধের বিস্তারে কোন ধর্মীয় বাধাকে আমল দেওয়া হবে না। এই সব কাজে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ হ'ল নারী আন্দোলন, জনগণের জন্য বিজ্ঞান-চর্চ্চার আন্দোলন ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগত আন্দোলনসমূহ।

আশা করা যায়, এই সব প্রচেষ্টাগুলি ভারতীয় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণের পথে প্রভূত অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করবে। অর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসে তার যথার্থ অবদানের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা তার উপযুক্ত দবি জানাতে পারবে।

অনুশীলনী ৩

১) ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে নেহেরুর ধারণা সম্পর্কে পাঁচটি লাইন লিখুন :

.....

.....

.....

.....

.....

২) ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সমস্যাগুলি কী কী ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩) শিক্ষা কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসারে সহায়তা করে ?

.....

.....

.....

.....

২২.৮ সারাংশ

এককটিতে চেষ্টা হয়েছে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপটি আলোচনা করার - তার বিবর্তন, পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে তর পার্থক্য, তার সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলি এবং ভারতবর্ষে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসারে শিক্ষার ভূমিকা নির্দেশ করা।

এটা দেখান হয়েছে যে, ভারতীয় সংবিধানের রূপকারগণ স্পষ্টভাবেই ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভাবতে পেরেছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় স্বাধীনতা, সুযোগের সমতা, সব নাগরিকের জন্য আইনের দৃষ্টিতে সমতা ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরেছিলেন এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, এইগুলি একবারে সুনিশ্চিত হ'লে ভারতীয় সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠবে। এটা ঠিকই যে, এই ব্যবস্থাগুলি এবং প্রতিজ্ঞাগুলি অনেকাংশেই কেবলমাত্র সংবিধানের ছপার অক্ষর হিসাবে না থেকে বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছে। যেমন বলা যায়, ভারতীয়রা তাদের নিজ নিজ পছন্দমত যে কোন ধর্মে বিশ্বাস করা, তাকে অনুসরণ করা ও প্রচার করার অধিকার উপভোগ করে, তারা স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় নীতিগুলি সব দিক থেকেই অবৈষম্যমূলক। এখন এখানে একটি অ-সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী রয়েছে এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদটিও এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে মুক্ত। সুতরাং, সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সচল, প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এই অলোচনায় এটাও আবার দেখান হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি এখনও পরিপূর্ণতা পায়নি। যেমন আমরা অভিন্ন দেওয়ানিবিধি তৈরী করতে পারিনি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, ধর্মীয় মৌলবদ, পুনরুজ্জীবনবাদ এসব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং অনেক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতীককেই 'জাতীয় সংস্কৃতি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষদের মনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যে সমাজ সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ নয় সেখানে কেবল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বজায় রাখা কঠিন। তাই এই ব্যক্তব্যও হাজির করা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ রাখলে সেটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়ার প্রসারে সহায়ক হবে না। বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রব্যবস্থার সীমিত ক্ষেত্র এবং বৃহত্তর সমাজ এই দুইয়ের মধ্যে যে অমিল ও ব্যবধান রয়েছে তা ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি ও জাতি নির্মাণ প্রক্রিয়ার উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

এই চাপ কমানোর জন্য ভারতবর্ষে যে প্রকৃত যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা গড়ে তোলা প্রয়োজন সে কথা বলা হয়েছে। এই কাজে শিক্ষা কী ধরণের ভূমিকা পালন করতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে এবং এটা দেখান হয়েছে যে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও কার্যকরী করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে নিয়ে চলেছে।

২২.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

কর্তৃত্ববাদ : এমন এক ব্যবস্থা যেখানে কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য জানাতে হয়।

দেবদাসী : কোন মন্দিরে দেবতার সেবায় নিযুক্ত নারী, ফলত যার কোন ব্যক্তিগত জীবন নেই, যে সর্বজনের নারী।

পুরোহিততন্ত্র : ধর্মীয় সংগঠন সংক্রান্ত।

মুক্তি : বন্ধন থেকে মুক্তি।

মৌলবাদ : এমন এক মতাদর্শ যা সেই জীবনধারায় ফিরে যেতে চায় যেখানে সব কিছু পরিচালিত হবে হুবহু ধর্মীয় গ্রন্থকে অনুসরণ করে।

অন্তর্ঘাতী : পরস্পর ধ্বংসাত্মক।

পশ্চাৎমুখীনতা : পুরোন সনাতন বিশ্বাসগুলিতে আস্থা জ্ঞাপন।

বহুত্ব : নানাপ্রকার সংস্কৃতি ও জাতি গোষ্ঠীর সহাবস্থান।

ধর্মরাষ্ট্র : এমন রাষ্ট্র যা দৈব-বিধি তথা ধর্মীয় নীতি-নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Smith, D. E. : *India as a Secular State*, Princeton University Press, Princetion, 1963.

Luthera, V.P. : *Concept of Secular State and India*, O. U. P. Delhi, 1960

২২.১১ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) (ক) ধর্মযাজক

(খ) আধ্যাত্মিক, জাগতিক

২) কঠোরভাবে বিচার করলে এটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে, কিন্তু ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সহাবস্থান হতে পারে, কেননা ধর্ম কেবল মানবজীবনের অস্তিত্বের অতীন্দ্রীয় তাৎপর্যকেই নির্দেশ করে। উভয়ের মধ্যে বিরোধীতার উৎপত্তি হয় এই কারণে যে, কুসংস্কারমূলক আচার ব্যবহারগুলি (যেগুলি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি দূর করতে চায়)

ধর্মের সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে যায়। অনুচ্ছেদ ২২.২.২ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী ২

১) যেখানে পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতর জন্ম হয়েছে একদিকে চার্চ ব্যবস্থা এবং অপরদিকে সাধারণ মানুষসহ রাষ্ট্র এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের ফল স্বরূপ, সেখানে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কেন সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের তরফে জনগণকে নিপীড়নের ঘটনা নেই। ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় সহাবস্থানের একটি ঐতিহ্য রয়েছে, ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ ২২.৩.১ দ্রষ্টব্য।

২) (ক) সেইসব সাংবিধানিক ধারা যেখানে বলা আছে যে, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক বিবেকের স্বাধীনতা উপভোগ করবে এবং যে কোন ধর্ম অনুসরণ ও প্রচার করার অধিকার পাবে। অনুচ্ছেদ ২২.৩.২ দ্রষ্টব্য।

(খ) ১৯৭৬-এর ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

৩) বহুত্ববাদের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র খুবই জরুরি। গান্ধীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এই বিশ্বাসকেই জোরদার করে যে, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক রাখা উচিত। অনুচ্ছেদ ২২.৩.৩ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী ৩

১) নেহেরু এই অর্থে চেয়েছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটুক। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নেহেরুর ধারণা ছিল পশ্চিমী মডেলের কাছাকাছি। ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার কাজটা হ'ল ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র। অনুচ্ছেদ ২২.৫ দ্রষ্টব্য।

২) ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি কেবল রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানে এই ধর্মনিরপেক্ষতা কোনভাবে হস্তক্ষেপ করে না। ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সমস্যা বহুবিধ-অভিন্ন দেওয়ানী বিধির অনুপস্থিতি, রাজনীতি ও ধর্মের মিশ্রণ ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ ২২.৬ ও অনুচ্ছেদ ২২.৬.১, ২২.৬.২, ২২.৬.৩, ২২.৬.৪ দ্রষ্টব্য।

৩) জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রগুলি কেবল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করে। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্ববীক্ষায় আধুনিকতা আমদানীর জন্য আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যার্জন এবং উন্নত কারিগরী দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এন.সি.ই.আর.টি-এর মত সংস্থা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধ গঠনের উপর জোর দেয়। অনুচ্ছেদ ২২.৭.১ দ্রষ্টব্য।

পর্যায় ৬ : রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার কার্যাবলী বিষয়ে পঠন-পাঠনই এই অংশের আলোচ্য বিষয়। একক ২৩-এ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসমূহ, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ এবং এ দেশে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও এ দেশে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিসমূহ ও সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী দু'টি অংশে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

একক ২৪-এ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিবর্তনের ধারা আলোচিত হয়েছে ও যে সকল বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে তা আলোচিত হয়েছে।

একক ২৫-এ ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অংশে এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ও জয়প্রকাশ নারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা এবং ভারতে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

শেষ একক ২৬-এ ভারতীয় সমাজের দুর্বলতর অংশের সমস্যা ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের নীতিগুলি সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একক ২৩ ❑ ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি

গঠন

২৩.০ উদ্দেশ্য

২৩.১ প্রস্তাবনা

২৩.২ প্রস্তাবনা ও মৌলিক মূল্যবোধ

২৩.২.১ প্রস্তাবনার অংশসমূহ

২৩.২.২ প্রস্তাবনা কি সংবিধানের অংশ?

২৩.৩ রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

২৩.৩.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি

২৩.৩.২ নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

২৩.৪ মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

২৩.৪.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার

২৩.৪.২ কর্তব্যসমূহ

২৩.৫ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান

২৩.৫.১ গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

২৩.৫.২ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি

২৩.৬ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

২৩.৬.১ ভারতীয় সংবিধানে সমাজতন্ত্র

২৩.৬.২ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হিসেবে সংবিধান

২৩.৭ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

২৩.৭.১ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

২৩.৭.২ একতার নীতি

২৩.৮ সারাংশ

২৩.৯ উত্তরমালা

২৩.০ উদ্দেশ্য

ভারতীয় সংবিধান দেশের মৌলিক আইন। ১৯৪৯ সালে গৃহীত এই সংবিধান শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিই স্থাপন করেনি, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যগুলিকেও ঘোষণা করেছে। সংবিধানব্যাপী যে মূল কথা বলা হয়েছে এই অংশে তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অংশটি পড়ার পর আপনি –

- সংবিধানের প্রস্তাবনার অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- যে-সকল বিধি অনুসরণ করে রাষ্ট্র কাজ করে থাকে তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- সংবিধানে ব্যবহৃত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২৩.১ প্রস্তাবনা

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য ১৯৪৬ সালে একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি গণপরিষদ সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য, যেমন – জনগণের স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায় অর্জন; অনুন্নত জাতি ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ – সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। ভারতের জনগণই যে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস এই বিষয়টি গণপরিষদে সুনিশ্চিত করা হয়। ডঃ বি আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে সংবিধান অনুলিখনকারী একটি কমিটি ভারতের সংবিধান রচনা করে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে সেই সংবিধান কার্যকর হয়।

২৩.২ প্রস্তাবনা ও মৌলিক মূল্যবোধ

প্রস্তাবনা হ'ল সংবিধানের যুক্তি ও বিষয়গুলির প্রাথমিক বিবরণী। সেই অনুযায়ী ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা সংবিধানের কেন্দ্রীয় বিষয় ও মূল দর্শন আলোচনা করেছে। এ ভাবেই প্রস্তাবনাটি সংবিধানের রাজনৈতিক ও দার্শনিক বার্তা বহন করে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে :

"আমরা ভারতের জনগণ, সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প করছি ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং এ দেশের সকল নাগরিকই যাতে :

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার;

চিন্তার, মতপ্রকাশের, বিশ্বাস, ধর্মে ও উপাসনার স্বাধীনতা;

মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা লাভ করে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সুদৃঢ়করণের জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ বর্ধিত হয়, তার জন্য

এই গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর আমরা এই সংবিধান গ্রহণ করে, বিধিবদ্ধ করে নিজেদের অর্পণ করছি।"

২৩.২.১ প্রস্তাবনার অংশসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, প্রস্তাবনা শুধুমাত্র মূল সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো বা সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধকে বিবৃত করে না, ভারতের সংবিধানের এই সকল নীতি যে ওপর থেকে আরোপিত নয় সে কথাটিও স্পষ্ট হয়। ভারতের জনগণ নিজেদের পরিচালনার জন্য নিজেরাই সংবিধান রচনা করেছে। অন্য আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রস্তাবনাকে মূল ন্যায়সঙ্গত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়। সম্পূর্ণ প্রস্তাবনাটিকে নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে ভাগ করা যায় :

(ক) ঘোষণামূলক

আমরা ভারতের জনগণ, আমাদের এই গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ, নিজেদের অর্পণ করছি।

প্রস্তাবনার এই অংশের অভিপ্রায় এবং তাৎপর্য মূলত ঘোষণামূলক। ভারতের জনগণ ও বহির্বিশ্বের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে সংবিধানকে ভারতের জনগন গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবনার এর পরের অংশটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই অংশটি থেকে ভারতের জনগণ, যারা গণপরিষদে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কার্য্য সম্পাদন করে, তাদের জাতিগত ও অন্যান্য বিভিন্নতাকে দূরে সরিয়ে রেখে ভারতকে একটি জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট কারণ, জনগণ যদি নিজেদের একে অন্যের থেকে পৃথক বলে মনে করে তাহলে তারা একসঙ্গে একটি ঘোষণামূলক বিবৃতি প্রকাশ করতে পারেনা। সব শেষে সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে জনগণের কাছে যারা শুধু সংবিধানকে নিজেরা গ্রহণ, বিধিবদ্ধ ও অর্পন করেছে। সুতরাং, এখানে দেশের বাইরে বা ভেতর থেকে এই সংবিধানকে চাপিয়ে দেবার বিষয় নেই। জনগণের ইচ্ছা জনগণ নিজেরাই সংবিধানে রূপায়িত করছে।

(খ) উদ্দেশ্যমূলক

প্রস্তাবনার উদ্দেশ্যমূলক অংশটি নীচে বলা হ'ল :

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প করে ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

'সার্বভৌম' বলতে এখানে বোঝায় যে, রাষ্ট্র বাইরের দিক থেকে স্বাধীন ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় যে, দেশে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কর্তৃত্বের অধিকারী এবং এখানে সরকারের প্রধান রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রস্তাবনায় যে শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিছক আভিধানিক অর্থেই কার্যকরী বরং জনপ্রতিনিধিগণ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা এগুলির সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। যেমন 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুযায়ী 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির সঙ্গে প্রস্তাবনায় সংযুক্ত হয়। 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটির অর্থ নিয়ে লোকসভায় বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য হ'ল, ''সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। 'সমাজতন্ত্র' আমাদের নিজস্ব ধাঁচের। আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা কিছু ক্ষেত্রে জাতীয়করণ করব কিন্তু শুধু জাতীয়করণ করাই আমাদের সমাজতন্ত্রের ধরন নয়।'

একইভাবে জাতিসমূহের কমনওয়েলথের সদস্য থাকা না থাকার সঙ্গে ভারতের সার্বভৌমত্বে কিছু যায় আসে না। যদিও ব্রিটেনের রানী কমনওয়েলথের প্রতীকি প্রধান। কমনওয়েলথের সদস্যপদ সম্পূর্ণভাবে ঐচ্ছিক – তা ভারতের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করে না।

প্রস্তাবনার উপর্যুক্ত বিষয়টি শুধুমাত্র 'উদ্দেশ্যমূলক' নয়, 'বাধ্যতামূলক'ও বটে। ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোকে একটি নির্দিষ্টভাবে গঠন করতে ভারতের জনগণ বদ্ধপরিকর, তাই জনগণ অথবা কোনও প্রতিনিধিমূলক সংগঠন কোনও অংশকে অমান্য করতে পারে না। রাষ্ট্রের কাজকর্মের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের এই অংশে যা বলা হয়েছে তাকেই তুলে ধরতে হবে।

(গ) বর্ণনামূলক

প্রস্তাবনার বর্ণনামূলক অংশটি হল :

প্রত্যেকটি নাগরিকের মধ্যে যাতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার অনুকূল ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয় তার চেষ্টা করা। উপরোক্ত অংশটি শুধু নিছক 'বর্ণনা' নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। সংবিধানের দৃঢ় ভিত্তি ও বিষয়-বৈশিষ্ট্য এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেইজন্য প্রস্তাবনায় শুধুমাত্র ব্যক্তির উপভোগ্য বিভিন্ন স্বাধীনতার কথাই বর্ণনা করা হয়নি তার সঙ্গে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার অবিচ্ছেদ্য উদ্দেশ্যের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে,

প্রস্তাবনায় মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্যের ধারণাগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যা সংবিধানের পরবর্তী অংশগুলিতে বিবৃত করা হয়েছে।

২৩.২.২ প্রস্তাবনা কি সংবিধানের অংশ ?

এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। এমন কি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টও এই বিষয়ে তার মতামত পরিবর্তন করেছে। ১৯৬০ সালে প্রস্তাবনাকে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অংশ হিসেবে গণ্য করেনি কিন্তু ১৩ বছর পরে সুপ্রীম কোর্ট প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে, কারণ প্রস্তাবনায় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সংক্রান্ত আলোচনা একটি বিষয়কেই স্পষ্ট করে যে, সংবিধানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে কিছু মূল্যবোধ। প্রথমত, প্রস্তাবনা ক্ষমতার উৎস হিসেবে রাজার পরিবর্তে জনগণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবনা অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক – সমাজতান্ত্রিক যা নাগরিকদের কিছু মূল অধিকার ও সাম্য উপভোগ করতে সাহায্য করবে। তৃতীয়ত, প্রস্তাবনা একদিকে নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা, অন্যদিকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। এই শেষের বক্তব্যটি, আমরা দেখব, সংবিধানের পরবর্তী অংশে জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়েছে।

২৩.৩ রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি তাকে অগ্রবর্তী করেছে। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের রাজনৈতিক এবং নৈতিক পরিসরকে আরও বিস্তৃত করেছে। ৩৬ থেকে ৫১ – এই ১৯টি ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি ব্যক্তির অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে এবং মূল মূল্যবোধকে বাস্তবে রূপায়িত করতে রাষ্ট্রের কর্তব্যের কথা আলোচনা করেছে। তবে সর্বাগ্রে আমরা নির্দেশমূলক নীতি বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করব।

স্বাভাবিকভাবে এই ধারাগুলিতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে এগুলি কিছু নির্দেশমূলক নীতির জন্ম দেবে যেগুলি রাষ্ট্রের কার্যাবলী অথবা পদ্ধতির ক্ষেত্র নির্ধারণ করবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই নীতিগুলি এমন একটি বিষয়ের নির্দেশ দেবে যা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও নতুনত্ব দেখাবে না। এই বিভাগের শিরোনাম থেকে যা ফুটে ওঠে এটি কিন্তু তা নয়; এটাই আসলে দাঁড়িয়েছে যে এই ধারাগুলিতে যে নীতি নির্দিষ্ট হচ্ছে ব্যক্তির সম্পর্কে ও তা একটি বিশেষ নির্দেশ দেবে। এর সত্যতা আমরা সংক্ষেপে হলেও যাচাই করতে পারি যদি আমরা ধারাগুলির বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

২৩.৩.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি

৩৮ ও ৩৯ নম্বর ধারা দু'টি অন্যান্য নির্দেশমূলক নীতি সংক্রান্ত ধারাগুলি থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সংবিধানের ৩৯ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র এমনভাবে তার নীতি পরিচালনা করবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ব্যবহার করা হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই যেন জীবিকার্জনের যথোপযুক্ত সুযোগ থাকে ও শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না ঘটে।

৩৮ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র জনসাধারণের মঙ্গলসাধনার্থে একটি সঠিক সামাজিক কাঠামো গঠন করবে। এই সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে সংবিধানের ৩৮ ও ৩৯ নং ধারাগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেই সার্বিক কল্যাণের

জন্য প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকার্জনের যথোপযুক্ত সুযোগ ও সম্পদের যথোপযুক্ত বন্টন থাকবে। সমান কাজের জন্য সমান বেতন, শৈশব ও যৌবনকে শোষণ এবং নৈতিক ও পার্থিব দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করা হ'ল রাষ্ট্রের কর্তব্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, ৩৮ নং ধারা যেখানে একটি সাধারণ ও সামগ্রিক লক্ষ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে, ৩৯ নং ধারাটি সেখানে ওই লক্ষ্যগুলিকে রাষ্ট্রের বাস্তব কার্যপ্রণালীতে রূপান্তরিত করে যা ওই লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু পুনরায় বলা হচ্ছে, সংবিধানের চতুর্থ অংশে উল্লিখিত উপযুক্ত ধারা দু'টি সংবিধান কর্তৃক সরকারের প্রতি সাধারণ 'নির্দেশ' এবং কখনই তা 'আদেশ' নয়। সেই কারণে এগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয়। নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে লঙ্ঘন করা হ'লে কোনও ব্যক্তি আইনের প্রতিকার পেতে পারে না।

২৩.৩.২ নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

সংবিধানের চতুর্থ অংশের অন্যান্য ধারাগুলির নির্দেশ হ'ল – বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে ও অসুস্থতায় নাগরিকরা যাতে রাষ্ট্রের সাহায্য পায় তার জন্য রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে গ্রামপঞ্চায়েত সংগঠিত করতে হবে যেগুলি স্বায়ত্তশাসনের একক হিসেবে কাজ করবে। সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, নাগরিকরা যাতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ও অবসর উপভোগ করতে পারে রাষ্ট্রকে তার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান বা নিদর্শন সংরক্ষণ করা, গো-হত্যা নিবারণ, সারা দেশে একই দেওয়ানি আইন চালু করা, দুর্বলতর শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত স্বার্থের উন্নতিবিধান, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করাও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, রাষ্ট্র যদি সঠিকভাবে প্রত্যেকটি নীতিকে অনুসরণ করে তাহলে এটি হবে একটি কাল্পনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা সমতা ও গণ-তান্ত্রিক গুণসম্পন্ন মর্ত্যের স্বর্গে পরিণত হবে।

সুতরাং, এই ধরণের উপদেশগুলি প্রায় অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায় কারণ এই উপদেশ, ইচ্ছা বা আকাঙ্খা – এ সবকিছুই সব সময় আমাদের আয়ত্তের বাইরে অবস্থান করে। নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য হ'ল এই যে, এগুলি রাষ্ট্রে সাফল্য নির্ধারণের মাপকাঠি। কিন্তু এখানে একটি আশঙ্কাও আছে; যদি রাষ্ট্রের প্রতি এই উপদেশগুলিকে জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রের মিথ্যা অঙ্গীকার বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে গণ অসন্তোষ বাড়তে পারে আর রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিস্ফোরণের অবস্থাও আসতে পারে।

অনুশীলনী ১

১। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

.....

.....

.....

.....

.....

২। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২৩.৪ মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকারসমূহ ও মৌলিক কর্তব্যগুলি যথাক্রমে সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ 'ক' অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বরে গৃহীত মূল সংবিধানেই সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। অন্যদিকে, অতি সম্প্রতি ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক কর্তব্যগুলিকে ৫১এ অনুচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট করানো হয়।

২৩.৪.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার

সংবিধান প্রণেতাগণ যখন সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁরা সম্ভবত সুদীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অধিকার উপেক্ষার ইতিহাসকে বিস্মৃত হননি। তাই তাঁরা ব্রিটিশ শাসন-তন্ত্রের পার্লামেন্টীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার পরিবর্তে মার্কিন সংবিধানের 'বিল অভ্ রাইট্স্'-এর দ্বারা অধিকমাত্রায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবুও মৌলিক অধিকারের অস্তিত্ব সংশয়পূর্ণ। কারণ, সংবিধান প্রণয়নের ফল হিসেবে একদিকে যেমন পার্লামেন্টের আবির্ভাব ঘটেছে যা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যেমন, মৌলিক অধিকার, সংবিধানে সংযুক্ত করতে পারে তেমন অন্যদিকে এই পার্লামেন্ট একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে মৌলিক অধিকারগুলিকে সংশোধন করতে পারে।

সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২ থেকে ৩৫ নং মোট ২৬টি ধারায় মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিবৃত করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকারগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় –

(ক) সাম্যের অধিকার

(খ) স্বাধীনতার অধিকার

(গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

(ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

(ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

(চ) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

(ক) সংবিধান অনুযায়ী ভারত রাষ্ট্র তার সীমানার মধ্যে কোনও ব্যক্তির আইনের চোখে সমতা অথবা আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার অস্বীকার করতে পারবে না এবং রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, বাসস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। অস্পৃশ্যতার আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং একে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক উপাধি প্রদানও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বিষয়টি, স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজগণ কর্তৃক নবাব, রাজা, রায়সাহেব ইত্যাদি খেতাব বিতরণের মাধ্যমে পদমর্যাদার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হ'ত সেই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) সংবিধানের ১৯নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার শুধুমাত্র গণতন্ত্রের জন্য নয়, একটি সভ্য জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারাটি নাগরিকদের যে-সব অধিকার দান করেছে সেগুলি হ'ল বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমাবেশের অধিকার, সংঘ বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার, যে-কোনও বৃত্তি, পেশা অবলম্বনের অধিকার বা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার অধিকার। আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অতএব, দেখা যাচ্ছে, জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

(গ) চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কোনও কারখানা, খনি বা অন্য কোনও বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা যাবে না। মানুষ নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো বা বলপূর্বক শ্রমদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাই হোক, ব্যাপক দারিদ্র ও অজ্ঞতার কারণে সবসময় এই অধিকার কার্যকরী হয় না। বহু মানুষই তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয় অথবা অধিকার দাবী করতে পারে না।

(ঘ) সকল ব্যক্তিই কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে সমানভাবে ধর্ম স্বীকার, ধর্ম পালন ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। ধর্মীয় সংগঠনগুলি স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম বিষয়ক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে।

(ঙ) রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য সংখ্যালঘু শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

(চ) এখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য ব্যক্তিকে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের নিকট আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনও ব্যক্তি যদি রাষ্ট্র কর্তৃক উপর্যুক্ত কোনও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে সে সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আবেদন করলে আদালত যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। এই অধিকারটি ছাড়া অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন।

যাই হোক, উপর্যুক্ত অধিকারগুলি কিন্তু নিরঙ্কুশ নয়। রাষ্ট্র প্রয়োজনে এই অধিকারগুলির উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। অধিকন্তু দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে এই অধিকার স্থগিত হ'তে পারে।

অধিকারের বিপরীতদিকে আছে কর্তব্য। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে কতকগুলি কর্তব্য সংবিধানে সংযুক্ত করা হয় কিন্তু অধিকাংশ কর্তব্যগুলিই অস্পষ্ট এবং নিছক উপদেশমূলক। সুতরাং, এই কর্তব্যের বিরোধিতা কোনও দন্ডনীয় অপরাধ নয়। সম্ভবত আশা করা হয়েছিল যে, চিন্তা ও কাজের কিছু স্বভাব গড়ে তুলতে

এগুলি উপযোগী হবে। কতকগুলি কর্তব্য হল –

- সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
- দেশের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য ও সংহতি ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে।
- সংকীর্ণ গোষ্ঠী-চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্চারিত করতে হবে; দেশের মিশ্র সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে।
- যে-সব মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেগুলিকে অনুসরণ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কাররমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার সাধন করতে হবে।
- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।
- ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হতে হবে।

২৩.৫ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান

সংবিধান উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করে। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সেই সময় ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

২৩.৫.১ গণতন্ত্রের উপাদানসমূহ

গণতান্ত্রিক সরকার বলতে বোঝায় একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রতিনিধিরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সরকারকে সমালোচনা করার ক্ষমতা জনসাধারণের থাকে ও এর জন্য 'বিরোধীদের' সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন ও মুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম। রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলতে বোঝায় আইনের শাসন, রাজনৈতিক সাম্য এবং সীমাবদ্ধ সরকার।

২৩.৫.২ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি

ভারতীয় সংবিধান নাগরিকদের কিছু রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে যা জনগণের ব্যক্তিগত বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ সীমাবদ্ধ করেছে। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, নাগরিকদের সরকারের বিরোধিতা করতে সাহায্য করে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সরকার পরিবর্তন করতে পারে। সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। এই ধরণের ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা হ'ল সবচেয়ে শক্তিশালী, শাসনবিভাগ, অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদ কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে।

সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিষয়টির উল্লেখ আছে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার স্বাভাবিক কার্যকাল হ'ল ৫ বছর। তাই প্রতি ৫ বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপক নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। সেই কারণে প্রস্তাবনায় ঘোষিত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও একটি ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি যথোপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক।

অনুশীলনী ২

১। মৌলিক অধিকারগুলি কেন আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য?

.....

.....

.....

.....

২। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনগুলি মৌলিক অধিকার নয়?

(ক) সাম্যের অধিকার।

(খ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।

(গ) জীবিকার্জনের ও স্বাধীনতার অধিকার।

(ঘ) কর্মের অধিকার।

৩। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

.....

.....

.....

.....

২৩.৬ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

আপনি এই অংশের ২৩.২.১ এর ভাগে পড়েছেন যে, সংবিধান সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গড়তে চায়। এখানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুশীলন করা যাক।

২৩.৬.১ ভারতীয় সংবিধানে সমাজতন্ত্র

যদিও প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এই সমাজতন্ত্র কিন্তু মার্কসীয় সমাজতন্ত্র নয়। সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের-হাতে থাকে। এই ধরনের অর্থনীতির মূলমন্ত্র হ'ল জনগণের চাহিদা পূরণ, ব্যক্তিগত মুনাফালাভ নয়। রাষ্ট্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নাগরিকদের কর্মের অধিকার থাকে। ভারতীয় সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে আর গণ্য করা হয় না, কিন্তু তা সংবিধানের ৩০০ (ক) নং ধারায় সাধারণ আইনগত অধিকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষত, সাম্যের অধিকার, জীবিকা ও বাণিজ্যের অধিকার এবং অন্যান্য অধিকার অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে। তাই, এক্ষেত্রে যা সম্ভব তা হ'ল জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বা মিশ্র অর্থনীতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এই ধরনের রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকতে পারে তবে অর্থনৈতিক অসাম্য একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একটি ন্যূনতম জীবন ধারা বজায় রাখতে পারে।

২৩.৬.২ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হিসেবে সংবিধান

আপনি আগে দেখেছেন (একক ২২-এ) যে পশ্চিমের দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হবে। সংবিধান রাষ্ট্রকে কোনও বিশেষ ধর্মের বিকাশ থেকে নিবৃত্ত করে এবং রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারে না। আবার রাষ্ট্র থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। তাই রাষ্ট্র প্রত্যেক ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হবে। রাষ্ট্র সমাজ-সংস্কার অথবা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করতে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাই বোঝায় 'সর্বধর্ম সমভাব'। অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে ঔদাসীন্য নয় বরং সকল ধর্মকে সমমর্যাদা দান।

২৩.৭ বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য

ভারতীয় সংবিধান সমাজের বৈচিত্র্যের প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে এবং সংরক্ষণ করতে উদ্যোগী। একই সঙ্গে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উন্নতিবিধানেও আগ্রহী। ভারতীয় সংবিধান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে এক সুন্দর ভারসাম্য রক্ষা করে।

২৩.৭.১ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

সংবিধান ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে এর ভাষার বিভিন্নতা ও প্রাদেশিক বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে প্রয়াসী। এই ধরণের ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলিকে প্রাদেশিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হয়। প্রতিটি রাজ্য নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়, যেমন কৃষি, জনস্বাস্থ্য, সেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করতে পারে। ভাষাগত দিক থেকে সংখ্যালঘুরা তাদের স্বার্থ ও নিজস্বতা বজায় রাখতে পারে।

২৩.৭.২ ঐক্যের নীতি

সংবিধান জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলেছে। এই সরকারের সুবিস্তৃত আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পদ থাকবে। যদি কখনও দেশে ঐক্য ও সংহতি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায়। এই রকম অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস করে। যখন কোনও রাজ্য সরকার সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সংবিধানের এই সব ব্যবস্থা বন্দোবস্ত থেকে একটি জিনিষ সুস্পষ্ট হয় যে, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা থেকে উৎসারিত বিভেদমূলক শক্তি কখনই রাষ্ট্রের ঐক্যকে ভঙ্গুর করতে পারে না।

অনুশীলনী ৩

১। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝেন?

৩। সংবিধানের যে কোনও দু'টি নীতির কথা উল্লেখ করুন যা ভারতের বৈচিত্র্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।

২৩.৮ সারাংশ

ভারতীয় সংবিধানের মূলমন্ত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বারা প্রতিফলিত হয় :

প্রথমত, প্রস্তাবনার প্রাসঙ্গিকতা হ'ল যে, জনগণ নিজেরা নিজেদেরকে কোনও এক বিশেষ প্রকারে শাসন করতে ইচ্ছুক। তাই, এক্ষেত্রে কোনও বহিশক্তি সম্পূর্ণরূপে অবান্তর। জনগণ ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবনার মূল ভাবাদর্শগুলি মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে ভাস্বর হ'তে দেখা যায়। সংবিধান রচয়িতাদের দূরদর্শিতা ও আদর্শবাদী চরিত্রটি প্রস্তাবনায় পরিস্ফুট হয়। এমন কিছু অধিকার আছে যেগুলি ছাড়া ভদ্রস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নয়, সেগুলিই হ'ল মৌলিক অধিকার। আর, ব্যক্তির উন্নতি সাধনে রাষ্ট্র যে পথে অগ্রসর হবে সেই পথের নির্দেশ দেয় নির্দেশমূলক নীতিগুলি। এই নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হ'লেও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, একটু বেশি বিলম্বে হ'লেও রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিতে আলোকপাত করতে সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলিও সংযুক্ত করা হয়। সুতরাং, রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের কিছু অধিকার প্রদান করে, অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হবে যদি নাগরিকেরা সেই মর্মে কিছু কর্তব্য পালন না করে। এই কর্তব্যগুলির পেছনে কোনও অনুমোদন না থাকায় এটি স্পষ্ট হয় যে, ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের বিশ্বাস আছে এবং এই মূল্যবোধগুলিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং নাগরিকের মনে এগুলি ধীরে ধীরে জেগে ওঠে যখনই তারা জীবনের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারে যা একই সময় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

পরিশেষে, সংবিধান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ও গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে সুনিশ্চিত করার অবস্থা সৃষ্টি

করে। যদি ব্যক্তিরা কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা উপভোগ না করে তাহলে এই ধরণের গণতন্ত্র সফল বা সম্পূর্ণ হবে না। এই উদ্দেশ্য কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিকে প্রভাবিত করে। জাতীয় সংহতির বিকাশের স্বার্থে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা ও সংবিধানে সংরক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির মূলমন্ত্র।

২৩.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। সার্বভৌমত্বের অর্থ বিদেশি শক্তির থেকে স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের থেকে উৎসারিত চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি নির্বাচনমূলক পদ।

২। আপনার উত্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকবে :

নির্দেশমূলক নীতিগুলি ইতিবাচক অধিকার।

এগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

যে কোনও সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি সহায়তা কররে।

অনুশীলনী ২

১। যদি কোনও অধিকার লঙ্ঘিত হয় তবে আদালতে এর প্রতিকার পাওয়া যায়। আদালত সেই আইন বা কাজকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে।

২। কর্মের অধিকার।

৩। যে ব্যবস্থায় সংসদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসন বিভাগ-এর কাছে দায়বদ্ধ।

অনুশীলনী ৩

১। ২৩.৬.২ দেখুন।

২। ২৩.৬.১ দেখুন।

৩। ২৩.৭.১ দেখুন।

একক ২৪ ❑ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক : যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি

গঠন

২৪.০ উদ্দেশ্য

২৪.১ প্রস্তাবনা

২৪.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

২৪.২.১ সমন্বয়সাধনকারী ও স্বাধীন অংশ

২৪.২.২ ক্ষমতার বন্টন

২৪.২.৩ সংবিধানের প্রাধান্য

২৪.২.৪ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

২৪.৩ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন

২৪.৩.১ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ক্ষমতার হস্তান্তর

২৪.৩.২ ১৯৩৫ সালের আইন

২৪.৩.৩ গণপরিষদ

২৪.৩.৪ রাজ্যের পুনর্গঠন ও নতুন রাজ্য

২৪.৪ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

২৪.৪.১ কেন্দ্র ও রাজ্য

২৪.৪.২ বিষয়গুলির বিভাজন

২৪.৪.৩ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

২৪.৪.৪ কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা

২৪.৫ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রাজনীতি

২৪.৫.১ দলীয় রাজনীতি ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

২৪.৫.২ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মতবিরোধের ক্ষেত্রগুলি

২৪.৫.৩ সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র

২৪.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবণতা

২৪.৭ সারাংশ

২৪.৮ উত্তরমালা

২৪.০ উদ্দেশ্য

এই বিভাগে আমরা দেখব কীভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সররকারগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্টিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে জানতে পারা যাবে।

- ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিবর্তন।
- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি।
- সেইসব বিষয় বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে এবং
- বাস্তবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক।

২৪.১ প্রস্তাবনা

রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক এককে রাষ্ট্রের বিভাজন করা একটি অতি পুরনো প্রথা। এখানে এককগুলি যা প্রদেশ বা রাজ্য নামে পরিচিত হয় তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিছু স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া হয়। বিস্তারিতভাবে, যখন অঙ্গরাজ্যগুলি কিছুমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ উপভোগ করে তখন সেই ব্যবস্থাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র। আধুনিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ'ল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর উত্তর আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশ যৌথ নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতির স্বার্থে একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। তারা একটি সংবিধান তৈরি করে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ক্ষমতা উপভোগ করে, বাকি ক্ষমতাগুলি উপভোগ করে অঙ্গরাজ্যগুলি। এই ধরনের ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কীভাবে একটি সরকার যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়? এখন আমরা এর কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

২৪.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

আমরা আগে দেখেছি যে, প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। সেই অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকে। যে-সব বড় বড় রাষ্ট্রে ধর্ম, ভাষা বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকে সেইসব রাষ্ট্রে এই ধরনের বিভাজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে যখন বিভিন্ন ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগণ তাদের কিছু সীমিত স্বার্থরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হয়।

২৪.২.১ সমন্বয়সাধনকারী ও স্বাধীন অংশ

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রে একটি ও রাজ্যগুলিতে একটি করে সরকার থাকে। এই উভয় প্রকার সরকারের ক্ষমতার উৎস হ'ল সংবিধান। এর ফলে উভয় প্রকার সরকারই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, নিজস্ব এলাকার মধ্যে তারা প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের ওপর কর্তৃত্ব করে – কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের নাগরিকদের ওপর এবং রাজ্য সরকার একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের নাগরিকদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এইভাবে তারা নিজস্ব এলাকার নাগরিকদের ওপর কর ধার্য করে ও আইন প্রণয়ন করে। এইভাবে উভয় প্রকার সরকারই সমন্বয়সাধনকারী ও স্বাধীন।

একটি রাষ্ট্রসমবায়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনটি অংশগুলির উপর নির্ভরশীল এবং অংশগুলির সাহায্যে কার্য সম্পাদন করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়

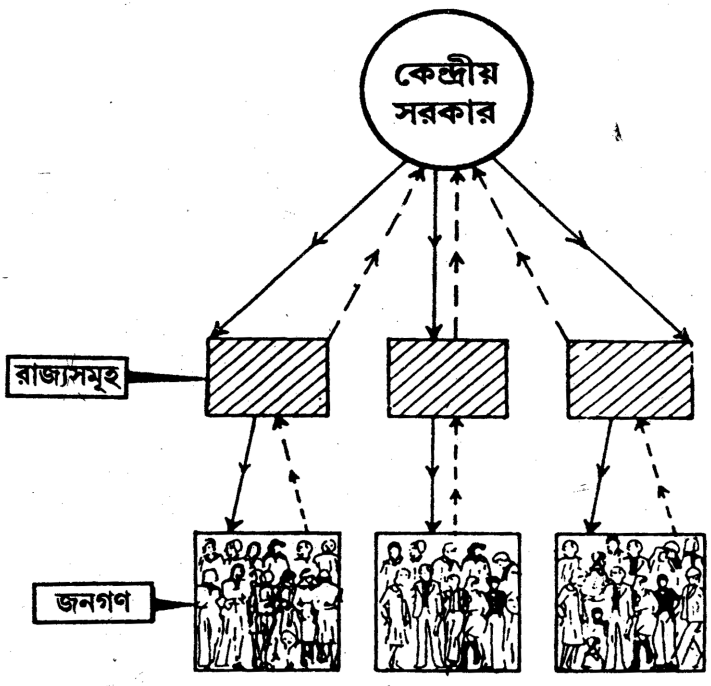

রাষ্ট্রসমবায়

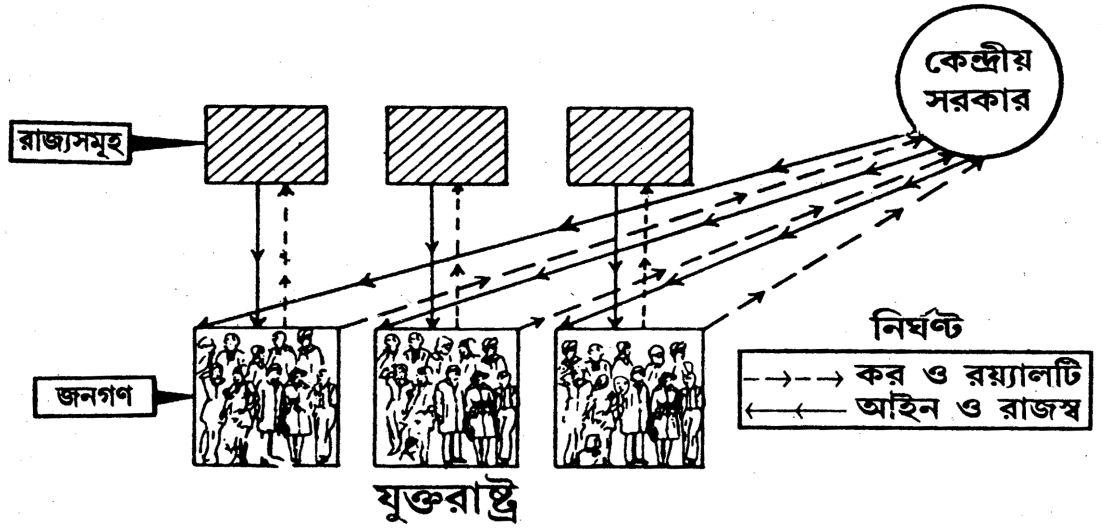

যুক্তরাষ্ট্র

অংশগুলি রাষ্ট্রসমবায় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ও নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে পারে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র হ'ল অবিনাশ্য রাজ্যগুলির একটি অবিনাশ্য সম্মেলন। এখানে রাজ্যগুলি সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করতে পারে না। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোনও সরকারের প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকে না।

২৪.২.২ ক্ষমতার বন্টন

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। সাধারণভাবে, যে-সব বিষয় কোনও জাতির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে জড়িত, যেমন – বৈদেশিক নীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি, সেইসব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। অন্যদিকে, আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অঙ্গরাজ্যের সরকারকে দেওয়া হয়। সংবিধানই এভাবে ক্ষমতা বিভাজন করে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা এমনভাবে বন্টিত হয় যাতে কোনও সরকার অন্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সংবিধান-নির্দিষ্ট গন্ডিরর মধ্যে থেকে উভয় ধরনের সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করে। ক্ষমতা বন্টন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও কাউন্টির মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকেও ক্ষমতা প্রদান করা থাকে আবার যে কোনও সময় তা তুলে নেওয়া হয়, কারণ এগুলি কেন্দ্র-প্রদত্ত অধিকার মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেকটি একক রাজ্যকে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়।

২৪.২.৩ সংবিধানের প্রাধান্য

সংবিধান এইভাবে দু-ধরনের সরকারের মধ্যে বিষয়গুলি বিভাজন করে একটি চুক্তির মতো করে যা মেনে চলা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ধরনের সরকারের কাছেই বাধ্যতামূলক। অন্যের সম্মতি ছাড়া এককভাবে কোনও পক্ষই চুক্তির পরিবর্তন করতে পারে না। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়পক্ষের সহযোগিতা ছাড়া এই সংবিধানকে সংশোধন করা যায় না। সরকারের কোনও কাজ, সে কেন্দ্র বা রাজ্য যাই হোক, যদি এই চুক্তির কোনও শর্তকে, অর্থাৎ সংবিধানকে লঙ্ঘন করে তবে তা বাতিল বা সংবিধান-বিরোধী বলে গণ্য হয়।

২৪.২.৪ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

এই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্র ও রাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন সংগঠন। সে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে সংবিধান সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করবে। বিচারশালা প্রায়শই এই ভূমিকা পালন করে। বিচারালয় সংবিধানকে তুলে ধরে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে একজন পক্ষপাতহীন বিচারকের ভূমিকা পালন করে।

২৪.৩ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মূলে আছে এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলগুলি ছাড়া বেশ কিছু দেশীয় রাজ্য ছিল, যেগুলি ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনাধীন। তারা বিভিন্ন মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। যেমন, হায়দ্রাবাদের নিজস্ব অর্থব্যবস্থা, রেল ও ডাক ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সর্বোপরি, ভারত সরকার প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি ইত্যাদির জন্য দায়বদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ ভারত কয়েকটি প্রদেশ দ্বারা গঠিত ছিল (যেমন বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং বাংলা, যাদের প্রেসিডেন্সি বলা হ'ত)। প্রত্যেকটি প্রদেশেরই একজন

করে নিজস্ব গভর্নর, আইনসভা ও শাসন পর্ষদ ছিল। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন গভর্নর জেনারেল।

২৪.৩.১ ইংরেজ আমলে ক্ষমতার হস্তান্তর

ইংরেজ রাজত্বকালে কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য খর্ব না করে প্রদেশগুলিতে ক্ষমতা অর্জনের একটি প্রবণতা ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা অর্পনের পদক্ষেপ ও সুযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রাদেশিক সরকার তাদের জনপ্রতিনিধিত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের জন্য অধিক ক্ষমতা, বেশি স্বাধিকার দাবি করে। এইভাবে মন্ট-ফোর্ড সংস্কারে ১৯১৯ সালে ভারত-শাসন আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে কিছুটা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রাদেশিক আইন পরিষদ কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

২৪.৩.২ ১৯৩৫ সালের আইন

১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম নিষ্ঠা সহকারে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন পাশ করে। এই আইন দেশীয় রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করে। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক তালিকার স্পষ্ট বিভাজন দেখা যায়। ১৯৩৫-এর আইন ব্যাখ্যার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে অর্পণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে এবং দেশীয় রাজাদের ঔদাসীন্যের ফলে যে রকম ভাবা হয়েছিল সে রকম যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়নি। যাই হোক, ব্রিটিশ ভারতে আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠিত হয় ও প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গড়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় মুসলিম লিগ প্রদেশগুলির জন্য আরও বেশি ক্ষমতা দাবি করে। অন্যদিকে কংগ্রেস একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে আগ্রহী ছিল। ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লিগের দাবি মেটাতে সচেষ্ট ছিল এবং এই কমিশন অনেকটা রাষ্ট্রসমবায় ধাঁচের একটি সরকার গঠন করতে উদ্যোগী হয়।

২৪.৩.৩ গণপরিষদ

স্বাধীনতার পর গণপরিষদকে একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান দাবি পূরণ না হওয়ায় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়। দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হয় তা দমন করার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতবর্ষে যোগদান করার বিষয়ে সর্দার প্যাটেল সফল হন। পন্ডিত নেহরু অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় প্রয়োজন হয় বেশিমাত্রায় কেন্দ্রিকরণ। এইসব বিষয় সংবিধান রচয়িতারা আলোচনা করে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কারণে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই বিষয়টি নিয়ে ২৩.৫-এ আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এর আগে বিবর্তনের আরেকটা দিকে আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে।

২৪.৩.৪ রাজ্য পুনর্গঠন ও নতুন রাজ্য

এই বিভাগের প্রথমদিকে আপনি দেখেছেন যে, স্বাধীনতার সময়ে ভারতবর্ষে অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য ছিল। এই দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকগুলি রাজ্য অতি ক্ষুদ্র। সেইসব রাজ্য অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মিলে গিয়ে একটি অঙ্গরাজ্য তৈরি করেছে এবং কিছু দেশীয় রাজ্য পৃথকভাবে অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্ররাজ্য, যেমন কোলাপুর, প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মিলে গেছে। বৃহৎ রাজ্য, যেমন মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাবের কিছু সংখ্যক দেশীয় রাজ্য সম্মিলিত হয়ে গঠন করেছে পাতিয়ালা এবং পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যের ইউনিয়ন বা পেপ্‌সু। এই রাজ্যগুলি এক ধরণের অঙ্গরাজ্য তৈরি করে থাকে, যাকে বলা হয় 'খ'

শ্রেণীভুক্ত রাজ্য। প্রাক্তন চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত হয় 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত হয় 'ক' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য।

স্বাধীনতার পূর্বে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের পুনর্গঠনের দাবি ওঠে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই দাবি সমর্থন করে।

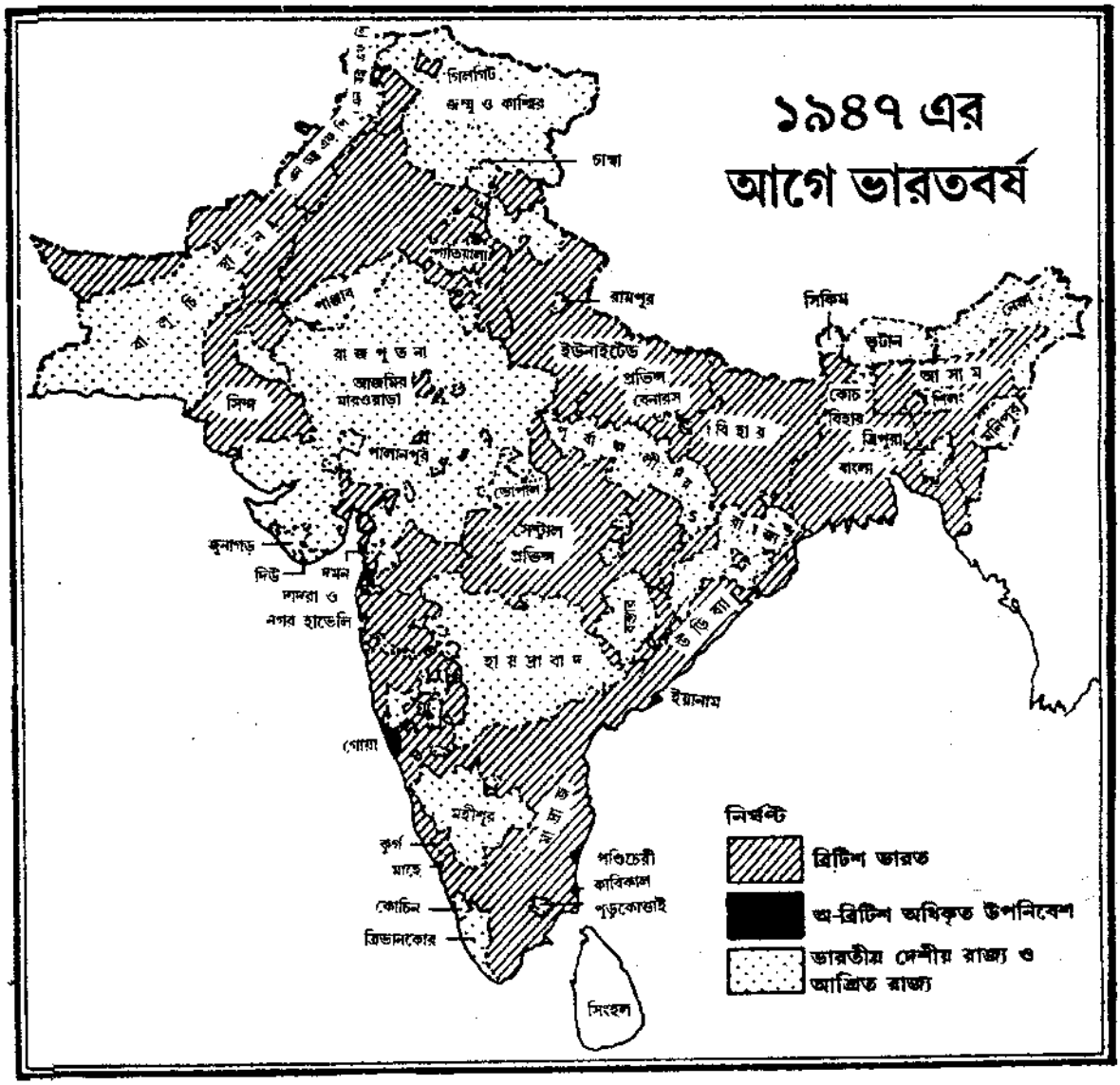

স্বাধীনতার পরে এই দাবি জোরদার হয়ে ওঠে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কায় এই দাবিকে অগ্রাহ্য করে। ১৯৫৩ সালে পোট্টি শ্রী রামুলুর অনশনে মৃত্যুর ফলে এই দাবি মাদ্রাজ রাজ্যে ব্যাপক হিংসার রূপ ধারণ করে। ভারত সরকার তখন সাধারণের দাবি মেনে নিয়ে তেলুগুভাষীদের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠন করে। সরকার একটি তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিশন গঠন করে (রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন) এইরকম দাবি বিবেচনার জন্য।

১৯৫৬ সালে এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়। এধরনের পুনর্গঠন চলতে থাকে ও ১৯৬০ সালে দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্যকে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। পাঞ্জাবকে বিভক্ত করে ১৯৬৬ সালে হিন্দীভাষীদের জন্য হরিয়ানা ও পাঞ্জাবিভাষীদের জন্য পাঞ্জাব রাজ্য গঠন করা হয়।

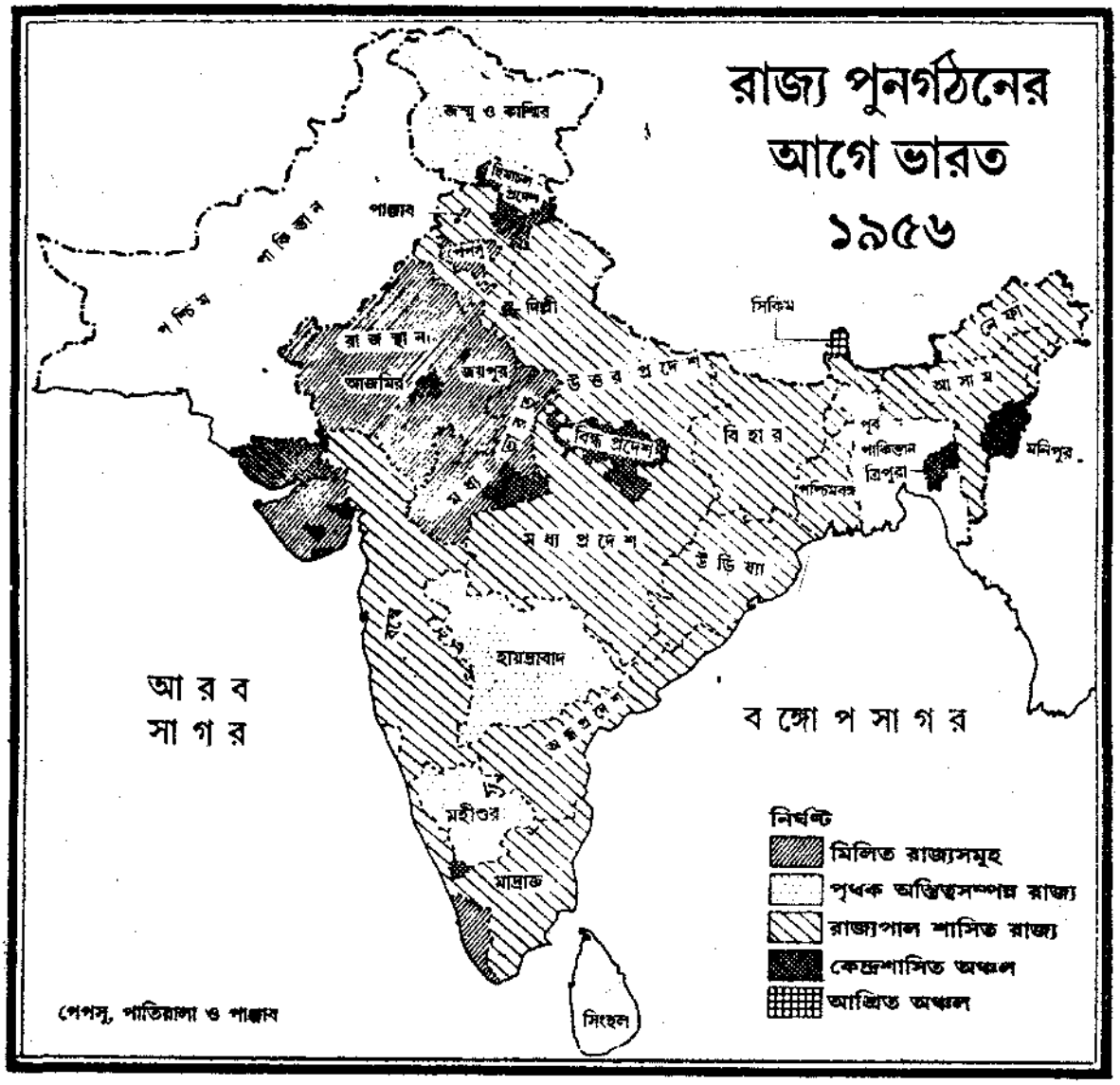

উত্তর-পূর্ব ভারতে অসংখ্য উপজাতি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়। এই সংগ্রামের ফলে ১৯৬২ সালে গঠিত হয় নাগাল্যান্ড, ১৯৮৬ সালে মিজোরাম, ১৯৭১ সালে ত্রিপুরা ও মেঘালয় এবং ১৯৮৬ সালে অরুণাচল প্রদেশ ও ১৯৭৫ সালে সিকিম রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৭০ সালে হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের স্বীকৃতি পায়।

কিছু কিছু ক্ষুদ্র এলাকা আছে যেগুলি ঐতিহাসিক কারণের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে এক হতে পারেনি। এইসব এলাকাকে বলা হয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। যেমন চন্ডীগড়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপসমূহ, পন্ডিচেরী, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ। এইসব কেন্দ্রশাসিত এলাকা কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে থাকে।

এভাবে বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ২৮টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে।

অনুশীলনী ১

১। কোন্ কোন্ বিষয় সংবিধান রচনাকালে গণপরিষদের সদস্যদের প্রভাবিত করেছিল?

.....

.....

.....

.....

.....

২। কীভাবে সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিষয়গুলি বন্টন করা হয়েছে?

.....

.....

.....

.....

.....

২৪.৪ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষের ২৪.২ অংশে উল্লিখিত সব বৈশিষ্ট্যগুলিই আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও কিছু ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কিছু নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়।

২৪.৪.১ কেন্দ্র ও রাজ্য

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ২৮টি রাজ্য নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি করে সরকার এবং সেই সরকারের একটি আইন বিভাগ, একটি শাসন বিভাগ ও একটি বিচার বিভাগ আছে। কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি জনগণের দ্বারা পৃথকভাবে নির্বাচিত এবং তাদের ক্ষমতার উৎস হ'ল সংবিধান। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে এবং নতুন রাজ্য সৃষ্টি করতে পারে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ওপর সংবিধানের প্রাধান্য বজায় থাকে। সংবিধানের যে অংশ কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত সেই অংশের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হ'লে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও অধিকাংশ রাজ্য বিধানসভার সম্মতি প্রয়োজন। সংবিধানের বাকি অংশের সংশোধন কেন্দ্রীয় আইনসভা এককভাবে করতে পারে।

২৪.৪.২ বিষয়ের বিভাজন বা বন্টন

সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় বন্টন করা হয়েছে। বিষয়গুলি তিনটি তালিকাভুক্ত। কেন্দ্রীয় তালিকায় আছে ৯৭টি বিষয় যা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে। রাজ্য তালিকায় আছে ৬৬টি বিষয় সেগুলির ওপর শুধুমাত্র রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে। এছাড়া রয়েছে ৪৭টি বিষয় সংবলিত যুগ্ম তালিকা। যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য প্রণীত আইনের

মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনই বহাল থাকে। এছাড়া যে-সব বিষয় কোনও তালিকাভুক্ত নয় তা কেন্দ্রের অধীনে থাকবে।

২৪.৪.৩ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

সংবিধানে আমরা এক সংযুক্ত বিচারব্যবস্থা দেখতে পাই, যা কেন্দ্র ও রাজ্য প্রণীত আইন ব্যাখ্যা করে। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সংবিধান যথেষ্ট সচেষ্ট। বিচারালয় সংবিধানের ব্যাখ্যা ও কেন্দ্র-রাজ্যের আইন সাংবিধানিক কিনা তা বিচার করে। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বাধলে তা মীমাংসা করে।

২৪.৪.৪ কেন্দ্রিকরণের প্রবণতা

আপনি দেখেছেন ২৪.২ বিভাগে উল্লেখিত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে আছে, আবার ২৪.৩.৩ অনুযায়ী ভারতে রয়েছে বিশেষ ধরণের কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা। ভারতের সংবিধানে কোথাও যুক্তরাষ্ট্র কথাটির উল্লেখ নেই। সংবিধানে ভারতকে বলা হয়েছে রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন। আমরা এখানে তার দু'টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

সংবিধানে সর্বভারতীয় কৃত্যকের উল্লেখ আছে – ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক, ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক, ভারতীয় অরণ্য কৃত্যক ইত্যাদি। এইসব পদের সদস্যদের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Union Public Service Commission)। আই এ এস (I A S)-এর সদস্যদের বিভিন্ন রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি তাদের বিভিন্ন কাজে বহাল করতে পারে। কারণ এই সমস্ত কাজ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে আর এ কারণেই এটি রাজ্যগুলির স্বাধিকারের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখে। এই ধারাটি ভারতীয় প্রশাসনের ও ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের একটি ঐতিহ্য বহন করে চলেছে; যেমনটি ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতীয় প্রশাসনকে ইস্পাত কাঠামো বলে ধরা হ'ত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, সংবিধানে বর্ণিত জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি। প্রথমত, যুদ্ধ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে এমন গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে যার ফলে ভারত বা তার কোনও অংশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে, তাহলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সমগ্র ভারত বা তার কোনও অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জরুরি অবস্থায় সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে বা রাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারে। এর ফলে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবধারাটি ক্ষুন্ন হয়।

কোনওভাবে রাষ্ট্রপতি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনও একটি রাজ্যে শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না, তখন তিনি সংবিধানের ৩৫৬নং ধারা অনুযায়ী সেই রাজ্যের আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন এবং মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিমন্ডলীকে খারিজ করতে পারেন। এই ধরনের ঘোষণা দুই মাসের মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে অনুমোদিত হ'লে তা প্রথমে ছয় মাস এবং সংসদ পুনরায় অনুমোদন করলে আরও ছয় মাস বলবৎ থাকবে। এভাবে অনধিক ৩ বৎসর এই জরুরী অবস্থা চালু রাখা যায়। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রায়শই ব্যবহার হ'তে দেখা যায়।

অনুশীলনী ২

১। যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২। সংবিধানের ৩৫৬নং ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২৪.৫ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি

শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের হয় না; তারজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যবস্থার। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হ'ল দলীয় ব্যবস্থা।

২৪.৫.১ দলীয় রাজনীতি ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

একটি দেশের দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি মূলগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অংশগুলির সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষে আমরা প্রভাবশালী এক-দলীয় ব্যবস্থা কার্যকরী দেখতে পাই। সামান্য কিছু সময় ছাড়া বেশি সময়ই কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে এক-দলীয় শাসন দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে দেখা যায় প্রাধান্য সৃষ্টিকারী দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপরই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নির্ভর করে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস দল একটানা কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে সরকার চালিয়েছে। তবে এর মধ্যে কেরালায় ২৯ মাসের জন্য অ-কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল। ১৯৪৭-৬৭, ১৯৭১-৭৭, ১৯৮০-৮৩ সময়ের মধ্যে আমরা কংগ্রেস দলের প্রাধান্য দেখতে পাই। ১৯৬৭, ১৯৭১ এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল ব্যতীত অন্য সময়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। পন্ডিত নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় রাজ্যস্তরের নেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১৯৬৪ সালে নেহরুর মৃত্যুর পর রাজ্যস্তরের নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। কংগ্রেসী মুখ্য-মন্ত্রীরা পন্ডিত নেহরু (১৯৬৪) এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর (১৯৬৬) উত্তরসূরী নির্বাচনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়তা করেন।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর থেকে ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত থাকে এবং কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন ভূমিকা পালন করতে থাকেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের বিকাশ। পঞ্চাশের দশকে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি আঞ্চলিকতাবাদকে প্রকট করে। রাজ্য পুনর্গঠনের পরেও সীমানা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। ষাটের দশকে দেখা যায় হিন্দি সম্প্রসারণ বিরোধী আন্দোলন এবং আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রকাশ। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল – তামিলনাড়ুর ডি এম কে, এ আই এ ডি এম কে, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগুদেশম, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, অসমে অসম গণপরিষদ, বিহারে ঝাড়খন্ড পার্টি, উত্তর-পূর্বে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল, অল পার্টি হিল লীডারস কাউন্সিল, গুর্খা ন্যাশনাল লিগ, কেরলে কেরল কংগ্রেস এবং পাঞ্জাবে অকালি দল। এদের মধ্যে কয়েকটি দল নিজেদের রাজ্যে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। এই আঞ্চলিক দলগুলি জনমত গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়। এটি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, যদি কেন্দ্রে ও কতকগুলি রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে তাহলে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। একটি রাজনৈতিক দল যেমন করে পারে অন্যদের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এটি একটি বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে। আমরা এই অসুবিধা আরও বিশদভাবে আলোচনা করব।

২৪.৫.২ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মতবিরোধের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেক বিষয় বা ঘটনা ঘটে যা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধিতার সম্ভাবনাকে প্রকট করে। এই বিরোধ শুধুমাত্র আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য নয়, এই বিরোধ সীমিত সম্পদের বন্টনকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে। মতবিরোধের কিছু উৎস :

১। ক্ষমতা ও দায়িত্ব সমানুপাতিক নয় : আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন বিষয়ের বন্টনের সময়ে কেন্দ্রীয় তালিকায় অধিক বিষয় রয়েছে। শুধু এটাই একমাত্র কারণ নয়, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে আরও অনেক বিষয় আছে। তুলনামূলকভাবে রাজ্যের রাজস্বের উৎসগুলি নির্দিষ্ট ও কর আদায়ের সামান্য ব্যবস্থা আছে। রাজ্য যে রাজস্ব সংগ্রহ করে তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। কিন্তু দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য রাজ্যের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, যেমন, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। রাজ্যগুলির নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য আরও বেশিমাত্রায় রাজস্বের প্রয়োজন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক সম্পদ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ঋণ করতে পারে। এই সবকিছুই রাজ্যগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন গঠন করতে পারেন। এই কমিশন কেন্দ্র-ও রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের কিছু যেমন, আয়কর, আবগারি কর ইত্যাদি বন্টন করে। এছাড়া অনুদানের জন্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন খরা, বন্যা প্রভৃতির সময় রাজ্যগুলি কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে।

২। পরিকল্পনার পদ্ধতি : ১৯৫০-৫১ সাল থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভারতবর্ষ পরিকল্পনার পথ অনুসরণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের মূল কাজ হ'ল দেশের সামগ্রিক সম্পদের বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি অর্থনৈতিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা পরিকল্পনা কমিশনের অংশ হিসেবে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য হন। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামতেরই অধিক গুরুত্ব থাকে। এই কারণে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে।

৩। **রাজ্যপাল :** বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালের অবস্থান থেকে দলীয় রাজনীতির অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। রাজ্যের রাজ্যপালগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কার্যত তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা যে দল কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে সেই দলেরই সমর্থক হন। তাই স্বাভাবিকভাবে রাজ্যপালের কাজকর্ম রাজ্যসরকারের পছন্দসই নাও হ'তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণ প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন – তাঁরা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য কোনও বিল পাঠাতে পারেন অথবা ৩৫৬ নং ধারা জারি করতে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করতে পারেন যা আমরা ২৪.৪.৪ বিভাগে দেখেছি।

২৪.৫.৩ সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র

যদিও কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ অধিক গুরুত্ব পায় তবুও ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সব ক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্পর্ক নয়। অনেক সময় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি একে অপরকে সহযোগিতা করে। প্রথমদিকে নেহরুর নেতৃত্বে যখন কংগ্রেস দল অধিকাংশ রাজ্যে সরকার গঠন করেছিল তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সহযোগিতার দায়িত্ব নিয়েছিল। অনেক কংগ্রেসী-মুখ্যমন্ত্রী তার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের প্রয়াস চলত। এই পদ্ধতি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ এমনই একটি সংস্থা যে-বিষয়ে পূর্ববর্তী বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে। মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বিভিন্ন সমস্যা, যেমন সাম্প্রদায়িক সমস্যা, খরা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলন বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন মন্ত্রী, সচিব, কমিশনার ইত্যাদি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়।

কিছু সংস্থা আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে, কিন্তু সেই সংস্থাগুলি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করতে সাহায্য করে। যেমন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলি কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতিগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

২৪.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রবণতা

পাঁচ দশক ধরে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকরী রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা কিছু প্রবণতা দেখতে পাই। এর মধ্যে অন্যতম হ'ল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। রাজ্য সরকারগুলি আরও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দাবি করে। তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকার বিচারপতি রাজামান্নার নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেছিল। এই কমিশন রাজ্যগুলিকে আরও ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট সরকার একই দাবি পেশ করে। পাঞ্জাবের অকালি দল আনন্দপুর সাহিবপ্রস্তাবে রাজ্যগুলির জন্য আরও ক্ষমতা দাবি করে। এই দাবিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার বিচারপতি সারকারিয়ার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কেন্দ্র-রাজ্যের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এই কমিশন আন্তঃরাজ্য পর্ষদ গঠন করার সুপারিশ করে। কিন্তু এই কমিশন অনেক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সুপারিশ করেনি।

ভারতের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিভিন্নতার কথা মনে রেখে আঞ্চলিক দাবিগুলি কিছু পরিমাণে মেনে নেওয়া যায়। এই কারণে আঞ্চলিক পর্ষদ, যেমন পশ্চিমবঙ্গে গোর্খা পার্বত্য পর্ষদ গঠন করা হয়েছে অথবা পঞ্চায়েতকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ভারতবর্ষে সব জায়গায় সমানভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি বা বিকাশ হয়নি। কিছু

রাজ্য, যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত। এই কারণে রাজ্যগুলিতে আরও সম্পদ বন্টনের প্রয়োজন আছে। আপনি একটি বিষয় লক্ষ করে থাকবেন, যে সব রাজ্য অন্যদের তুলনায় বেশি উন্নত তারাই রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দাবি করে।

অনুশীলনী ৩

১। একই দলের আধিপত্য কীভাবে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে?

.....

.....

.....

.....

.....

২। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের পদমর্যাদা কী?

.....

.....

.....

.....

.....

২৪.৭ সারাংশ

যুক্তরাষ্ট্র হ'ল একধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে দু-ধরনের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয় -- একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করে রাজ্য সরকার। সংবিধান দু-ধরনের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দেয় এবং বিচার বিভাগ মধ্যস্থতা করে।

দীর্ঘদিনের বিবর্তনের পথ চেয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তার রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইংরেজ রাজত্বে শুরু হয়ে এই প্রক্রিয়া ১৯৩৫ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছায়। স্বাধীনতার পর সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বীকার করলেও রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ও পুনর্গঠন চলতে থাকে।

সংবিধান দু-ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠা করে : কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। বিভিন্ন বিষয়গুলিকে সংবিধান দু-ধরনের সরকারের মধ্যে তিনটি তালিকার মাধ্যমে ভাগ করে দিয়েছে -- কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কোনও বিরোধের সৃষ্টি হলে তা সমাধান করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের। সংবিধানে অনেক কেন্দ্রিকরণের বৈশিষ্ট্য আছে, যার মধ্যে একটি হ'ল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

ভারতে প্রাধান্যকারী এক-দলীয় ব্যবস্থা এবং প্রাধান্যকারী দলের প্রকৃতি যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় রাজ্যগুলির জন্য স্বায়ত্তশাসনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক দলের উদ্ভব এবং তাদের জাতিগত ভিত্তি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধিতার সৃষ্টি করে। এই বিরোধিতা তীব্রতর হয় দুর্লভ

সম্পদের জন্য দাবি ও রাজ্যপালের পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে আবার আমরা অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা দেখতে পাই। সাধারণ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সমন্বয়কারী নীতি নির্ধারণ করে এবং রাজ্যগুলিও পারস্পরিক সহযোগিতা করে।

অধিক ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক দাবি আমাদের চোখে পড়ে। সারকারিয়া কমিশন বিভিন্ন সুপারিশ করেছে এই দাবি মেটানোর। কিন্তু যে দেশে অ-সম অর্থনৈতিক বিকাশ ও বিভিন্নতা রয়েছে সে দেশে কেন্দ্র-রাজ্য মতপার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আঞ্চলিক পর্ষদ অথবা পঞ্চায়েতকে আরও শক্তিশালী করা হ'লে এই পার্থক্য কিছু পরিমাণে কমানো যাবে।

২৪.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

আপনার উত্তরে নীচের বিষয়গুলি থাকবে :

১। ● বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা
- অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
- দেশীয় রাজ্যগুলির সংহতি সাধন
- সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

২। ● কেন্দ্রীয় তালিকা – ৯৭টি বিষয়
- রাজ্য তালিকা – ৬৬টি বিষয়
- যুগ্ম তালিকা – ৪৭টি বিষয়

যুগ্ম তালিকার বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রণীত আইনের মধ্যে বিরোধ বাধলে কেন্দ্রের আইনই বলবৎ থাকবে।

অনুশীলনী ২

আপনার উত্তরে নীচের বিষয়গুলি থাকবে :

১। ● যুক্তরাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য রাজ্যসমূহের অবিচ্ছেদ্য সমাহার।
- রাষ্ট্রসমবায়ে রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।
- যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে।
- রাষ্ট্রসমবায়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির ওপর নির্ভরশীল থাকে।

২। ● মন্ত্রিপরিষদকে অপসারণ করা যায়।
- রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া যায়।
- রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে সংসদ আইন প্রদান করতে পারে।

অনুশীলনী ৩

আপনার উত্তরে নীচের বিষয়গুলি থাকবে :

১। ● প্রভাবশালী দলের কাঠামোর প্রকৃতি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক প্রভাবিত করে।
- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অস্থিরতা (মতবিরোধ)।

২। ● কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারে।
- রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য কোনও বিল পাঠাতে পারে।
- ৩৫৬ নং ধারা জারি করার পরামর্শ দিতে পারে।

একক ২৫ ❑ ক্ষমতার হস্তান্তর

গঠন

২৫.০ উদ্দেশ্য

২৫.১ প্রস্তাবনা

২৫.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা

২৫.২.১ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

২৫.২.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ

২৫.৩ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

২৫.৩.১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীর মতামত

২৫.৩.২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণের মতামত

২৫.৪ ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

২৫.৪.১ বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি

২৫.৪.২ অশোক মেহতা কমিটি

২৫.৫ বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা

২৫.৬ পঞ্চায়েতীরাজের মূল্যায়ন

২৫.৭ সারাংশ

২৫.৮ অনুশীলনী

২৫.০ উদ্দেশ্য

এই বিভাগে ক্ষমতার হস্তান্তর ও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অংশে ভারতের বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা, তার গুরুত্ব ও দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিভাগটি পড়ার পর আপনি :

- ক্ষমতা হস্তান্তর কাকে বলে বোঝাতে পারবেন
- ভারতে বর্তমান গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন ও
- ভারতের পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার বর্ণনা ও মূল্যায়ন করতে পারবেন।

২৫.১ প্রস্তাবনা

হস্তান্তর বলতে বোঝায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উর্ধ্বতন সরকারের ক্ষমতা অর্পণ, উর্ধ্বতন সরকার থেকে অন্যান্য সংগঠনে ক্ষমতা হস্তান্তর।

এই বিভাগে ক্ষমতার হস্তান্তর ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল তৃণমূল পর্যায় অর্থাৎ গ্রামগুলি। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের নীতি ছিল গ্রামীণ সম্পদকে নিঃসরণ করা। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করে, একই সালে রয়াল কমিশন বিকেন্দ্রীকরণের রিপোর্ট জমা দেয়, কিন্তু

তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ১৯২২ সালে কংগ্রেস ভারত সরকারের কাছে স্থানীয় সংস্থাগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি করার দাবি জানায়। গোপালকৃষ্ণ গোখেল, অ্যানি বেসান্ত, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্যরা গ্রামকে ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার একক হিসেবে গণ্য করার কথা বলেন। গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সংগঠন হিসেবে অনেক বেশি ব্যাপকতা লাভ করে। ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ স্বাধীনতার পরেও সমান গুরুত্ব লাভ করে।

২৫.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি বুঝতে হ'লে আমাদের 'গণতান্ত্রিক' ও 'বিকেন্দ্রীকরণ' এই দু'টি শব্দের অর্থ জানতে হবে। 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি ধারণাটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে এবং সেই সঙ্গে এর প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূল দাবিকেও তুলে ধরে। 'বিকেন্দ্রীকরণ' শব্দটি 'গণতান্ত্রিকে'র লক্ষ্যে পৌঁছনোর পদ্ধতিকে বোঝায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। এই ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতার ওপর জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বর্তমান থাকে এবং সরকারের ক্ষমতার উৎস হ'ল জনগণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে বর্তমানে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে বোঝায়। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীকরণ বলতে ক্ষমতার আঞ্চলিক বন্টনকে বোঝায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সামাজিক ঐক্য, গণচেতনা ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের সহায়ক বলে মনে করা হয়।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে ক্ষমতার অর্পন (delegation) মনে করা ঠিক নয়। ক্ষমতা অর্পন (delegation) বলতে বোঝায় : যে কোনও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনও অধস্তন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে কিন্তু অধস্তন কর্তৃপক্ষ সেই ক্ষমতা অধিকার হিসেবে উপভোগ করে না বরং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সন্তোষ অনুযায়ী ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধস্তন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান, কিন্তু সেই ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে উপভোগ করার অধিকার পায়। গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও বিস্তৃত করে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা, যার ফলে জনগণ আরও ব্যাপকভাবে ক্ষমতা উপভোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে।

২৫.২.১ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পার্থক্য আছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সম্পর্ক বা যোগাযোগকে বোঝায়। অন্যদিকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি এসেছে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের কাজের ব্যাপারে তৎপরতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা থেকে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ হ'ল পরিকল্পনা রূপায়ণের অধিকার, যার সাহায্যে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণে জনসাধারণ নিজেদের মঙ্গলার্থে কোনও প্রকল্প আরম্ভ করতে পারে স্বাধীনভাবে। তাই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের থেকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ অনেক বেশি ব্যাপকতর বিষয়।

২৫.২.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতারও পার্থক্য আছে, যা হল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সরকার ও রাজনৈতিক দলের মূল সংগঠনগত নীতি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা 'গণতন্ত্রের' সঙ্গে কেন্দ্রীকতার মিশ্রণ

ঘটাতে চায়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার প্রকৃতি হ'ল কেন্দ্রাভিগ, যার ফলে ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে মেশে।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃতি হ'ল কেন্দ্রাতিগ, যেখানে উচ্চস্তর থেকে ক্ষমতা নিম্নস্তরে হস্তান্তরিত হয়। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার চেয়ে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণে গণতান্ত্রিক নীতিগুলির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নিম্নস্তরের প্রতিনিধিমূলক সংগঠনগুলিকে আরও ক্ষমতা প্রদান করে গণতন্ত্রের পরিসর আরও বিস্তৃত করে। এখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়।

২৫.৩ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা দু'টি সমার্থক ধারণা নয়। যদিও দু'টি ধারণাই জনগণকে আরও বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে তবুও বলা যেতে পারে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ হ'ল একটি রাজনৈতিক আদর্শ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা হ'ল এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে আরও গণতান্ত্রিক করতে, জনগণকে আরও ক্ষমতা প্রদান করতে ও দায়িত্ব অর্পণ করতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন।

২৫.৩.১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা

গান্ধীজির ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ বিকাশ সর্বপ্রথম জন-সমর্থন পেতে শুরু করে। তাঁর গ্রামীণ উন্নতির ইচ্ছা থেকে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি এসেছে। গান্ধীজি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, সর্বস্তরে নেতৃত্ব, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে সরকারের একক হল গ্রাম; গ্রামকে ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা বন্টন করতে হবে এবং প্রতিটি স্তরে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থাকবে। প্রতিটি স্তর গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণে স্বনির্ভর হবে এবং একই সঙ্গে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হবে। তাঁর মতে, উন্নতি বলতে বোঝায় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জনগণের সামগ্রিক অংশগ্রহণ। স্বাধীনতার পরিবেশ ছাড়া কোনও মানুষেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। এই পরিবেশ বিপদগ্রস্ত হয় যখন সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে।

২৫.৩.২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য

গান্ধীজীর মতো জয়প্রকাশ নারায়ণও মনে করতেন যে, স্থানীয় বিকাশ ও প্রশাসনের জন্য গ্রামগুলিকে আরও শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী করতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক হিসেবে তাঁরা দুজনেই গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতে, পঞ্চায়েতীরাজ সর্বোদয় দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটা সমাজকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে পারে। তাঁর সর্বোদয় দর্শন মহাত্মা গান্ধী ও বিনোবা ভাবের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সর্বোদয় দর্শন 'অংশগ্রহনকারী গণতন্ত্রের' (participating democracy) তত্ত্ব প্রচার করে, যার ভিত্তি হ'ল আত্মনির্ভরশীলতা। জয়প্রকাশ মনে করতেন, সর্বোদয় দর্শনে পঞ্চায়েতীরাজ হ'ল এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি মনে করতেন, এটি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার একক নয়, বরং এই নীতির মাধ্যমে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন করা যাবে এবং সেই সমাজ হবে সাম্যভিত্তিক। তিনি পঞ্চায়েতীরাজকে এক নতুন সমাজব্যবস্থার অগ্রদূত বলে মনে করতেন, যা পুরনো শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটাবে।

২৫.৪ ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা পঞ্চায়েতীরাজ নামে পরিচিত। ১৯৫৯ সালে এটির সূচনা হয়, আমাদের দেশে যা ছিল গণতন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণের এক পরীক্ষা। আশা করা হয়েছিল, এই ব্যবস্থা গ্রামীণ মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উদ্যোগ গ্রহণ ও আর্থিক সম্পদ দিয়ে তাদের মনোজগতে এক বিপ্লব ঘটাবে। এ ছাড়াও পঞ্চায়েতীরাজ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের স্বেচ্ছা অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের উন্নতি করতে পারবে বলে মনে করা হয়েছিল। গ্রামীণ জনগণ, যারা এতদিন তাদের অধিকার, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত ছিল, আশা করা গিয়েছিল পঞ্চায়েতীরাজ তাদের সেই অধিকার ও ন্যায়বিচারের স্বাদ এনে দেবে।

জনসমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম যা ১৯৫২ সালে শুরু হয়েছিল, পঞ্চায়েতীরাজ তার সঙ্গে মিলিত হয়। পঞ্চায়েতীরাজের দু'টি মূল উদ্দেশ্য ছিল – (১) জনসমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও বেশি জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের সহায়ক করে তোলা, (২) বিকাশের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গ্রামগুলিকে অর্পণ করা। পঞ্চায়েতীরাজের তিনটি স্তর আছে: গ্রামস্তরে গ্রামপঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাস্তরে জেলা পরিষদ।

২৫.৪.১ বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি

১৯৫৭ সালে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি জনসমাজ-উন্নয়ন কার্যক্রম ও জাতীয় প্রসারণ পরিষেবার জন্য বলবন্ত রায় মেহতার নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক দল গঠন করে। পর্যবেক্ষক দলের প্রধান কাজ হ'ল জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ স্থানীয় উদ্যোগকে কাজে লাগাতে ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে কতটা সফল তা বিশ্লেষণ করা।

১। কমিটি পঞ্চায়েতীরাজের জন্য ত্রি-স্তর বিশিষ্ট কাঠামোর কথা সুপারিশ করে : গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। ব্লককে পরিকল্পনা ও বিকাশের একক হিসেবে গণ্য করা হয়। জেলাস্তরে জেলা পর্ষদের পরিবর্তে জেলা পরিষদ গঠন করা হবে যার মূল কাজ হবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।

২। পর্যবেক্ষক দল সরকারি সংস্থা থেকে নির্বাচিত জনসংস্থাগুলিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপারিশ করে : ক্ষমতা থাকবে গ্রাম থেকে জেলা পর্যন্ত। পর্যবেক্ষক দলের মতে নির্বাচিত সংস্থার তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ।

৩। বিধিবদ্ধ নির্বাচিত সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ ও ক্ষমতা অর্পণ করা।

৪। জেলাকে উপদেষ্টার ভূমিকায় রেখে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল একক ব্লক স্তরে স্থাপন করা উচিত।

৫। এই রিপোর্ট প্রতিটি স্তরের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

১৯৫৯ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রীয় পর্ষদ উপলব্ধি করে যে, বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিভিন্নভাবে গণ-তান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। এই কারণে বিভিন্ন রাজ্য তাদের প্রয়োজনমত বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ করে। এর ফলে নানা ধরনের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, যা দু'টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায় :

১। বি আর মেহতা কমিটি অনুযায়ী রাজস্থানের নমুনা, যাতে আছে একটি শক্তিশালী পঞ্চায়েত সমিতি ও পরামর্শদানকারী জেলা পরিষদ।

২। নায়েক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গঠিত মহারাষ্ট্রের নমুনা, যাতে আছে একটি শক্তিশালী জেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে কার্যনির্বাহী পঞ্চায়েত সমিতি।

২৫.৪.২ অশোক মেহতা কমিটি

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম অনুসন্ধান ও তাদের আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয় অশোক মেহতা কমিটি নিযুক্ত করে। ১৯৭৮ সালে এই কমিটি তার প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার সুপারিশগুলি হ'ল নিম্নরূপ :

১। রাজ্যস্তরের নীচে জেলাগুলি থেকে বিকেন্দ্রীকরণের সূত্রপাত হবে।

২। পঞ্চায়েতীরাজ হবে দু'টি স্তরে – (১) জেলা স্তরে হবে জেলা পরিষদ ও (২) মন্ডল পঞ্চায়েত। কিছু সময়ের জন্য ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম স্তরে পঞ্চায়েত কাজ চালাবে। এই কমিটি ব্লক স্তরের সমিতিগুলিকে জেলা পরিষদের বিধিবহির্ভূত প্রশাসনিক কমিটি হিসেবে রূপান্তর করার পক্ষে ছিল এবং মন্ডল পঞ্চায়েত গঠিত ও কার্যকরী হয়ে উঠলে তখন এদের অধিকাংশ কাজ করবে মণ্ডল পঞ্চায়েত।

৩। জেলা পরিষদ ছয় প্রকার সদস্য নিয়ে গঠিত হবে – নির্দিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (যতক্ষণ পঞ্চায়েত সমিতি থাকবে), পৌরসভার মনোনীত সদস্য, জেলা যুক্তরাষ্ট্র সমবায়ের সদস্য, দুজন মহিলা সদস্য, জেলা-পরিষদের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত দুজন সদসার মধ্যে একজন গ্রামীণ বিকাশে উৎসাহী ব্যক্তি ও অন্যজন স্থানীয় শিক্ষক। জনসংখ্যার ভিত্তিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন।

৪। ১৫,০০০-২০,০০০ জনসংখ্যার জন্য একটি মন্ডল পঞ্চায়েত থাকবে। ১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট মন্ডল পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রামীণ জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয় – কৃষক, দুজন মহিলা, তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে সভাপতি নির্বাচন করেন।

৫। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি অংশগ্রহণ করতে পারে। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই স্থানীয় স্তরে এদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে যায়।

৬। পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সরকার এই নির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে পারে না। এই নির্বাচন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

৭। জেলাস্তর থেকে পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক দিক, পুঁজি বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখা হয়।

৮। রাজ্য সরকার দলীয় কারণে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করতে পারে না। যদি কখনও এমন করার প্রয়োজন হয় তাহলে ছ-মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে।

অশোক মেহতা কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। লক্ষাধিক জনগণ ও সহস্রাধিক দরিদ্র মানুষের উন্নতি সাধনে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সঙ্গে প্রয়োজন সাধারণের ইচ্ছা ও দাবি পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ। এইভাবে অশোক মেহতা কমিটি পঞ্চায়েতীরাজ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছে।

২৫.৫ বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা

জনসমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্যের শর্তগুলি কী হবে সে সম্পর্কে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে দু'টি সমাধান পাওয়া যায় – (ক) জেলা প্রশাসনকে সংস্কার করা ও (খ) বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অধিকাংশ পরিকল্পনা রাজ্যস্তরে গ্রহণ করেছিল রাজ্য সচিবালয়। সেই কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় গ্রামস্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ে পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য জেলাস্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বিকেন্দ্রীকরণ করে নি। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, দু'টি রাজ্য – মহারাষ্ট্র ও গুজরাট - অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র, কারণ এই রাজ্য দু'টি জেলাস্তরে পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে ব্যাঙ্কগুলি জেলাস্তরে ঋণ সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জনসমাজ উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামস্তরে পরিকল্পনা প্রয়োজন, কিন্তু গত তিন দশকে সরকারি তত্ত্বাবধানে গ্রামস্তরে কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এই সমস্যা পঞ্চায়েতীরাজকে দুর্বল করেছে, কারণ নিম্নস্তর থেকে পরিকল্পনার প্রয়াস পঞ্চায়েতীরাজের ভিত্তিস্বরূপ।

অনুশীলনী ১

(ক) নীচের খালি অংশে উত্তর লিখুন।

(খ) বিভাগের পিছনে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

১। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কী বোঝায়?

২। বলবন্ত রায় মেহতার গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি কী কী তা আলোচনা করুন।

৩। অশোক মেহতা কমিটির মূল সুপারিশগুলি কী কী?

২৫.৬ পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার মূল্যায়ন

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পঞ্চায়েতীরাজের সাবলীল ও সুদক্ষ কার্যসম্পাদনকে প্রভাবিত করে।

১। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে যে-সকল নিয়মাবলী প্রণীত হয় তার দ্বারা পঞ্চায়েতীরাজের ক্ষমতার ওপর অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।

২। কোনও সংগঠনের গুণ নির্ভর করে তার নেতাদের ওপর। কোনও কোনও পঞ্চায়েতে একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিরোধী নেতৃত্ব আছে আবার অনেক ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব বিরোধমূলক। কিন্তু অধিকাংশ সংগঠনেই একাধিক নেতৃত্ব থাকে যা কিন্তু বিরোধমূলক নয়। অর্থাৎ, সেখানে একের অধিক নেতা থাকে যারা একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

৩। গ্রামীণ সমাজে সাধারণের কল্যাণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পঞ্চায়েতীরাজ সংগঠন এই সমস্যার সমাধানে সফল হয়েছে।

৪। জনসমাজ উন্নয়ন প্রকল্প ও পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল স্বনির্ভর গ্রামীণ জনসমাজ গঠন করা। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামবাসীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তারা এই বিষয়ে খুব একটা আগ্রহী নয়।

৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটু বেশিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। সরকার বিভিন্ন কমিটির অনুমোদন সত্ত্বেও পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণে অনাগ্রহী।

৬। ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের সাহায্য লাভ থেকে বঞ্চিত।

৭। অনেক সময় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন সময়মত হয় না, অনির্দিষ্ট কালের জন্য তা স্থগিত রাখা হয়।

কিন্তু ভারতের মতো বিশাল উপমহাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের একক হিসেবে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানের কোনও বিকল্প নেই। এই পঞ্চায়েতীরাজ এক নতুন ধরনের বিকল্পকেন্দ্রিক নেতৃত্ব গঠনে সক্ষম হয়েছে এবং জনসাধারণ ও প্রশাসন এর মাধ্যমে একে অন্যের সন্নিকটে এসেছে।

অনুশীলনী ২

(ক) খালি জায়গায় উত্তর লিখুন।

(খ) বিভাগের শেষে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

(১) পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির বর্ণনা ও মূল্যায়ন করুন।

২৫.৭ সারাংশ

গণতন্ত্র বাস্তবে কার্যকরী হয় কেবলমাত্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হ'লে। যখন সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ওপর থেকে সমগ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাকে গণতন্ত্র বলা যায় না। ভারতে স্বাধীনতার আগে থেকেই গ্রামীণ বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। গান্ধীজীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করে। ভারতে গণ-তান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পঞ্চায়েতীরাজ হিসেবে পরিচিত। এই পঞ্চায়েতী রাজের সঙ্গে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প সংযুক্ত রয়েছে। বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি ও অশোক মেহতা কমিটি জেলাস্তরের গুরুত্বের কথা বলেছে। প্রথম কমিটি ত্রি-স্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার কথা বলেছে, আর দ্বিতীয় কমিটি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থার কথা বলেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ, অনধিক ক্ষমতা ও সম্পদ ইত্যাদি এই ব্যবস্থার সাফল্যের পথে অন্তরায়। এই সমস্যাগুলির সমাধান হ'লে গণতন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। ১৯৫৯ সালের মধ্যে প্রত্যেকটি রাজ্যে শুধু পঞ্চায়েত আইন প্রণীত হয়নি, দেশের অধিকাংশ এলাকাতে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল।

২৫.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। ২৫.২ বিভাগ দেখুন।

২। ২৫.৫.১ বিভাগ দেখুন।

৩। ২৫.৫.২ বিভাগ দেখুন।

অনুশীলনী ২

২৫.৪ ও ১৫.৬ বিভাগ দেখুন।

একক ২৬ ❑ গণতন্ত্র ও ভারতের অনগ্রসর শ্রেণী

গঠন

২৬.০ উদ্দেশ্য
২৬.১ প্রস্তাবনা
২৬.২ কারা অনগ্রসর শ্রেণী?
২৬.২.১ তফসিলী জাতি
২৬.২.২ তফসিলী উপজাতি
২৬.৩ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী
২৬.৪ উন্নতি সাধনের বিভিন্ন ব্যবস্থা
২৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের প্রাধিকারমূলক নীতি
২৬.৪.২ সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি
২৬.৪.৩ সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি
২৬.৫ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত
২৬.৬ গণতন্ত্র ও অনগ্রসর শ্রেণী
২৬.৭ দুর্বল শ্রেণী সংক্রান্ত নীতি – একটি মূল্যায়ন
২৬.৮ সারাংশ
২৬.৯ উত্তরমালা

২৬.০ উদ্দেশ্য

ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। এই কারণে ভারতীয় সমাজের মূল ধারার সঙ্গে অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য ওইসব শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে এই উদ্দেশ্যে যে প্রয়াস চালানো হয়েছে এই এককটি আপনাকে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দেবে।

এই একক পাঠ করলে আপনি –

- ভারতের অনগ্রসর শ্রেণী ও তাদের সমস্যা অনুধাবন করতে পারবেন।
- অনগ্রসর শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবেন এবং
- সরকারী নীতির সাফল্যের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

২৬.১ প্রস্তাবনা

সারা পৃথিবীতে অনগ্রসর শ্রেণী যে প্রভেদ ও বঞ্চনা ভোগ করে তার বিরুদ্ধে তারা সংগঠিত লড়াই চালিয়ে যায়।

তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার আইনত অংশ পাওয়ার জন্য আন্দোলন করে। এই কারণগুলি সমাজে সুস্পষ্টভাবে সামাজিক ও সংগঠনগত পরিবর্তন এনে দেয়।

২৬.২ কারা অনগ্রসর শ্রেণী?

রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংবিধানে কিছু সংখ্যক জাতি ও উপজাতিকে তালিকাভুক্ত করেছেন। সেই কারণে তফসিলী জাতি ও উপজাতি কথাটি ব্যবহার করা হয়। অনগ্রসর শ্রেণী বা দুর্বল শ্রেণী হ'ল একটি সাধারণ শব্দ। ভারত সরকার এদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরা হ'ল তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী যারা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের কিছু বেশী ছিল। ভারতীয় সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বহুদিন ধরে বঞ্চিত জনসংখ্যাকে বোঝাতে আজকাল তালিকাভুক্ত জাতি ও উপজাতি কথাগুলি ব্যবহার করা হয়।

অনগ্রসর শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আন্দ্রে বেতে বলেছেন, "প্রত্যেকটি জটিল সমাজে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি থাকে যারা শিক্ষাগত বা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর এবং সাধারণত তারাই সমাজে নিম্ন-সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অনগ্রসরতার কয়েকটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য বলতে শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়, জন্মগতভাবে কতকগুলি সামাজিক অংশের মানুষকেও বোঝায়। তাই, উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্তরাও অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর শ্রেণীর সদস্যরা সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়।" উপরি-উক্ত শ্রেণীভুক্ত জাতি ও গোষ্ঠীরা তিনটি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে – শিক্ষা সংক্রান্ত, সরকারি চাকরি সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ পায়, বই কেনার জন্য বৃত্তি পায়, ছাত্রাবাসে এদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে, স্কুল-কলেজ-কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা এদের জন্য শিথিল করা হয়। এরা উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির সুযোগ পায়। সরকারি চাকরির সকল স্তরে এদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। চাকরিতে পদোন্নতির শর্তগুলিকেও এদের ক্ষেত্রে উদার করা হয়। অনুরূপভাবে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে এদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী শুধুমাত্র শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য, তারা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পায় না। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বলতে শুধুমাত্র কয়েকটি জাতিকে বোঝাত। এরপর ভারত সরকার প্রতিটি রাজ্যকে আয়ের ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণীর মর্যাদা নির্দিষ্ট করতে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশটিকে বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে, ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

অতএব, ভারতের সংবিধানে সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নেই এবং এগুলিকে কার্যকরী করার নীতি হিসেবে সামাজিক কোনও প্রস্তুতির কথাও বলা নেই। অনগ্রসরদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামান্য কিছু পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধান তিন ধরনের বিশেষ গোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধার কথা বলেছে –

(১) তফসিলী জাতি বা পূর্বতন অস্পৃশ্য জনসমাজ।

(২) তফসিলী উপজাতি এবং

(৩) সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী।

ভারতের সংবিধান এই শ্রেণীগুলির সংজ্ঞা দেয়নি বা এগুলিকে নির্দিষ্ট করার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা

বলেনি।

তফশিলী জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে সংবিধান নামকরণের বিশেষ পদ্ধতি প্রদর্শন করেছে। অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে সংবিধান শুধু যে সংজ্ঞা দেয়নি তাই নয়, কর্তৃত্ব নির্ধারণের পদ্ধতির কথাও বলেনি।

তফসিলী জাতি ও উপজাতি হ'ল সেইসব জনসমষ্টি যারা আদরণীয় ব্যবহার পায়। বস্তুত, তারা সর্বদাই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

তফসিলী জাতি ও উপজাতি সেইসব জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত যারা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রান্তিক স্তরে অবস্থান করে। অথবা, এইসব গোষ্ঠীগুলি তাদের স্থানিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত্বের জন্য কতকগুলি বিষয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং সুযোগ-সুবিধা পায় না। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে প্রথম নির্দেশমানা জারি করবেন এবং সংসদের আইন দ্বারা সে বিষয়ে কিছু সংশোধন ঘটতে পারে। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করবেন এবং তিনি তাঁর রিপোর্ট সংসদে প্রকাশ করবেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৯৫০ সালে শুধু সমন্বয়সাধন ও প্রতিবেদনের জন্য, কিন্তু কোনও প্রশাসনিক কার্যাবলীর অবকাশ না রেখে, তফসিলী জাতি ও উপজাতির কমিশনারের দপ্তর গড়ে ওঠে।

সমাজে তপসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত লোকেরা জাতিগত উত্তরাধিকার সূত্রে সর্বনিম্ন পদমর্যাদার অধিকারী; তবে এদের মধ্যেও আবার সামাজিক স্তর-বিভাজন ও পদমর্যাদার বিভাজন আছে। এরা বেশিরভাগই ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুর এবং কায়িক শ্রমেই নিযুক্ত।

২৬.২.১ তফসিলী জাতি

তফসিলী জাতি বলতে সেসব সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যদের বোঝায় যারা হিন্দু বর্ণাশ্রমের সবচেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থিত। তার ফলে এরা নানা ধরনের শোষণের শিকার হয়েছিল। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অনগ্রসর শ্রেণী বিকাশের জন্য সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। ১৯০১ সালের পর থেকে হিন্দু আধিপত্য সামাজিক সংস্কারকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যায়।

১৯০৮ সালের পর বিভিন্ন লেখক মনে করন যে, অস্পৃশ্যরা সংখ্যায় ৫ কোটি বা তার বেশি – ১৯১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ অথবা সমগ্র জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ হল অস্পৃশ্য। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই নিম্নশ্রেণীদের সরকারিভাবে নিম্নস্তরে অবস্থিত হওয়ার কোনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু ১৯৩৬ সালে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার বিধিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তফসিলী জাতিদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী অস্পৃশ্যদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভা তফসিলী জাতি সংক্রান্ত একটি আদেশ প্রদান করে যা মূলত ১৯৩৬ এর তালিকার সমতুল্য। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী তফসিলী জাতির জনসংখ্যা ৫ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ কোটিতে।

তফসিলী জাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভিত্তি হল জাত। একটি জাতি একটি রাজ্যে তফসিলীভুক্ত হ'তে পারে আবার অন্য প্রতিবেশী রাজ্যে তা নাও হ'তে পারে।

তফসিলী জাতির জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশই দরিদ্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তফসিলী জাতির ৫২ শতাংশ হ'ল ভূমির সঙ্গে জড়িত শ্রমিক, ২৮ শতাংশ হল কৃষক (মূলত ক্ষুদ্র চাষী)। পশ্চিম অঞ্চলে অধিকাংশ তাঁতী তফসিলী

জাতির অন্তর্ভুক্ত আর পূর্বাঞ্চলে সব মৎস্যজীবীরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই জাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু এই জনসমষ্টির অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে।

২৬.২.২ তফসিলী উপজাতি

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীকে চিহ্নিতকররণের তুলনায় তফসিলী উপজাতির চিহ্নিতকরণ অনেক সহজ। উপজাতি চরিত্র সংবলিত দলগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপজাতিরা সাধারণত জঙ্গল, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। এরা বন্যজাতি, বনবাসী, পাহাড়ী, জনজাতি, অনুসূচিত জনজাতি হিসেবে পরিচিত। এইগুলির মধ্যে তফসিলী উপজাতিরা আদিবাসী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সংবিধানে এদের 'অনুসূচিত জনজাতি' বা তফসিলী উপজাতি বলা হয়।

আধুনিককালেও এই উপজাতিরা নিজেদের আচার-ব্যবহার পালন করে এবং নিজেদের গন্ডির মধ্যে বিবাহ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে উপজাতিরা একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করে।

কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য ছাড়া উপজাতিদের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে অন্যান্য গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের তেমন কোনও পার্থক্য নেই। এই উপজাতিরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম এবং তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর বলে এদের তফসিলী উপজাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৫ সালের আইনে প্রথম অনগ্রসর উপজাতিদের প্রতিনিধিত্বের কথা ভাবা হয়। ১৯৩৬ সালে পাঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া অন্যান্য জায়গার উপজাতিদের একটি তালিকা করা হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ২ কোটি.৫৪ লক্ষ উপজাতিভুক্ত লোক ছিল।

সারা দেশে তফসিলী উপজাতি চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি একই। এই চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতি ১৯৩৫ সালের উপজাতি তালিকার সামান্য পরিবর্তন করেন। উপজাতিরা অধিকাংশ মধ্য, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাস করে। উপজাতিরা তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উপজাতিদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি ওঠে। কিন্তু এই শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অভাবের ফলে সরকারি চাকরি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও লাভ হয় না। তাই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হয়।

অনুশীলনী ১

১। সংবিধানে তফসিলী জাতিকে কীভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা আলোচনা করুন।

২। তফসিলী উপজাতিদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২৬.৩ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী যারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাদের চিহ্নিতকরণের কোনও সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেই। অনগ্রসর শ্রেণী এই শব্দটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্য পৃথকভাবে অনগ্রসরতাকে ব্যাখ্যা করে।

অনগ্রসর শ্রেণীর প্রথম একটি ব্যবহারিক অর্থ পাওয়া যায় মহীশূরের একটি দেশীয় রাজ্যে। ১৯১৮ সালে মহীশূরের সরকার অনগ্রসর শ্রেণীর সরকারি কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহদানে একটি কমিটি গঠন করে। ১৯২১ সাল থেকে এই সম্প্রদায়ের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং তাদের চিহ্নিত করা হয় এইভাবে যে "ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সকলে, যারা পর্যাপ্ত সরকারি কাজে অংশ নিতে পারেনি।"

কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে অনগ্রসর শ্রেণীর কোনও যাথার্থ্য নির্ণয় করা হয়নি। এই শ্রেণীর কোনও সর্বভারতীয় সংগঠন নেই। কিন্তু সংবিধানে কার্যকরী হওয়ার পরবর্তীকালে অনগ্রসর শ্রেণীর সংগঠন গড়ে ওঠে এবং একটি জাতীয় সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬১ সালের মে মাসে ক্যাবিনেট স্থির করে যে জাতের পরিবর্তে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসরতাকে চিহ্নিত করা হবে। মে মাসের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে জাতীয় সংহতি রক্ষার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নির্ধারিত অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তিকে সমর্থন করা হয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনতা মোর্চার জয় জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণীর বিষয়টি আবার নিয়ে আসে।

ভারতে অনগ্রসর শ্রেণী সংসদীয় গণতন্ত্রে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের পথকে সুগম করতে সাহায্য করে।

২৬.৪ উন্নতিকারক পদ্ধতিসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান রাজ্যগুলিকে জনকল্যাণ, বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণের নীতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়। তফসিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এর থেকে লাভবান হয়।

২৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণমূলক নীতি

নানা ধরনের সংরক্ষণ, যেমন – সরকারি চাকরিতে, আইনসভাগুলিতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা বলা হয়। সংরক্ষণ নীতি পরিবেষ্টন করে যে-সব বিষয় তা হ'ল :

১। রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

২। সরকারি চাকরি

৩। শিক্ষা

৪। অর্থনৈতিক উন্নতি

তাই সম্পূর্ণভাবে আমরা তিনটি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখতে পাই – আইনসভা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে। প্রথমটি সংবিধানে আছে, দ্বিতীয়টি সংসদ তৈরি করেছে এবং তৃতীয়টি তৈরি করেছে প্রশাসনিক সংস্থা। এই সংরক্ষণগুলি প্রথম দিকে ১০ বছরের জন্য কার্যকরী করা হয়েছিল। পরে এর মেয়াদ বাড়ানো হয় ১৯৭০ সাল পর্যন্ত, তারপর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এবং তারপর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়। আরও দশ বছরের জন্য এই সংরক্ষণের মেয়াদ সম্প্রসারিত হয়েছে।

এই সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি রয়েছে। কিন্তু, কিছু কিছু ক্ষেত্র থেকে এই সংরক্ষণের বিরোধিতা করা হয়। যেমন – বিহার ও গুজরাটে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

২৬.৪.২ সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি

সংরক্ষণের পক্ষে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দেখানো হয় সেগুলি হ'ল :

১। বহুযুগ ধরে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের শুধু নীচু জাতি বলে ঘৃণা করা হয়নি, তাদের সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। এই অসাম্য দূর করতে সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২। শত শত বছরের বঞ্চনার ফলে সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্গে তফসিলী জাতি ও উপজাতির যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য এই শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। অন্যথায় তারা সমাজের অগ্রগতির মূলধারার সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবে না।

৩। মহাত্মা গান্ধী, বি আর আম্বেদকর প্রমুখের প্রয়াস সত্ত্বেও অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। এক্ষেত্রে, বিহারে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাই তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য উচ্চশ্রেণীদের সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে।

৪। মনে করা হয়, শিক্ষা সমতা আনতে সক্ষম। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য ভর্তি সংক্রান্ত আসন-সংরক্ষণ সমর্থনযোগ্য।

৫। সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।

২৫.৪.৩ সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি

সংরক্ষণের পক্ষে যেমন যুক্তি আছে, এর বিপক্ষেও তেমন কিছু যুক্তি আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হ'ল :

১। সংরক্ষণের ফলে তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তারা এই সুবিধাগুলি অনন্তকাল ভোগ করবে। তাদের এই মানসিকতা শুভ ইঙ্গিত বহন করে না এবং তাদের অলস করে দেয়।

২। সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অনগ্রসর শ্রেণীরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা

যেতে পারে, হরিজনরা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য নির্বাচন ও দলীয় ব্যবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে।

৩। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নৈপুণ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ ক্ষতিকারক হ'তে পারে। যোগ্যতাই নিয়োগের মাপকাঠি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। যদি সংরক্ষণ শুধুমাত্র জাতের ভিত্তিতে হয় তাহলে তা জাতপ্রথাকে সমর্থন করে। কিন্তু সংবিধান জাতের ভিত্তিতে বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করে। অনগ্রসর অথবা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীকে প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত দিক থেকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করার পর চাকরির সময় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া অনুচিত। চাকরির সংরক্ষণের পরিবর্তে সুযোগ-সুবিধার সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

সংরক্ষণের চার দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এর সমর্থক ও বিরোধীরা এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। সমর্থকরা মনে করে এই নীতি কোনও পার্থক্য আনতে সমর্থ হয়নি। বুদ্ধিজীবীরা মনে করে সংরক্ষণ নীতি অ-গণ-তান্ত্রিক। সংরক্ষণ নীতির ফলে তফসিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অভিজাতগোষ্ঠীর তারা লাভবান হচ্ছে এবং অন্যদিকে অনগ্রসর শ্রেণীর দীন-দরিদ্ররা লাভবান হচ্ছে না।

তফসিলী জাতির মধ্যে উদ্বৃত্ত ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে পার্থক্য দেখা যায়। হিমাচল প্রদেশ, পন্ডিচেরী, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, হরিয়ানা ৫০ শতাংশ বন্টনে সমর্থ হয়েছে। সব থেকে কম বন্টন হয়েছে দাদরা ও নগর হাভেলিতে (০.৮৮ শতাংশ)।

অনুশীলনী ২

১। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অর্থ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। অনগ্রসরতা দূরীকরণে সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২৬.৫ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে

সংরক্ষণ নীতির বিবর্তনের কথা জানতে হলে আমাদের ভারতবর্ষে দুর্বল শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে খ্রীস্টান মিশনারিদের আগমনের পর তারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, বিশেষ করে অস্পৃশ্য ও উপজাতিদের শোষিত জনসাধারণ হিসেবে গণ্য করে। তারা এই শ্রেণীর উন্নতি সাধনে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। মিশনারিদের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় সমাজসংস্কারকরা যেমন দয়ানন্দ সরস্বতী শোষিত জনগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজ সরকার ও দেশীয় রাজারা শোষিত শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিদ্যালয়, বৃত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান শুরু করেন। এই পদ্ধতির অনুসরণে ১৯০৯ সালে নিম্নশ্রেণীর সমস্যাকে সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যতা চিহ্নিত করা হয়। ক্রমশ মিশনারিদের উৎসাহে অস্পৃশ্য ও উপজাতিরা ধর্মান্তরিত হ'তে থাকে। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারে কিছু সংখ্যক আসন শোষিত শ্রেণীর জন্য মনোনীত করা হয় এবং অস্পৃশ্যরা প্রথমবারের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশে তাদের বক্তব্য রাখে। মুসলিম লীগ তাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুদের মধ্যে বিভাজনের বিরোধিতা করে।

ইংরেজ আমলে অনুন্নত শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে যোগদানের সুযোগ প্রদান শুরু হয় দক্ষিণ ভারতীয় প্রদেশগুলিতে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পেরিয়র ই ভি রামস্বামী। এই আন্দোলন শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিতদের মধ্যে আত্মসম্মানের আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। অন্যান্য অব্রাহ্মণ শ্রেণীও এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

অনগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলনকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১। ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতের অব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভেদ মেটানোর জন্য আন্দোলন,

২। উচ্চজাতের অব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভেদ মেটানোর জন্য আন্দোলন এবং

৩। অস্পৃশ্য জাত ও 'শুদ্ধ' হিন্দুদের বিভেদ সংক্রান্ত আন্দোলন,

অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ ডঃ বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল অনুন্নত শ্রেণীকে হিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী ছিল, তাই তাদের জন্য একটি নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করা হয়। তফসিলী জাতিকে বলা হয় হরিজন (ভগবানের সন্তান) এবং উপজাতিদের বলা হয় গিরিজন (পাহাড়ের সন্তান)। কিন্তু গান্ধী ও আম্বেদকর দু'জনকেই কীভাবে অস্পৃশ্যদের সমস্যার সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে কোনও সঠিক ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন নি।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন অস্পৃশ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেন। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতি অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের কথা বলে। এই নীতির বিরোধিতা করে গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর মতে, এই নীতি হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। ডঃ আম্বেদকর ও গান্ধী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা পুণা চুক্তি নামে পরিচিত এবং এর ফলে অনুন্নত শ্রেণীর সম্প্রদায়কে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে বেশী সংখ্যক সংরক্ষিত আসন দেওয়া হয়, কিন্তু তা যুগ্ম নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে। স্বাধীনতার পর ডঃ বি আর আম্বেদকর গণপরিষদের সংবিধান রচনাকারী কমিটির সভাপতি হন। তিনি ১০ বছরের জন্য তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণে সফল হন।

শোষিত শ্রেণীর জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের নীতি ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সরকার শুরু করে। কিন্তু সেই সময় অস্পৃশ্য উপজাতিদের মধ্য তেমন যোগ্য ব্যক্তি খুব কম ছিল যারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারত।

২৬.৬ গণতন্ত্র ও অনগ্রসর শ্রেণী

টি. বি বটোমর বলেছেন, 'গণতন্ত্র বলতে বাস্তব অর্থে মানুষের মাঝে সাম্যের কথাই বোঝায়; সম্পদ, সামাজিক পদমর্যাদা, শিক্ষা ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে অসাম্য এমন পর্যায়ে যাবে না, যা সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য সৃষ্টি করবে যা একটি গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর কাছে স্থায়ীভাবে পদানত করে রাখবে। অসাম্য সাধারণত দু'ধরনের –

এক – স্বাভাবিক অসাম্য (প্রাকৃতিক ও কাঠামোগত) এবং দুই – মানুষের তৈরি সামাজিক অসাম্য। সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবি বলতে বোঝায়, প্রত্যেকে আত্মবিকাশের সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং তাদের মধ্যে যে-সব গুণাবলী আছে তার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে।

সাম্যের ধারণা মেধাতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তা এই ধারণাই তুলে ধরে যে, মানুষকে তার মেধার ভিত্তিতে বিচার ও পুরস্কৃত করা হবে। ওপর থেকে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে কিছু সম্পূর্ণ করাই সাফল্য নির্ধারণ করবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষকে তাদের মেধা ও আকাঙ্খা অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে দেওয়া। মেধাতন্ত্রের দিক থেকে দক্ষতা বলতে এটাই বোঝায়।

তত্ত্ব হিসেবে সাম্য কখনই স্থিতিশীল নয়। এটি সদা পরিবর্তনশীল ও নিত্য নতুন অর্থ বহন করে। অনেক অসাম্য যা পূর্বে স্বাভাবিক ছিল আজ আর স্বাভাবিক বলে গণ্য হয় না। সুযোগের অভাব, বৈষম্য এবং কিছু অনুদার ব্যবহারের প্রতিবাদেই সাম্যের ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু আজ ভারতীয় সমাজের অবহেলিত গোষ্ঠীরা যাতে উন্নতির জন্য সমান সুযোগ পায় তার জন্য প্রাধিকারমূলক ব্যবহারের সাংবিধানিক অধিকার-কে সাম্য বলা হয়।

২৬.৭ দুর্বল শ্রেণী সংক্রান্ত নীতি : একটি মূল্যায়ন

স্বাধীনতার পূর্বে যে-সব নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সেইসব নীতির বিষয়ে মুম্বই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে একটি অনগ্রসর শ্রেণীবিভাগ গঠন করা হয়। তামিলনাড়ুর ভূমিকা এর পরে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে লেবার কমিশনারের পদ তৈরি অনুন্নত'শ্রেণীর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তত্ত্বাবধান করার জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সররকারের থেকেও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও খ্রীস্টান মিশনারিদের ভূমিকা অনেক বেশী গুরত্বপূর্ণ।

পাঁচ দশক ধরে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকাশের প্রয়াস সত্ত্বেও অনুন্নত শ্রেণীর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন বা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তেমন সাফল্য পাওয়া যায়নি। উপরন্তু এই সুযোগ-সুবিধা সব জায়গায় সমানভাবে বন্টিত হয়নি।

ভারতের সংবিধানের প্রধান রচনাকারী ডঃ বি আর আম্বেদকর ১৯৩১ সালে বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু জনকল্যাণের কার্য সম্পাদন করতে হবে যা ভারতের পক্ষে কিছুটা অস্বাভাবিক। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় সরকার শোষিত শ্রেণীর (এখন তফসিলী জাতি) সাহায্যার্থে কিছু নীতি গ্রহণ করবে। একইরকমভাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আবশ্যিক

এবং জঙ্গলে বসবাসকারী উপজাতি (এখন তফসিলী উপজাতি) এবং অনুন্নত এলাকার সমস্যাকে স্থানীয় বা প্রাদেশিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা অনুচিত।

ভারতের সংবিধানে তফসিলী জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত একটি পৃথক অধ্যায় আছে। এর থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, সংবিধান রচয়িতাগণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিষয়টির দায়িত্ব নিতে হয় রাজ্য সরকারগুলিকে। আর কেন্দ্রীয় সরকার শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতির উন্নতির জন্য আর্থিক অনুদান দেয়।

১৯৭৭-৭৮ সালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৫৫ সালের পৌর অধিকারের আইন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের কথা বলে। কেন্দ্রীয় সরকারের মূল দায়িত্ব হ'ল ওই আইনের ১৫ ক(১) এবং ১৬ খ(১) বিভাগ অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলিকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অধিকার যাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা উপভোগ করে সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া। কিন্তু এর মূল প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়নি। এই আইন অনুযায়ী অপরাধ বিচারের জন্য বিশেষ আদালতের কথা বলা হয় যা শুধুমাত্র ৫টি রাজ্যে নামমাত্র রূপে দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত এই আইনের ১০ক বিভাগ অনুযায়ী অপরাধের করণে যৌথ জরিমানা সংগ্রহ কোন রাজ্য করে নি। বিভিন্ন রাজ্যে অস্পৃশ্যতাপ্রবণ এলাকার চিহ্নিতকরণও হয়নি।

১৯৭৮ সালের ২২ মার্চ লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন যে, তফসিলী জাতি ও উপজাতির স্বার্থরক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, যা প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ হ'তে পারে। এই নির্দেশদানের সময় তিনি সংসদে তফসিলী জাতি ও উপজাতি বিষয়ে সমালোচনার ক্ষেত্রে মুলতুবি প্রস্তাবের নজির তুলে ধরেন। এমনকি, রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে এগুলি আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারত, কারণ পরোক্ষভাবে এদের স্বার্থরক্ষা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ছিল।

১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদ সংক্রান্ত মন্ত্রী দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে কেন্দ্রের ওপর অধিক দায়িত্ব আরোপের প্রস্তাব আনেন। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির বিফলতার ওপর আলোকপাত করেন।

তফসিলী জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত কমিশনার তাঁর রিপোর্টে বলেন যে, তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রের। ১৯৭৭-৭৮ সালে তাঁর রিপোর্টে তিনি বলেন যে, হিংসাত্মক ঘটনা যা ঘটে তা রাজ্য সরকারগুলির অধীন আইনশৃঙ্খলার সমস্যা এই অজুহাতে কেন্দ্র তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে তা সাধারণ শান্তি ও আইনভঙ্গের ঘটনা হিসেবে মনে করা ঠিক নয়। তফসিলী জাতি ও উপজাতির উন্নয়নে কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না, কারণ ৪৬নং ধারায় উল্লিখিত 'রাষ্ট্র' অর্থে সমগ্র জাতিকে বোঝায়। তাঁর ১৯৭৯-৮০ সালের রিপোর্টে কমিশনার বলেন যে, অস্থির এলাকা সংক্রান্ত আইনে জাতি, সংঘর্ষ, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্মিলিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাঁর এই আশা যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃত্ব সহকারে তফসিলী জাতি ও উপজাতির বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনা রোধে সমর্থ হবে। কিন্তু তা পূরণ হয়নি।

তফসিলী জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে আশা করা হয় যে, তারা যে অসুবিধার বা বিভেদের সম্মুখীন হয়েছিল তা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে দূর করা সম্ভব। এই নীতির মূল লক্ষ্য হ'ল : তফসিলী জাতিভুক্ত মানুষকে অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে পৃথক করে দেখা হবে না এবং এই বিভেদ দূর করার চেষ্টা করা হবে। তফসিলী উপজাতি সংক্রান্ত নীতি আরও বেশি জটিল। এই নীতি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অবস্থার উন্নতির কথা বলে এবং কিছুমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলে।

যদিও তফসিলী উপজাতিরা তফসিলী জাতির মতো নানাপ্রকার সংরক্ষণ উপভোগ করে কিন্তু তারা এ বিষয়ে অনেক উদাসীন এবং আইনের ওপর এদের প্রভাব অত্যন্ত কম।

অনুন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে আধুনিককালে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়টি হ'ল এক অদ্ভুত প্রবণতা যার ফলে অনুন্নত শ্রেণীর বিকাশের সুযোগ-সুবিধা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশের সাহায্যে এই প্রবণতাকে রোধ করা যায়। আরও একটি ক্ষতিকারক বিষয় হ'ল অনুন্নত শ্রেণীর সংগঠনগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি।

অনুশীলনী ৩

১। ভারতীয় সমাজে অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতিবিধানের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি কী কী ?

.....

.....

.....

.....

২৬.৮ সারাংশ

ভারতবর্ষে যে-সব জাতি ও উপজাতিগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি যাদের তফসিলী বা তালিকাভুক্ত করেছেন তাদের বলা হয় তফসিলী জাতি ও উপজাতি। এইসব শ্রেণী আইন বা প্রশাসনিক আদেশ অনুযায়ী কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এদের জন্য লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে আসন সংরক্ষিত থাকে এবং সরকারি চাকরি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও আসন সংরক্ষিত থাকে।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য সংবিধান ও সরকার নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধার নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতিগুলি স্বাধীনতার পর থেকে কার্যকরী হয়েছে। আধুনিককালে এই নীতির বিপক্ষে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয় কারণ নীতিগুলি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে সুযোগ-সুবিধা দান করে। সেইজন্য এই নীতিগুলির আরও কার্যকরী প্রয়োগ দরকার।

২৬.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। উপবিভাগ ২৬.২.১ দেখুন।

২। উপবিভাগ ২৬.২.২ দেখুন।

অনুশীলনী ২

১। বিভাগ ২৬.৩ দেখুন।

২। বিভাগ ২৬.৪ দেখুন।

অনুশীলনী ৩

১। বিভাগ ২৬.৭ দেখুন।

পর্যায় ৭ ঃ ভূমিকা — সামাজিক রূপান্তর

এই পর্যায়ে সামাজিক-সংস্কৃতি পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানব সমাজ ও বিশেষার্থে ভারতীয় সমাজ তথা সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি-প্রকরণ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন পদ্ধতিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তনের পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণ উন্নয়ন পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলে বলে যুক্তি দেখান হয়। ভারতীয় সমাজে নারীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভারতে সমাজ পরিবর্তনের একটি বিশেষ দিক দেখতে পাওয়া যায়। সবশেষে শিক্ষাকে সমাজ-পরিবর্তনের একটি বিশেষ উপাদান বলে মনে করা হয়।

একক ২৭-এ মানব সমাজের সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি-প্রকরণের আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নতুন প্রতিষ্ঠান ও নগরায়ণের ভূমিকাকে সমাজ পরিবর্তনের উপাদান বলেই জোর দেওয়া হয়েছে।

একক ২৮-এ উন্নয়ন পদ্ধতিতে জনগণের অংশগ্রহণের যোগসূত্র আলোচনা করা হয়েছে ও অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ২৯-এ সমাজে নারীদের অংশগ্রহণের কথা ও নারীদের শিক্ষা, কাজ, সামাজিক মর্যাদা এবং নারী-আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ৩০-এ শিক্ষাকে ভারতে সমাজ পরিবর্তনের একটি উপাদান হিসেবে পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও শিক্ষার বিস্তারের ফলে যে পরিবর্তন হয় সে সমস্ত এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ২৭ ❑ সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি

গঠন

২৭.০ উদ্দেশ্য

২৭.১ প্রস্তাবনা

২৭.২ মানব সমাজের রূপান্তর

- ২৭.২.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরসমূহ
- ২৭.২.২ ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা
- ২৭.২.৩ ঐতিহ্যবাহী সমাজে সমাজ - সংস্কৃতির রূপান্তর
- ২৭.২.৪ নতুন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- ২৭.২.৫ গ্রামীন ভারতে সামাজিক রূপান্তর

২৭.৩ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া

- ২৭.৩.১ সমাজ - সংস্কৃতি রূপান্তরের জন্য সংস্কার প্রচেষ্টা
- ২৭.৩.২ গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি
- ২৭.৩.৩ ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন ও সামাজিক সচলতা (mobility)

২৭.৪ নাগরিকতা ও নগরায়ণ

- ২৭.৪.১ নাগরিকতা প্রভাব
- ২৭.৪.২ ভারতে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য
- ২৭.৪.৩ নগরের জনসমাজ ও সামাজিক রূপান্তর

২৭.৫ সারাংশ

২৭.৬ উত্তরমালা

২৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককের বিষয় পড়া হ'লে ঃ

- মানব সমাজে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি বোঝা যাবে।
- সমাজের রূপান্তরের পক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করা যাবে।
- ভারতে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের কিছু প্রক্রিয়ার নিরীক্ষা ও
- ভারতে সমাজসংস্কৃতির রূপান্তরে নগরায়ণকে উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা যাবে।

২৭.১ প্রস্তাবনা

সামাজিক রূপান্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তার একটি বিশেষ দিক। সমাজে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের বিশেষ দিকগুলিকে এই এককে ব্যাখ্যাকরা হয়েছে। এককের এই কাজে ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতায় পরিবর্তন, সমাজ পরিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা এবং গ্রামীন ভারতে সমাজ পরিবর্তনের রূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৭.২ মানব সমাজের রূপান্তর

মানব সমাজ তার আবির্ভাবের মুহূর্ত্ত থেকেই সামজিক রূপান্তরের পথে চলেছে। তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও তাদের সীমারেখার বাইরে যেসব শক্তি সক্রিয় সেগুলি এই রূপান্তরের মূল কারণ। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বেশ কিছুসংখ্যক মানব সমাজের অনুধ্যান এই ধারাটি স্পস্ট করে তোলে। যথা — আদিম সমাজ থেকে প্রাক্ শিল্প-সমাজ (ঐতিহ্যবাহী) এবং শিল্প-সমাজ (আধুনিক) প্রভৃতি সমাজগুলির বিবর্তন সমাজ-রূপান্তরের মূল কার্যকরী উপাদানগুলি তুলে ধরে। উপাদানগুলির বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিয়তই সমাজ-কাঠামোয় কাজ করে যেমন, জন্ম ও মৃত্যুর হার, জনসংখ্যা, প্রযুক্তি স্তর এবং অর্থনৈতিক সংগঠনে তার প্রভাব। সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত উপাদানগুলিই সমাজ-কাঠামোকে বিশেষভাবে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করে।

২৭.২.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরসমূহ

বিভিন্ন সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনা করে দেখতে হবে। 'সামাজিক' ও 'সাংস্কৃতিক' বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার উপায় হ'ল সামাজিক বলতে কতকগুলি সম্পর্ক, ভূমিকা ও দায়িত্ববোধের সমন্বয় আর সংস্কৃতি বলতে এই সব ভূমিকা ও সম্বন্ধাবলীর প্রতীকী বা নান্দনিক ধরণ বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিবাহ হ'ল একটি সার্বজনীন সামজিক সম্পর্ক; কিন্তু যে সমস্ত প্রথার মধ্য দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তা গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীতে বা এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে আলাদা হয়। এই সমস্ত পার্থক্য ও ধরণ আলাদা মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও নান্দনিক বোধ থেকে আসে; আর একেই বলা হয় 'সংস্কৃতি'। আমরা দেখি, প্রায় সব সমাজেই পুরোহিত, যাদুকর এবং ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা আছে আর এদের সাথে সমাজের সদস্যদের নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক দেখা দেয়, কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্কের ধরণ বা প্রতীকী প্রকাশ প্রত্যেক ধর্ম বা ধর্মীয় সমাজে এক নয়। প্রতীকী প্রকাশের এই পরিবর্তনশীল রূপকেই সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতি ও সামাজিক সংগঠনের মধ্যে এই পার্থক্য করা হয় সাধারণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। বাস্তব জীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে খুব সহজে পৃথক করা যায় না। সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক ও ভূমিকা এই সময়ে সংস্কৃতির মধ্যেই অবস্থান করে।

সামাজিক - নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ 'বাস্তব' ও 'অ-বাস্তব' সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখেন। বাস্তব বলতে তাঁরা প্রযুক্তি, শিল্প-রীতি, স্থাপত্য এবং দৈনন্দিন জীবন, গৃহস্থালী, ব্যবসা ও বাণিজ্য, যুদ্ধ ও অন্যান্য সামাজিক কার্যকলাপে ব্যবহৃত বাস্তব দ্রব্যাদি ও হাতিয়ারকে বুঝে থাকেন। সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার প্রকৃতি, বিশ্বাস, পুরাণ, উপকথা ও অন্যান্য কথকতার ধারা প্রভৃতিকেই 'অ-বাস্তব' সংস্কৃতি বলে ধরা হয়। এভাবেই সংস্কৃতির পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় আর এভাবেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের সমাজের শ্রেণীবিভাজন ও তুলনা করতে পারি। এভাবেই কোন একজন ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য ও স্তর বুঝে উঠতে পারে।

২৭.২.২ ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা

'ঐতিহ্য' ও 'আধুনিকতা' শব্দ দু'টি মূল্যবোধের প্রকাশ যা আদিমযুগ থেকে প্রাক্-শিল্পসভ্যতা এবং শিল্পসভ্যতা থেকে শিল্পসভ্যতার পরবর্তী কালে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি বুঝতে সাহায্য করে। 'আধুনিকীকরণ' একটি ধারণা যা সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। প্রত্যেক সমাজেরই একটি ঐতিহ্য আছে, কিন্তু যখন আমরা ঐতিহ্যবাহী সমাজের কথা বলি তখন আমরা সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ের কথা স্মরণ করি। ঐতিহ্যবাহী সমাজে সামাজিক স্তর-বিন্যাস স্পষ্ট; পশু-শক্তির প্রভূত ব্যবহারে উন্নত প্রযুক্তির ভিত্তিতে গ্রাম, শহর ও নগরের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় ও এদের সাথে বাচনিক-সাংস্কৃতিক ধারাতেও বিকশিত হয় লিখিত সাহিত্যিক ঐতিহ্য। রাজনীতি, প্রতিরক্ষা ও ধর্মীয় দপ্তরে বিশেষ ধরণের বুদ্ধিজীবীর সাহায্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থ ও ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা সহযোগে এই সব সমাজে এক সংগঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দেখা যায়। মূল্যবোধ, বিশ্বাস, জীবনধারা, নান্দনিক ও প্রতীকী বিধি ও আদল সমাজে এক ঐতিহ্য গড়ে তোলে যার সাথে অতীতের ধারাবাহিকতা দেখা যায়। ধারাবাহিকতার এই উপাদান একটি সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা মূল্যবোধকেই ঐতিহ্য বলে চিহ্নিত করে। অন্যথায় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গড়ন ও পদ্ধতিকে মূলতঃ ঐতিহ্যবাহী বলে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয়।

২৭.২.৩ ঐতিহ্যবাহী সমাজে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর

ঐতিহ্য থেকে আধুনিক পর্যায়ের সমাজের মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের কতকগুলি বিশেষ দিক দেখা যায়। এখন মনোযোগ দিয়ে ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক।

২৭২.৪ নতুন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সমাজ যতই ঐতিহ্যবাহী অবস্থা থেকে আধুনিকতার দিকে বিকশিত হ'তে থাকে সামাজিক সচলতা ততই বদ্ধ অবস্থা থেকে ক্রমশ মুক্ত অবস্থার দিকে যায়। সমাজে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি ও সামাজিক উপাদানগুলি বিকশিত হয়ে সমাজব্যবস্থাকে ক্রমশঃ মুক্ত অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। এই ব্যবস্থাগুলি সাংস্কৃতিক ও সমাজ কাঠামো উভয়েরই অন্তর্গত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে—জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটায়। ভারতের মত, এই সমস্ত পরিবর্তন রাজনৈতিক ব্যবস্থারও মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। বর্ণাশ্রম, সামন্তপ্রথা ও পারলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধে আচ্ছন্ন ঐতিহ্যবাহী ভারতে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই প্রভূত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মূল্যবোধে লালিত গণতান্ত্রিক ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বর্ণব্যবস্থার অসাম্যের পুরোন মূল্যবোধের প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কী করে এই পদ্ধতির বিকাশ ও তার বীজ ভারতীয় সমাজে প্রোথিত হতে থাকে ? পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মুখোমুখি ভারতীয় সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা এই পরিবর্তনের মূলে। ঔপনিবেশিক শাসন, নয়া প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এদেশে চালু করে। শিক্ষা, আইন ও বিচার, শিল্প-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পরিবহণ ও যোগাযোগ প্রভৃতি নতুন প্রতিষ্ঠান প্রচলিত হয়। এগুলিই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের নতুন দিক নির্দেশ করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করতে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে মূল্যবোধ প্রচলিত হয়, এগুলি তারই সংস্পর্শে আসে আর এরই ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা দেয়।

ভারতে যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রচলিত হয়েছে তার উৎস পশ্চিমের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও শিল্প বিপ্লব। ইউরোপীয় সমাজে রাষ্ট্র ও ধর্ম বা গীর্জার ভূমিকার পৃথকীকরণ পদ্ধতি থেকেই এর জন্ম। এর ফলে, সাধারণভাবে ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং অর্থনীতি, শিক্ষা, আইন ও বিচার, উৎপাদন ও শিল্প প্রভৃতি জনজীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। বিজ্ঞান ধর্মের মত স্বর্গীয় প্রতীতি বা নির্দেশে সৃষ্টি হয় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রমাণ ও মূল্যায়নের নিয়মের উপরই এর ভিত্তি। তাই ধর্মীয় নীতি যেখানে নিয়ত সত্য বিজ্ঞান সেখানে মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। এর ফলে, মানুষের অদৃষ্ট সম্পর্কে এক মানবিক বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। নিম্নতর প্রজাতি থেকে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের তত্ত্বেই জগতে মানুষের প্রকৃতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতীয়মান হয়। 'ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ' ও 'পতনে'র জায়গায় বিবর্তন, প্রকৃতির নিয়ম ও বিজ্ঞানের সাহায্য অনুসন্ধান প্রচলিত হয়। এই জগৎ ও তার বাইরে নিজের ভাগ্যনির্ধারণে মানুষ এখন নিজেই সক্ষম। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে মানুষ প্রকৃতি, প্রতিবেশী মানুষ ও অপরিচিতের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টিতে সক্ষম। পশ্চিমের এই বিকাশের ধারা সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদের প্রচলন করে। সমাজজীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, ধর্ম বা গীর্জার আওতার বাইরে শিল্প-সংগঠন, রাজনৈতিক দল, কর্মী-সংগঠন এবং জনগণের নির্বাচিত পরিষদ (Assembly) ও সরকারের মত ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিজ্ঞান এই নতুন বিশ্ব-বীক্ষা গড়ে তোলে এবং প্রযুক্তি হয় এর হাতিয়ার।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে এই পরিবর্তন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এর ফলে, প্রথমেই সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের আর্বিভাব দেখা যায়। মানুষের মর্যাদা, তার স্বাধীনতা, সাম্য ও সার্বজনীনতা স্বীকৃত হয়। ফরাসী বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবসমাজের ঐক্যের কথা বলা হয়। ব্রিটেনেও শিল্প বিপ্লব সামন্ততন্ত্র ও তার বিশেষ সুযোগ সুবিধে উঠিয়ে দিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার করে। সাম্য, স্বাধীনতা, সমস্ত নাগরিকের পৌর অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গী, সামন্ততন্ত্রের প্রভু ও রাজাদের স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে জোরদার করে। রাজনীতিতে উদারনীতিবাদের আর্বিভাবের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠে; প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় (অবশ্যই অতীতের ধর্মীয় আশ্রম থেকে আলাদা ভাবে) এবং আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে সমাজের নাগরিকদের সমান অধিকার, বাক্ ও সংগঠনের স্বাধীনতা প্রাধান্য পায়। এর ফলে অতীতের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই সংবাদপত্র ও মুদ্রিত বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয় ও সংযোগসাধনের অন্যান্য মাধ্যমও বিকশিত হয়। আধুনিকতার উপাদান হিসেবে উদারনীতিবাদ বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধে সমৃদ্ধ মানবিকতাবাদের সারাৎসারকে প্রতিফলিত করে।

২৭.২.৫ গ্রামীণ ভারতে সামাজিক রূপান্তর

উদাহরণস্বরূপ, ভারতের গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। অতীতে মড়ক ও মহামারিতে গ্রামে প্রচুরসংখক লোক ও গবাদি পশু মারা যেত। বসন্ত, কলেরা, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ মানুষের মনে এক দুর্বোধ্য ভয়ের সঞ্চার করত। এই ভীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আর এর ফলে অদৃষ্টবাদ, অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস ও ভ্রমাত্মক রীতি-নীতি দেখা যায়। এর ফলে ভ্রান্ত ধর্মীয় ও যাদুবিদ্যার বিশ্বাস দেখা যায় আর গ্রামে নারী-পুরুষ উভয়েই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষ বিশ্বাস করত যে দুষ্ট প্রেতাত্মা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যেমন গাছের মাথায়, পুকুরে বা বড় জলাশয়ের ধারে ও গ্রামের বহুদূরে সীমানার প্রান্তে বাস করে আর অসময়ে মানুষ তার কাছ দিয়ে গেলেই আক্রান্ত হয়। নতুন চিকিৎসাব্যবস্থার আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুরোন মড়ক ও মহামারী নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সেচ-

ব্যবস্থা, প্রযুক্তি, নতুন বীজ ও চাষের পদ্ধতি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষকে এখন অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত করেছে। এ সমস্তই মানুষের অন্ধ কুসংস্কার ও বিশ্বাস বিশেষভাবে উৎপাটিত করে দিয়েছে। গ্রামে আজকাল ভৌতিক কোন ঘটনা ঘটে না বললেই চলে। রাস্তাঘাট, দোকান, বাস-ষ্টপ ও ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উন্নয়নকেন্দ্র প্রভৃতি নতুন সংগঠনের সাথে গ্রামের দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় অতীতের দুষ্ট প্রেতাত্মাদের কল্পিত 'বাসস্থান' এখন অদৃশ্য। আর এর ফলে নতুন প্রজন্ম অতিপ্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সমস্ত স্থানকে স্মরণ করতে পারে না। এই সমস্ত পরিবর্তনই সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণের মাপকাঠি আর এগুলোই সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও অদৃষ্টবাদী মূল্যবোধ কমিয়ে দেয়।

সমাজে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চরম বাধা হয়ে দেখা দেয় আর একটি বিষয়। সে হল অস্পৃশ্যতা, যা অতীত সমাজের স্থবির ও শোষণকারী রূপটি তুলে ধরে। বর্ণাশ্রমের উপাদানগুলি মুক্ত সমাজব্যবস্থা ও উদারনীতিবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র সামাজিক ও দৈহিক সচলতায় বাধা হয়ে দেখা দেয় না; এটি সাম্য ও স্বাধীনতাবোধের মনস্তাত্ত্বিক ধারণাতেও বাধার সৃষ্টি করে। সমাজ সংস্কার ও আধুনিকীকরণের প্রবাহের সাথে সাথেই ভারতে অস্পৃশ্যতার ওপর আক্রমণ শুরু হয়। সুদূর অতীতে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার বিপক্ষে প্রচার করলেও তার কোন স্থায়ী ও সার্বজনীন প্রতিক্রিয়া হয়নি। ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও আধুনিকীকরণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাই এই সামাজিক কু-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ও সার্বজনীন প্রচার হিসেবে শুরু হয়। স্বাধীনতার ঠিক পরেই ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে যে দূরীভূত করা হয় তাই নয়, এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌গামিতার পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দপ্তর, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যতার প্রয়োগ স্পষ্টভাবেই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে।

অনুশীলনী ১

১। মানব সমাজ রূপান্তরের পথে চলেছে

ক) বিংশ শতাব্দী থেকে

খ) শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে

গ) মানব সমাজের অস্তিত্বের সময় থেকে

ঘ) পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে

২। অ-বস্তু সংস্কৃতি বলতে কি বোঝান হয় ? এই বিষয়ে তিন লাইন লিখুন।

.....

.....

.....

৩। ভারতের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার একটি বদ্ধ সমাজব্যবস্থা। সঠিক উত্তরে (✓) দাগ দিন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৭.৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া

ইতিহাস অনুসারে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনের সময় থেকে ভারতে আধুনিকতার পথ বিকশিত হতে থাকে। এর মূল চরিত্র এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। আমাদের জাতীয় নেতা — মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করেন। ন্যায়-বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা, যুক্তিবোধ ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মূল্যবোধ উজ্জীবিত করে ভারত সামাজিক রূপান্তরের পথে যাবে বলেই তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁদের মতে ভারত উন্নত হবে, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে ও আমাদের জীবন-ধারা ও অতীত ঐতিহ্যের কোন মূল্যবান দিক বর্জন না করে গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজ হিসেবে গড়ে উঠবে। আমাদের জীবনধারার মূল বিষয় সহিষ্ণুতা, অহিংসা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও মানবিকতাবাদ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যা আধুনিক সমাজের সাথে মিলে যায়। আমাদের সংবিধান ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ , গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করে দেশের জনগণকে ধর্ম, জাতি, জন্ম ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে উপরি-উক্ত মূল্যবোধগুলির রূপদান করে। তফশিলী জাতি, উপজাতি, মহিলা, সংখ্যালঘু অংশ প্রভৃতিদের মত দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক স্বরূপ এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষভাবে রক্ষিত হয়।

২৭.৩.১ সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের জন্য সংস্কার প্রচেষ্টা

এইসব উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হল ঐকামত ও সামঞ্জস্যবিধান। স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনে অহিংসা ও গণতন্ত্রকে আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও সেই একই ধারণা চলতে থাকে আর আইনী সংস্কার, শিক্ষা ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ গণতান্ত্রিক ঐক্যমতকেই আধুনিকীরণ ও উন্নতির উপায় হিসেবে নেওয়া হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সমাজ রূপান্তরের প্রচেষ্টার কার্যকর পরিকল্পনা হিসেবে নেওয়া হয়। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে সংস্কার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, স্বাধীনতার ঠিক পরেই জমিদারী ব্যবস্থা, সামন্তপ্রথা ও মধ্যস্বত্ত্ব-ভোগীদের অধিকার উৎখাত করে ভূমিসংস্কার কার্যকরী করা হয়। চাষী ও কৃষকদের জমির নিরাপত্তা দান করা হয়, বড় বড় জমির মালিকদের জমির ওপর সীমা আরোপ করা হয় যাতে বাড়তি জমি ভূমিহীন ও গ্রামীণ সমাজে দুর্বলতর শ্রেণীকে দেওয়া যায়। গ্রামে জনকল্যাণ ও উন্নয়নের স্বার্থে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গ্রামীণ পরিষদ বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। জমিদার ও উচ্চবর্ণ প্রভাবিত বংশ পরম্পরায় গঠিত পরিষদ তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে শহরের জমি ও সম্পত্তির সীমা নির্দিষ্ট করা হয়। দরিদ্র-কল্যাণে যাতে সহজে টাকা পাওয়া যায় তার জন্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয় ও সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। দুর্বলতর শ্রেণীর প্রতি সামাজিক ন্যায় ও উন্নয়নের গতি তরান্বিত করে যাতে আয়, উৎপাদন ও বৃত্তি সৃষ্টি করে জনকল্যাণ ও সমাজের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয় তার জন্য এইসব পদ্ধতি নেওয়া হয়। অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের মৌলিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুশিক্ষিত জনশক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান, শিল্প ও কৃষি, পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারই পরিকল্পনা ও সমাজ বিকাশের মূল চাবিকাঠি। কৃষির ক্ষেত্রে যেমন অধিক জমির মালিকানার ওপর সীমারেখা বসিয়ে বন্টনে ন্যায়বিচারের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক চাষ-ব্যবস্থা প্রচলন করা হয় তেমনি শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের জন্য সচেতন প্রচেষ্টায় জনকল্যাণের কাঠামোর মাঝেই ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প বিস্তারের চেষ্টা করা হয়। শিল্পনীতিতে চেষ্টা করা হয় একচেটিয়া ব্যক্তি মালিকানার উত্থান ও

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার। দু'টি পদ্ধতিই কার্যকর হয়েছে। এর ফলে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির স্তরে উন্নীত হয়। আধুনিকীকরণের জন্য উচ্চতর শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারে বিনিয়োগের ফলে এ সমস্ত সম্ভব হয়েছে।

২৭.৩.২ গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি

গ্রাম থেকে ব্লক স্তরে তারপর জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার ফলে ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সমন্বিত পদ্ধতি জোরদার হয়েছে। ভারতের নির্বাচন পদ্ধতিতে সাফল্য সংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচনা করে। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে এটি কার্যকর পদ্ধতি। বিভিন্ন স্তরে নানা স্বার্থ-গোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা সহমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়নের যে পদ্ধতি নেয় তা বিভিন্ন স্তরে গোষ্ঠী ও প্রতিনিধিদের ঘাত-প্রতিঘাতে কার্যকর হয়। উন্নয়ন পরিষদ যে পরিকল্পনা নেয় তা রাজ্য ও ভারতের কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সমর্থন করে। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পদ্ধতি ব্যাপক বিকেন্দ্রীকৃত আলোচনার ফল। পরিকল্পনা পদ্ধতি যত বেশি অভিজ্ঞ হয়েছে ততই লক্ষ্য ও উদ্দেশও ঠিক করার জন্য ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা নিয়েছে। স্বার্থান্বেষী-গোষ্ঠীর চাহিদা ও নির্বাচনী রাজনীতি এই পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। নিজস্ব এলাকাতে উন্নয়ন পদ্ধতি ও লক্ষ্যে বিধান সভার সদস্য ও সাংসদের ভূমিকা যথেষ্ট কার্যকর এবং এদেরকে নিয়েই স্থানীয় উন্নয়ন-প্রশাসনের পদ্ধতি ও লক্ষ্য ঠিক করা হয়। উন্নয়ন প্রশাসনে ক্রমশ বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। বিধানসভা ও সংসদের বিভিন্ন সময়ের নির্বাচন জনসাধারণকে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা যাচাই করতে সাহায্য করে ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পদ্ধতি মূল্যায়ন করে আধুনিকীকরণ কার্যকরী করতে অনুপ্রাণিত করে। ভারতে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ঐক্যমতের মতাদর্শ শুধুমাত্র লিখিত আদর্শ নয়; ভারতীয় সমাজে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এগুলি কার্যকর পদ্ধতি।

২৭.৩.৩ ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন ও সামাজিক সচলতা

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ভারতীয় সমাজের জীবন ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করেছে। শিল্পোন্নতি, নগরায়ন ও সামাজিক সচলতা ঘটেছে এর ফলে। অতীতের ভারতীয় সমাজে সামাজিক সচলতার সুযোগ ছিল সীমিত। নগরায়ণের পদ্ধতিও ছিল খুব ধীর। অধিকাংশ নগরেই ধরণ ছিল প্রাক্-শিল্প সমাজের মত। বর্ণ ও কারিগরী সংগঠনে বংশ পরম্পরায় ক্ষমতা বিভাজনের দ্বারাই শিল্প-ক্ষেত্রে কাজকর্ম চলত। অধিকাংশ নগরই ছিল হয় শাসকদের রাজধানী বা তীর্থক্ষেত্র। এই সমস্ত নগরের সামাজিক সংগঠন খুব জটিল হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মী-সংগঠনে, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধরণে পুরোন মূল্যবোধই কাজ করত। অতীতের ভারতীয় সমাজের সংগঠনে নগরগুলি বুদ্ধিজীবীদেরই সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিফলিত করত। অনেক সাংস্কৃতিক নতুনত্ব দেখা দিলেও এই সব নগরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চলাচল না থাকায় আমূল পার্থক্য ও পরিবর্তন খুব কমই দেখা দিত। আর্থ-সামাজিক কার্যাবলীতে এসব নগরে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনও খুব কমই ঘটত। ব্যবসা ও পরিবহন, শক্তি ও শ্রম-বিভাজনের পরিবর্তন খুব কম হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তনও খুব অল্পই হ'ত।

ঐতিহ্যবাহী সমাজে সামাজিক সচলতা ব্যক্তির মধ্যে না ছড়িয়ে পরিবারেই প্রসারিত হ'ত। বর্ণ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কোন দূরবর্তী নগর বা অঞ্চলে দেশান্তরী হয়ে 'উচ্চবর্ণের' বলে পরিচয় দেওয়া হ'ত। যোগাযোগ ও পরিবহনের সুযোগ খুব কম থাকায় এ ধরণের 'উচ্চবর্ণের' হওয়া খুব সহজ হ'ত। যুদ্ধ বা বিদ্যার্জনের মত বিশেষ

বিশেষ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের জন্য শাসকশ্রেণী অনেক সময় ঘোষণা জারি করে নিম্নবর্ণের কাউকে উচ্চবর্ণে প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক সচলতা ঘটাতে সাহায্য করত। তবে খুব অল্প ক্ষেত্রেই এধরণের সামাজিক সচলতা ঘটত। আমাদের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়ণের পর্যায়ের সাথে সাথে সামাজিক সচলতার মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়।

অনুশীলনী ২

১। ভারতে সামাজিক রূপান্তরের পদ্ধতিগুলি প্রতিফলিত হয়েছে (ঠিক উত্তরের পাশে দাগ দিন) ঃ

ক) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

খ) সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্টে।

গ) ভারতীয় ফৌজদারী মামলার আইনে।

২। গ্রামপঞ্চায়েতগুলির উদ্দেশ্য ঃ

ক) ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ।

খ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

গ) সমাজে দুর্বলতর শ্রেণীকে বিশেষ ক্ষমতা দান।

৩। পরিকল্পনা পদ্ধতি কি ভাবে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন এনেছে তার ব্যাখ্যা করুন। চার লাইনে উত্তর লিখুন।

.....

.....

.....

.....

২৭.৪ নাগরিকতা ও নগরায়ন

নাগরিক জীবনের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ধরণকে নাগরিকতা বলে। সামাজিক কাঠামো, জনসংখ্যা, এলাকার বিস্তৃতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিয়ে নগরের উন্নতিকেই নগরায়ন বলে। নগরের এলাকা ও সামাজিক কাঠামোই মোটামুটিভাবে নাগরিকতার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ছোট জায়গায় ঘন জনবসতি সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও জনসাধারণের সাংস্কৃতিক আচার আচরণের গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। এমনকি আবাসনের ধারাও এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। কোন নগরে কাজকর্মের প্রকৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা ও প্রশাসন প্রভৃতি নাগরিকদের সাংস্কৃতিক ধরণ, আবাসন পদ্ধতি ও চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। নগরে বসবাসের ফলে যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ ও জীবনধারা দেখা দেয় সমাজতাত্ত্বিকরা তাকেই নাগরিকতা বলে চিহ্নিত করেন। নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসারে সমাজ থেকে সমাজে নাগরিকতার প্রকৃতি পাল্টায়। নাগরিক উন্নতির ইতিহাসের ধারার পার্থক্যের সাথে এরও পরিবর্তন হয়।

২৭.৪.১ নাগরিকতার প্রভাব

সংক্ষিপ্তভাবে, নাগরিকতা এক সার্বজনীন, নামবিহীন, মনস্তাত্ত্বিক সচলতা যা নতুন ভাবধারার উদ্ভাবক; ব্যপকতরভাবে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অভিন্নতার সাথে এটি জড়িত। এর ফলে বহুমুখী জীবনধারা, সংস্কৃতিচর্চায় উচ্চতর বৌদ্ধিক মান, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যচর্চার প্রয়োগ এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়। সমাজগতভাবে এই অবস্থা দাম্পত্য পরিবার প্রধান, দ্রুত কর্মপদ্ধতি ও সময় — নির্দ্দিষ্ট আয়-ব্যয় বিশিষ্ট। সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে আত্মীয়তা, ধর্ম, ভাষা ও এলাকা ইত্যাদিতে জনগণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতিতে নাগরিকতা বিকশিত হয়। বিভিন্ন ধরণের এই সমস্ত সম্পর্কই নাগরিক সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। গ্রামের মত নগরে সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষ ধর্মীয় নৈকট্য ভাষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির জন্য যেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, নগরে একই এলাকার মানুষ তেমন কাছের হয়ে ওঠে না।

উচ্চস্তরে সামান্যীকরণের ক্ষেত্রে নাগরিকতার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট নাগরিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ধারার ও কাঠামোর পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতে নগরের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলে দেখা যায় বহু নতুন ধরনের কাজ, সামাজিক সচলতা, নতুন দক্ষতা, শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের আর্বিভাব সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের যৌথ-পরিবার প্রথা, অতীত ধর্মীয় আচার, বর্ণ ও বর্ণাশ্রম সংশ্লিষ্ট আচার আচরণ নগরে এখন প্রচলিত। নাগরিক জীবনে গোপনীয়তা ব্যক্তিগত স্বাধীকার, অসবর্ণ বিবাহ, বিভিন্ন অঞ্চলে লেনদেন থাকলেও অতীতের বহু বিশ্বাস ও আচার- আচরণ এখনও ভারতীয় নগরে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, অতীতের জীবনধারা ও বিশ্বাসের পরিবর্তনের জন্য সামাজিক আন্দোলন চলছে কিন্তু এর গতি এখনও খুব শ্লথ।

২৭.৪.২ ভারতে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য

ভারতে নগরায়ণের কতকগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে ভারতে নাগরায়ণের মাত্রা শিল্পায়নের মাত্রার সাথে খাপ খেয়ে হয়নি, কোথাও ভারসাম্যহীনভাবে 'অতি-নগরায়ণ' দেখা দিয়েছে। ঔপনিবেশিকতা তথাকথিত ভারতের নগরের আকৃতিগত পরিবর্তনের অংশ হিসেবে দেখিয়েছে — (ক) দেশীয় কেন্দ্র (পুরোনো নগর), (খ) সরকারী এলাকা (ঔপনিবেশিক নগর), (গ) ক্যান্টনমেন্ট (সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের বাসস্থান), (ঘ) বিশেষ, এলাকা (আমলা, রেলওয়ে কর্মচারী প্রভৃতি আবাসন এলাকা), (ঙ) দরিদ্র ও ভ্রাম্যমান মজুরদের ঝুপড়ি ও বস্তি এবং (চ) গ্রামীন এলাকা যা নগরের বিস্তৃতির সাথে সাথে এদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। নগরের এই বৃদ্ধি ও ধারা গ্রাম ও নগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক উচ্চস্তরের মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে। সমস্ত না হলেও ভারতের অধিকসংখ্যক নগরই আধুনিকীকরণের পথে অতীত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত।

২৭.৪.৩. নগরের জনসমাজ ও সামাজিক রূপান্তর

ভারতের নগরে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এখানে কাঠামোগত পার্থক্য ও সামাজিক সচলতা প্রভূত পারিমাণে দেখা যায়। শুধুমাত্র নগরের জনসংখ্যার বৃদ্ধি গ্রামাঞ্চল থেকে নগরাঞ্চলে জনগণের আগমন বোঝায়, যদিও নগরায়ণের স্পষ্ট মাপকাঠি হিসেবে একে গ্রহণ করা যায় না। ১৮৮১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত নগরে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি বেশ অল্পই ছিল (জনসংখ্যার ৯ থেকে ১০ শতাংশ)। ১৯৩১ সালের পরবর্তী সময়ে তা নির্দ্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩১, ১৯৪১ ও ১৯৫১ সালে নগরের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১১.১, ১২.৮ ও ১৭.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১, ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ১৮.০, ১৯.৯ এবং ২৩.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। নগরায়নের এই বৃদ্ধি শুধুমাত্র জনসংখ্যার বৃদ্ধি নয়, সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার, নারীদের কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি, স্ত্রী-পুরুষের হারের সামান্যীকরণ ও শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয় পরিবারেরও নগর অভিমুখে যাবার চেষ্টা। ভারতের নগরে আবাসন, বিপণন, জন হিতকারী প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতাদের সুরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাসেবী

প্রতিষ্ঠান বিশেষ কার্যকর। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভারতের নাগরিক জীবনে শিক্ষার সুযোগ এবং সংস্কৃতি ও বিনোদনের আকর্ষণ আধুনিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে।

জনগণনা ও জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সাহায্যে কর্ম-কাঠামো পরিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যায় কৃষিকাজে লাভজনকভাবে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত শহর ও নগরের বৃদ্ধির সাথে সাথে কমের দিকে তাই নয়, এই পরিবর্তন প্রশাসনিক ও আমলতান্ত্রিক প্রয়োজন সৃষ্টি করে। নগরের ব্যাপ্তির সাথে সাথে ব্যবসা ও বাণিজ্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়। শ্রমজীবী শ্রেণী বা বেকারশ্রেণীর বাইরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এই সচলতা দেখা যায়। নগরে কর্মক্ষেত্রে সচলতার হার গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বেশী কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজের বাইরের কাজ খুব কম থাকায় পার্থক্যের হার খুব বেশী নয়। কৃষিকাজ থেকে কৃষিকাজের বাইরে পরিবর্তনের দিক থেকে বিভিন্ন স্তরে যাতায়াত যেমন স্পষ্ট তেমনি কৃষিকাজের বাইরের কাজে সচলতা তেমন স্পষ্ট নয়। ভারতে জনসাধারণের জীবনে শিক্ষা, প্রশাসন, শিল্প, বিভিন্ন ধরণের কাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নগরের প্রাধান্যই বেশী। এই প্রভাব শুধু সাংস্কৃতিক ও সমাজ জীবনেই প্রভাব বিস্তার করে না; সামাজিক ও কর্মস্তরে সচলতার পথ দেখায়। এ সমস্তই একের পর এক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ,সামাজিক ভূমিকা, প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো সৃষ্টি করে আধুনিকীকরণের সুবিধা করে দেয়। নগরায়ণ ও নাগরিকতা শুধুমাত্র ঐতিহ্যকে সরিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করে তাই নয়, এরা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার উপাদানের মিলনে পরিবর্তনের পথ বেঁধে দেয়। ভারতীয় সমাজে আধুনিকীকরণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে।

অনুশীলনী ৩

১। নগরায়ণ কাকে বলে? চার লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

২। নগরাঞ্চলেই সামাজিক সচলতা বেশি দেখা যায়। সঠিক উত্তরে (✓) দাগ দিন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৭.৫ সারাংশ

এই এককে মানব সমাজে সামাজিক রূপান্তরের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে আলোচনার সূত্রপাত হয়। সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনে নয়া প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথাই বেশি করে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের উদাহরণ ব্যবহার করে ভারতীয় সমাজে সমাজ-সংস্কৃতি রূপান্তরের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই এককে মানব সমাজে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের উপর ব্যাপক আলোকপাত করা হয়েছে।

২৭.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। (গ)

২। এর অর্থ বৌদ্ধিক চর্চ্চা, সাহিত্য আলোচনা, শিল্প, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, আইন প্রভৃতিতে প্রতিফলিত ঐতিহ্যকে বোঝায়।

৩। হ্যাঁ।

অনুশীলনী ২

১। (ক)

২। (খ)

৩। এর ফলে শিল্পোন্নয়ন, নগরায়ন ও সামাজিক সচলতা ঘটে থাকে। এর ফলে গ্রামীন ভারতে কৃষিকাজের উন্নতি হয়। এগুলি সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণে উৎসাহ দিয়ে থাকে।

অনুশীলনী ৩

১। নগরায়ণ বলতে সমাজ-কাঠামো, জনসংখ্যা এলাকার বিস্তৃতি ও সমাজ সংগঠনের দ্বারা নগরের উন্নতির পদ্ধতিকে বোঝায়।

২। হ্যাঁ।

একক ২৮ ❑ উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ

গঠন

২৮.০ উদ্দেশ্য

২৮.১ প্রস্তাবনা

২৮.২ উন্নয়ন কাকে বলে

২৮.৩ জনগণের অংশগ্রহণের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক

২৮.৪ মৌল নীতি হিসেবে জনগণের অংশগ্রহণ

২৮.৫ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহ

২৮.৬ অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক

২৮.৬.১ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

২৮.৬.২ রূপায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

২৮.৬.৩ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী

২৮.৬.৪ অংশগ্রহণ কিভাবে হবে

২৮.৭ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি

২৮.৮ গ্রাম ও শহরাঞ্চলে অংশগ্রহণের প্রকৃতি

২৮.৯ অংশগ্রহণের বর্তমান পর্যায়

২৮.১০সারাংশ

২৮.১১গ্রন্থপঞ্জী

২৮.১২উত্তরমালা

২৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি ঃ

- উন্নয়নের অর্থ বুঝতে পারবেন।
- উন্নয়নের ধারার সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন, এবং
- অংশগ্রহণের মাত্রাকে প্রসারিত করার পথনির্দেশ করতে পারবেন।

২৮.১ প্রস্তাবনা

এই এককটির উদ্দেশ্য হ'ল উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা। বিকাশের সংজ্ঞা নির্ধারণ দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হবে। তারপর আমরা উন্নয়নের ধারার সঙ্গে জনসাধারণের অংশগ্রহণের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করব। অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পর আমরা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এটি কিভাবে বাড়ান যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করব।

২৮.২ উন্নয়ন কাকে বলে

উন্নয়নের ধারা মানুষের যাবতীয় কাজকর্মে পরিব্যপ্ত। একে সামাজিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে দেখা যায়। উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংগঠন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অর্থবহ পরিবর্তনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থনীতির পরিভাষায় বলা যায় উৎপাদনের ন্যুনতম উপাদান ব্যবহার করে সর্বাধিক উৎপাদনই এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ হ'ল একটি আবশ্যিক অঙ্গ।

উন্নয়নের ধারাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যিক। এই পরিকাঠামো গড়ে উঠলে তবেই নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্ভব হয়। এটি আরো প্রয়োজনীয় এই কারণে যে, এই পথেই প্রযুক্তির অগ্রগতি,, শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের ক্ষতিকারক প্রবণতাগুলি প্রতিরোধ করে বাঞ্ছিত সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণের নিরন্তর প্রয়াসের দ্বারা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে বলা যায়, জনগণের অংশগ্রহণকে জীবনের পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যাক্তি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন। যে কোন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে জনগণের ব্যক্তিগত অথবা সামগ্রিক অংশগ্রহণের উপর। অংশগ্রহণ যত বেশী হবে, সাফল্যের সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে বাড়বে।

২৮.৩ জনগণের অংশগ্রহণের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক

বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরেই স্বীকৃত। তবে, অংশগ্রহণ বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তবে আজকের দিনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উত্তরোত্তর গুরুত্ব পাচ্ছে। এখন উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এমন লোক নেই বললেই চলে।

প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং সম্পদের যোগান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর শিল্পোন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলির সমস্যা নিয়ে আগ্রহী হ'তে থাকে। প্রযুক্তির অপ্রতুলতাই উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়। সুতরাং অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ অথবা বর্জনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হ'ত। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করাকে অংশগ্রহণের এবং বর্জন করারে অংশগ্রহণ না করার সমার্থক মনে করা হ'ত। পরে অবশ্য প্রযুক্তির থেকে দৃষ্টি সরে আসে উৎপাদনের উপাদানের দিকে। উপাদানের সহজলভ্যতাকে উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়। প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং উৎপাদানের উপাদান উভয়ই বিত্তকেন্দ্রিক, তাই এক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের বিশেষ সুযোগ নেই।

১৯৬০ সালে প্রযুক্তি এবং সম্পদকে উন্নয়নের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য জনমত গড়ে তোলা এবং তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উপলব্ধি ক্রমেই দৃঢ় হ'তে থাকে যে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণকে যুক্ত না করতে পারলে সম্পদ অথবা প্রযুক্তির হস্তান্তর অর্থহীন। এই উপলব্ধির পরিপেক্ষিতেই উন্নয়নের আবশ্যিক অনুসঙ্গ হিসেবে জনগণকে যুক্ত করার তাগিদ দেখা দেয়।

২৮.৪ মৌলনীতি হিসেবে জনগণের অংশগ্রহণ

একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি, সম্পদ এবং সংগঠন একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (UNESCO) সুপারিশ করেছে যে সরকারগুলির কর্তব্য হ'ল জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব ও নারী সংগঠনের মত বেসরকারী সংস্থা প্রভৃতি আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। এদের সকলের সহযোগিতায় এবং পরামর্শে উন্নয়নের লক্ষ্য, নীতি এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এককথায় বলতে গেলে, সমাজকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে এবং জনগণের হিতার্থে অধিক সংখ্যক মানুষকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করাই হ'ল অংশগ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য।

অনুশীলনী ১

১। ন্যূনতম সম্পদের সাহায্যে অধিকতম উৎপাদন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উদ্দীপ্ত করে। সঠিক উত্তরে (✓) দাগ দিন

হ্যাঁ ☐ না ☐

২। অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান দুটি প্রতিবন্ধক কী ? এক লাইনে উত্তর দিন।

.....

২৮.৫ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহ

অংশগ্রহণ সম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে। প্রশ্নটি হ'ল, জনগণের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য কি ? সেই সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকটি প্রশ্ন ঃ উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এর তাৎপর্য কি ? কোন্ লক্ষ্যে উপনীত হ'তে এটি সহায়তা করে ? এইসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ সম্ভাব্য উত্তরগুলি উত্তরদাতার ব্যক্তিগত মূল্যবিচারের (Value judgement) সঙ্গে সম্পর্কিত। তাহলেও, আমরা কয়েকটি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের উল্লেখ করতে পারি। কিছু সমাজতত্ত্ববিদদের মতে অংশগ্রহণের দ্বারা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয়। এর দ্বারা স্থানীয় মানুষের অভিপ্রায় জানা যায়; উন্নয়নের উপযোগী ভাবনার জন্ম হয়; বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রস্তাবের ব্যবহারিক উপযোগিতা পরীক্ষা করে সেগুলির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা যায়; সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিজ নিজ পরিবেশ ও প্রয়োজনের পরিপেক্ষিতে আরও কর্মকুশলী করে তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী করা যায়; স্থানীয় সম্পদের সংগ্রহ এবং তার উপযুক্ত বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা যায়; সর্বোপরি পারস্পরিক সহযোগিতার একটি বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। জনগণের অংশগ্রহণ উপরোক্ত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে এবং তার ফলে উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তোলে।

২৮.৬ অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক

অংশগ্রহণের কথা উঠলে এর তিনটে দিকের আলোচনা অবশ্যই করতে হয়; অংশগ্রহণ বিষয়টি কি, অংশগ্রহণ কে করবে এবং অংশগ্রহণ কিভাবে করবে। অংশগ্রহণ কি, এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত চার ধরণের অংশীদারীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

ক) সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ।

খ) রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ।

গ) অংশগ্রহণের ফলভোগ।

ঘ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ।

সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে যদি বলে উপাদান (input), তাহলে অংশগ্রহণের ফলভোগ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে বলা যাবে তার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ একটা ভাগ হ'ল অবদানমূলক এবং অন্যটি বন্টনমূলক। সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের রূপায়ণ যদি হয় অংশগ্রহণের অবদান তাহলে বাকি দু'টিকে বলা চলে উন্নয়নের সুফলের সামাজিক বন্টন।

২৮.৬.১ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

ধ্যানধারণা গড়ে তোলায়, পরিকল্পনা রচনায়, বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে থেকে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে আমরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। সিদ্ধান্তগ্রহণ তিন ধরণের হতে পারে। এগুলি হ'ল প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, প্রবহমান সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনাগত সিদ্ধান্ত। স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রয়োজনকে চিহ্নিত করেই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কার্যপদ্ধতি, অর্থের যোগানের ব্যবস্থা, সঞ্চয়, মূল্যায়নের মান নির্ণয় প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। প্রবহমান (ongoing) সিদ্ধান্ত বলতে বোঝায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্পকে চালু রাখা অথবা বন্ধ করে দেওয়া, গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল্যায়নের দ্বারা এর উপযোগিতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। পরিচালনাগত (operational) সিদ্ধান্তের অর্থ হ'ল উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সরকারী অথবা বেসরকারী সংস্থা, সমবায় এবং অন্যান্য ,স্থানীয় সংগঠনের ভাগিদারীর মূল্যায়ন।

২৮.৬.২ রূপায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

সম্পদ সংগ্রহ, পরিচালন এবং সমন্বয় সাধন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণ প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রকল্পগুলি রূপায়িত হ'লে জনসাধারণই উপকৃত হয়, কারণ শেষ পর্যন্ত জনগণই উন্নয়নের সুফল ভোগ করে। এইসব সুফল ব্যক্তিগত, অথবা সমষ্টিগত হ'তে পারে, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক হ'তে পারে। উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়িত করার পর এগুলির নিয়মিত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন, প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি না। অনুসন্ধান করা প্রয়োজন প্রকল্পের ফলে জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয়েছে কি না। জনগণের অংশগ্রহণই কর্মসূচী এবং প্রকল্পের মূল্যায়নকে অর্থবহ করে। তাই প্রকল্পের প্রাথমিক রূপরেখাতে এই অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই অংশগ্রহণের কোন ধরাবাঁধা কাঠামো নেই। এটি প্রত্যক্ষ হ'তে পারে, আবার পরোক্ষও হ'তে পারে। মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ যেমন একটি পথ, তেমনই অন্যান্য পথ হ'ল পরোক্ষ পরামর্শ, সংবাদপত্রে চিঠিপত্র বা প্রয়োজনে সংগঠিত প্রতিবাদ। আসল কথা হ'ল মনে রাখতে হবে মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বেশ কঠিন কাজ।

২৮.৬.৩ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী

অংশগ্রহণকারী কারা ? এই প্রশ্নের চারটি উত্তর আছে। প্রথমত, স্থানীয় বাসিন্দারা, দ্বীতীয়ত, স্থানীয় নেতারা, তৃতীয়ত, কর্মকর্তারা এবং চতুর্থত, বিদেশী বিশেষজ্ঞরা। উপরোক্ত প্রতিটি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের চরিত্র নির্ধারিত হয় সামগ্রিক প্রয়োজন, কারিগরী দক্ষতা এবং সরকারী নীতির দ্বারা। তাছাড়া প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীর সদস্যদের বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, জীবিকা ইত্যাদির দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ, এগুলির মাধ্যমে অংশগ্রহণের প্রসার এবং চরিত্র উপলব্ধি করা যায়। অন্য কয়েকটি দিকও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, যেমন অংশগ্রহণের ভিত্তি কি ? অংশগ্রহণ কি ঐচ্ছিক, না ব্যধ্যতামূলক ? অর্থাৎ যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা কি কোন প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে করছেন, না স্বেচ্ছায় করছেন ?

অনুরূপভাবে অংশগ্রহণের ধরণ নিয়েও অনুসন্ধান করতে হবে। এটি কি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ ? অংশগ্রহণের তাগিদ কি ব্যক্তিগত না প্রাতিষ্ঠানিক ? আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় হ'ল অংশগ্রহণের পরিধি। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পে কতটা সময় ব্যয় করেছে, কতটা আগ্রহ দেখিয়েছে এগুলি সম্পর্কে, খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। পরিশেষে একথা ভুললে চলবে না অংশগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্যই হ'ল জনসাধারণকে ক্ষমতা অর্জন করতে দেওয়া। তাই অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হবার জন্য জনগণের কতটা ক্ষমতা আছে সেটাও দেখতে হবে।

২৮.৬.৪ অংশগ্রহণ কিভাবে হবে

ইতিপূর্বে আমরা অংশগ্রহণকারী কারা, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। এবার অংশগ্রহণ কি ভাবে ঘটবে সেটা বোঝার চেষ্টা করব। অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে প্রথমেই কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য এবং কাজের পরিবেশ, দু'টিকেই পরীক্ষা করতে হবে। প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে জটিল কৃৎকৌশল, সম্পদের প্রয়োজনীয়তা, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, তাৎক্ষণিক উপযোগিতা, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের নমনীয়তা, প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি। এগুলি সাধারণভাবে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিষয়গুলি ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, অন্যথায় প্রকল্পের রূপারেখায় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের মধ্যে আছে প্রাকৃতিক এবং জৈবিক বিষয়, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপাদান, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়। অংশগ্রহণের ধরণকে এইসব বিষয়গুলি গভীর এবং সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে।

আমরা স্থানীয় শাসনে, সমবায় সংগঠনে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণকে বিচার করব। উন্নয়ন পদ্ধতিতে এই প্রতিটি বিভাগের ভূমিকা নীচে আলোচিত হ'ল।

(ক) স্থানীয় শাসন

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিবর্তনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আবির্ভাব এক অনন্য ঘটনা। এটির ভিত্তি হ'ল স্বশাসন। অর্থাৎ সামগ্রিক স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে নাগরিকদের অংশগ্রহণ। এই ব্যবস্থায় কি কাজ করা হবে, কার মাধ্যমে কার হবে এবং কিভাবে করা হবে — এই সব সিদ্ধান্ত জনসাধারণ নিজেরাই গ্রহণ করে। যেহেতু স্থানীয় শাসনের অধিক্ষেত্র, জনসংখ্যা এবং কাজকর্ম সীমিত, সেহেতু আঞ্চলিক জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগ সুনিশ্চিত করা তুলনায় অনেক সহজ। কিন্তু আধুনিক সরকারের শাসনপদ্ধতি অনেক জটিল। এক্ষেত্রে তাই সারাক্ষণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেই কারনেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রতিনিধত্বমূলক ব্যবস্থায় নাগরিকরা তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। নাগরিকদের পক্ষে এই প্রতিনিধিরাই সরকারী কাজকর্মে

অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদের অতীতের কাজকর্ম বিবেচনা করে নাগরিকরা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এঁদের নির্বাচিত করেন।

স্থানীয় শাসনের দুটি শাখা। একটি শাখা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই শাখার দায়িত্ব হ'ল আলোচনার মধ্যে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়নের তদারকি করা। প্রকল্পের কি, কেন, কিভাবে, কখন, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের দায়িত্ব প্রথম শাখার। প্রথম শাখা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় শাখা সেগুলিকে যথাযথ রূপদান করে, প্রকল্পগুলিকে কার্যে পরিণত করে।

ভারতবর্ষে স্থানীয় শাসন প্রাদেশিক সরকারগুলির দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত। এই স্থানীয় শাসন সাংবিধানিক মর্যাদা অর্জন করেছে অতি সম্প্রতি। এর কাজকর্ম, ক্ষমতা, সম্পদ, অধিক্ষেত্র ইত্যাদি নানাভাবেই প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদিও প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের নিজেদের প্রয়োজনমাফিক স্থানীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তবু আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এইসব স্থানীয় শাসনে সাধারণ চিত্রটি এতকাল এইরকম ছিল — এগুলির আর্থিক বুনিয়াদ দুর্বল, রাজনৈতিক ব্যবস্থা আগোছালো, আন্তঃবিভাগীয় কোন্দলে জীর্ণ। তাছাড়া, রাজ্যসরকারগুলি যখন তখন এদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে এসেছে। এইসব নানা কারণে স্থানীয় শাসনের প্রতি জনসাধারণ ক্রমেই আস্থা হারাচ্ছিল। স্থানীয় শাসনের এইসব দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার তাগিদেই সংবিধানে ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধন আনতে হয়েছে। বিশেষ করে পঞ্চায়েত রাজ উন্নয়নের কাজে জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করবে, এটাই তো প্রত্যাশিত।

এটাও মনে করা হয়েছিল যে, মাঝে মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও জনসাধারণ সমস্ত রকমের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এটা আশা করা হয়েছে যে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে উঠবে এবং সেই সূত্রে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্নয়ণের প্রকল্প রচনা ও রূপায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। নির্বাচনে ভোট দেওয়া পঞ্চায়েত রাজে অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ রূপ। কিন্তু অংশগ্রহণের অন্যান্য অভিব্যাক্তিগুলি মূলতঃ পরোক্ষ। জনগণের অংশগ্রহণ পরিমাণগতভাবে যতই সামান্য হোক, এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে দুঃখের কথা, ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটা প্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মৃতপ্রায়।

পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং পৌর--কাউন্সিল — এগুলি সবই জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে গঠিত আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান। স্বায়ত্তশাসনের নীতির প্রয়োগের ফলে এগুলির সৃষ্টি। কিন্তু দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তগুলি ক্ষেত্রবিশেষে দলীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এর ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিই ক্রমশঃ বিকৃত হয়ে পড়ে। প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে। তাছাড়া জাত-পাত এবং গোষ্ঠীস্বার্থ সমাজের ক্ষমতাবান অংশের পক্ষেই কাজ করে। এই কারণে সমাজের মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী অংশ উন্নয়নের ফল ভোগ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। অর্থাৎ একদিকে মেকি-বিকেন্দ্রীকরণের অছিলায় প্রাদেশিক সরকারগুলি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে সেগুলিকে অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখে। অন্যদিকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থানীয় সামাজিক সম্যাগুলিকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।

শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলির মধ্যে ক্রমেই আত্মতৃপ্তির ঝোঁক দেখা দেয়। এগুলিকে আলস্য গ্রাস করে নেয়। ফলে এগুলি অনেক সময়েই সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে যায়। এদের কার্যধারাও সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে যায়। এমনকি জনপ্রতিনিধিরাও স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদাকে যথাযথভাবে তুলে ধরেন না। দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ এবং রাজনৈতিক তাগিদে এগুলিকে ব্যবহার করার ফলে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ নষ্ট

হয় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নয়নের লক্ষ্যে সজীব করতে হলে জনগণের অংশগ্রহণকে প্রকৃতই সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) সমবায় সংগঠন

সমবায় হ'ল মূলত জনগণের সংগঠন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণেকে জোরদার করতেই এগুলিকে গড়ে তোলা হয়। 'সমবায় সমিতি আইন' অনুযায়ী গঠিত কয়েকটি সংস্থা হ'ল সমবায় ঋণদান সমিতি, আখচাষ সমবায়, আবাসন সমবায় ইত্যাদি।

অধিকাংশ সমবায় সংগঠনের একটা বড় দুর্বলতা হ'ল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে অংশগ্রহণে সমবায়-সদস্যদের অনীহা। ফলে প্রভাবশালী এবং স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় কিছু লোকই সমবায়গুলি চালায়। তাছাড়া সমবায় সংস্থাগুলিতে নিয়মিত নির্বাচনও হয় না। এর ফলে সমবায় আন্দোলনে যোগদান করতে ইচ্ছুক লোকেরা ক্রমেই তাঁদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

(গ) সমিতি

সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের আর একটি অভিব্যক্তি হল সমিতি। এগুলি গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। করদাতা সমিতি, উপভোক্তা সমিতি, আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতি প্রভৃতি এই ধরনের সমিতির কয়েকটি উদাহরণ। যাদের নিয়ে সমিতিগুলি গঠিত হয় তাদের উন্নতিবিধান করাই এই সব সমিতিরগুলির উদ্দেশ্য। সমিতিগুলির কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে অঞ্চলের সাধারণ সমস্যাগুলি এবং সেই সব সমস্য সমাধানের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ঘ) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, শিশুর পরিচর্যা, নারীকল্যান, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সব সংগঠনগুলির ছত্রছায়ায় সমমনোভাবাপন্ন লোকেরা একত্রিত হয়ে কল্যাণকর্মে ব্রতী হন। তাঁরা সাধারণ মানুষকে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে উন্নয়নের সামগ্রিক বোঝা অনেকটাই লাঘব করে দেন। সমিতি স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্যই হ'ল জনসাধারণের প্রাণবন্ত সহযোগ সুনিশ্চিত করা, কারণ এই সহযোগিতা ছাড়া উন্নয়নের কোন কর্মসূচীই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ সফল হলেও তার দ্বারা উন্নয়নের সব সমস্যার সমাধান করা যায় না।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উন্নয়নের উদ্যোগে কাঙ্খিত মানবিক স্পর্শ দেয়। যেহেতু এখানে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব অপ্রত্যক্ষ, সেহেতু সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার বাতাবরণ গড়ে ওঠে। এই সহযোগিতা অংশগ্রহণের রূপ নিয়ে উন্নয়নের উদ্যোগকে অর্থবহ করে তোলে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নিম্নোক্ত শর্তগুলি পূরণ করলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি আরও অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

প্রথমতঃ এগুলিকে হতে হবে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত জনগণের প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল-স্তরের সংগঠনগুলিকে আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। এগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর জন্য স্থানীয় নেতৃত্বকে লাগাতার প্রয়াস করতে হবে। তৃতীয়ত, নিজেরা কোন প্রকল্প পরিচালনা

না করে এদের স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে প্রকল্প পরিচালনায় সাহায্য করা। চতুর্থত, বেসরকারী সংস্থাগুলির কর্তব্য হ'ল সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বনিযুক্তির সম্ভাবনাকে প্রসারিত করা। এর অর্থ হ'ল এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে মানুষ অপরের গলগ্রহ হয়ে না থেকে আত্মনির্ভরশীল হবার প্রেরণা পায়। পঞ্চমত, বেসরকারী সংস্থাগুলির দায়িত্ব হ'ল জাতীয় উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে জনসাধারণের মধ্যে অনুরূপ চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটান। কারণ, তাহলেই সাধারণ মানুষ তাদের জন্য রচিত এইসব যোজনা ও পরিকল্পনা ফল ভোগ করতে পারবে। ষষ্ঠত, সরকারেরও উচিত বেসরকারী সংস্থাগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সহায়ক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা তাদের কর্তব্য। কারণ, তাহলেই একই প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি রোধ করে সম্পদের অপব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হবে। সকলের মধ্যে উপযুক্ত যোগাযোগ থাকলে তবেই সমাজের অধিকতর উপকার করা সম্ভব।

অনুশীলনী ২

১। অবদানমূলক (Contributive) এবং বিতরণমূলক (distributive) দিক থেকে অংশগ্রহণের চারটি ধরণ বর্ণনা করুন। উত্তর চার লাইনে সীমাবদ্ধ রাখুন।

.....

.....

.....

.....

২। অংশগ্রহণকারী চারটি গোষ্ঠী কি কি ? এক লাইনে উত্তর করুন।

.....

৩। আপনার রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দুটি উদাহরণ দিন। আপনি কিভাবে এর যে কোন একটিতে অংশগ্রহণ করেন এক লাইনে লিখুন।

.....

৪। আপনার অঞ্চলের চারটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম লিখুন।

.....

.....

.....

.....

২৮.৭ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি

উন্নয়নের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ পথে অনেক বাধা আছে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা, ব্যাপক অশিক্ষা, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা, দায়বদ্ধ আমলাতন্ত্র এবং উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, তথ্যের অপ্রতুলতা এবং কারিগরী ও সাংগঠনিক সমস্যা এই বাধার কিছু উদাহরণ। এগুলিই অংশগ্রহণের পথে প্রধান সমস্যা।

অশিক্ষা, অস্বাস্থ, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং মুষ্টিমেয় কিছু লোকের আধিপত্য — এগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অশিক্ষার কারণেই মানুষ শিক্ষিত লোকের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য মানুষ অবস্থাপন্ন লোকের দ্বারস্থ হয়। এই নির্ভরশীলতাই নাগরিককে ক্রমেই দুর্বল করে তোলে। এর ফলে অংশগ্রহণের ইচ্ছাটাই চলে যায়।

এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয় ক্ষমতাবান স্থানীয় ব্যক্তিদের চাপ এবং আমলাতন্ত্রের বাধা। অংশগ্রহণ করতে হ'লে সময় এবং সম্পদ — দু'টিই বিনিয়োগ করতে হয়। গরীবরা তাঁদের অন্নের সংস্থান করতেই এ দুটিকে বিনিয়োগ করে থাকেন। ফলে অংশগ্রহণের ইচ্ছাটাই চলে যায়।

এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয় ক্ষমতাবান স্থানীয় ব্যক্তিদের চাপ এবং আমলাতন্ত্রের বাধা। অংশগ্রহণ করতে হ'লে সময় এবং সম্পদ — দু'টিই বিনিয়োগ করতে হয়। গরীবরা তাঁদের অন্নের সংস্থান করতেই এ দু'টিকে বিনিয়োগ করে থাকেন। ফলে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য দু'টির কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে না। সেইজন্য তাঁরা অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকলেও কার্যক্ষেত্রে কিছুটা উদাসীন থাকেন। অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবও তাঁদের অনীহার অন্যতম কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নমূলক কার্যাবলী জনসাধারণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত — একথা বিজ্ঞাপিত হলেও গরীবরা এসবের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেন না। এর ফলে উন্নয়নের প্রক্রিয়া থেকে গরীবরা বাদ পড়ে যান।

২৮.৮. গ্রাম শহরাঞ্চলে অংশগ্রহণের প্রকৃতি

উপযুক্ত গণসংগঠনের মাধ্যমেই অংশগ্রহণের মনোভাবকে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করা যায়। একক প্রয়াসের চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ অনেক বেশি ফলপ্রসূ। কিন্তু আমরা জানি ভারতবর্ষে গরীবরা সঙ্ঘবদ্ধ নন। ফলে তাঁরা উন্নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুপ্রবেশ করতে পারেন না, কারণ এগুলিতে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। অতীতে গ্রামাঞ্চলে গণউন্নয়ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণের কিছুটা সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু দু'একটি রাজ্য বাদ দিলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতী রাজ তার জন্মলগ্ন থেকেই এত সমস্যায় জর্জরিত যে জনগণের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে এটি আদপেই জোরদার করতে পারেনি। অন্যদিকে সমবায়ের মত স্থানীয় সংস্থাগুলি ইতিপূর্বে উল্লেখিত কারণে কায়েমী স্বার্থের শিকার হয়ে পড়ে। এইভাবে দারিদ্র এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য পঞ্চায়েত এবং সমবায় — উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক এই দু'টি প্রতিষ্ঠানেই দরিদ্র জনসাধারণের অংশগ্রহণ সমস্যাকুল হয়ে পড়েছে।

শহরাঞ্চলে জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে পৌর-নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি অবশ্য জনগণকে যুক্ত করার তাগিদ নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যই শহরাঞ্চলের মৌলিক পরিষেবা (Urban Basic Services) অথবা শহরাঞ্চলে নাগরিক উন্নয়ন কর্মসূচী (Urban Community Development Programme)

গৃহীত হয়েছে। এইসব কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হ'ল প্রধানত শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের গরীবদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা গড়ে তোলা যাতে তাঁরা ক্রমেই আত্মোন্নয়নে প্রয়াসী হন। এছাড়া শহরাঞ্চলের গরীবদের উন্নতিকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যপকতর অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন সংস্থা গড়ে তোলা আবশ্যিক যার ভিত্তি হবে আত্মাবিশ্লেষণ ও আত্মোন্নতি।

২৮.৯ অংশগ্রহণের বর্তমান পর্যায়

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, পরিকল্পনা, রূপায়ন, ফলভোগ এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজকর্মেই অংশগ্রহণ ঘটে থাকে। বাস্তবে কিন্তু পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ নীচের স্তর পর্যন্ত সব রাজ্যে প্রসারিত হ'তে পারেনি। প্রথাগত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত উচ্চতর স্তরেই গৃহীত হয়। জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের নেতারাই এইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক স্তরের পরিকল্পনার চাবিকাঠিও থাকে বিশেষজ্ঞদের হাতেই। উন্নয়নের প্রকল্পগুলি রচনা ও রূপায়ন করে শাসনতান্ত্রিক সংস্থাগুলিই। রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে — যেমন, বস্তি উন্নয়ন, শিশু-পরিচর্যা, পরিবার-পরিকল্পনা, আবাসন— সীমিত পরিমাণে অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

বাস্তু জমি বন্টন, ঋণদান, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, দুর্বলতর শ্রেণীকে সাহায্যদান ইত্যাদি বেশ কিছু ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণেব পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হ'ল দালালদের উপস্থিতি এবং ক্ষমতাবান লোকেদের প্রভুত্ব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনজীবনের দুর্নীতি।

বর্তমানে মূল্যায়নের কাজটা করে থাকেন বিভিন্ন 'এলিট' গোষ্ঠী এবং সংবাদপত্র সংগঠনগুলি। এরাই উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যসূচীর মূল্যায়ন করে। নাগরিকদের অবশ্য অভাব অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকে, তবে এইসব অভিযোগের প্রতি জনপ্রশাসনের দৃষ্টি পড়ে সামান্যই। সাধারণ নাগরিকের কাছে অংশগ্রহণের একমাত্র সুযোগ হ'ল নির্বাচন। তবে নির্বাচনে যেহেতু বড়রকমের বিষয়বস্তু, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং টাকার আধিপত্য, উন্নয়নের সমস্যা সেখানে কোনই গুরুত্ব পায় না।

অংশগ্রহণ বাড়াবার উপায়সমূহ

আমরা দেখেছি জনগণকে উন্নয়নের কার্যসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করার পথে অনেক প্রতিবন্ধক। এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন জনসমষ্টির সমর্থন সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা। তবেই উন্নয়ন প্রকল্প যাদের কল্যাণসাধনের জন্য উদ্দিষ্ট তাঁদের সক্রিয় সমর্থন পাওয়া সম্ভব। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের আগ্রহ যত কম, তাদের যুক্ত করার প্রয়োজনও তত বেশী। নিম্নোক্ত কয়েকটি পদ্ধতি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন পাবার ক্ষেত্রে উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথমত, অংশগ্রহণকে কার্যকর করতে হ'লে কর্মসূচীর উদ্দেশ্যকে ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। শুধু তাই নয় এমন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যা গোষ্ঠীভুক্ত সকলের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। সকলের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হ'লে তবেই সাধারণ মানুষ গৃহীত কর্মসূচীকে তাদের কর্মসূচী বলে মনে করতে পারবে এবং কর্মসূচীর সার্থক রূপায়নে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারবে। ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকল্পকে সীমিত করলে শিক্ষা, আলোচনা, ব্যাখ্যা এবং সমঝোতার মধ্যে দিয়ে সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। বড় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটা দুরূহ; কারণ সেখানে পরস্পরপর পরস্পরের অপরিচিত। এক্ষেত্রে অনুভূত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী গড়ে তোলার দায়িত্ব যদিও বহিরাগত সংগঠকের তবু এ কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের কাজকর্মে

নেতৃত্ব দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কর্মসূচীতে যদি উৎপাদনমুখী এবং আয়সৃষ্টিকারী হয় তবেই মানুষ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে উৎসাহ পাবেন। যদি ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে তবে কোন কৃষক বা শ্রমজীবী কার্যসূচীর সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাইবেন না। অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতা-অর্জন — এ দু'টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই উৎপাদনের উপকরণের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কৃষক বা শ্রমিক অংশগ্রহণে অনীহা বোধ করবেন। উৎপাদনের উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই ক্ষমতার নাগাল পাওয় যায়। ক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনা অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

তৃতীয়ত, তথ্যসংগ্রহের সুযোগ থাকলে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি গ্রামের গরীব মানুষ তাঁদের হিতার্থে গৃহীত কর্মসূচীগুলি সম্পর্কে প্রায়শঃই খবর পান না। আসল কথা হ'ল, সার্থক অংশগ্রহণের উপযোগী তথ্যের একান্তই অভাব। যদি তথ্যের অভাব ঠিকমত পূরণ করা যায় তাহলে জনসাধারণ পরিকল্পনাগুলিকে বুঝতে পারবেন এবং এগুলির রূপায়নে অংশগ্রহণ করে তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রূপায়ন, উভয় ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে সঠিক তথ্য সংবাদ সংগ্রহ করে সাধারণ মানুষকে তা সরবরাহ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

চতুর্থত, উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণকে যুক্ত করার উদ্দেশও আরও কিছু সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভিনব যোগাযোগের মাধ্যম, গোষ্ঠী-ব্যবস্থা, সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা, দায়িত্ব সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং উপযুক্ত সমর্থক-ব্যবস্থা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চমত, একথা সুবিদিত যে, দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল অজ্ঞতা। এর থেকেই সৃষ্টি হয় অনীহা এবং ভাগ্যের ওপর নির্ভর করার প্রবনতা। আর এ সবই হ'ল উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। সেইজন্যই অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়াবার উদ্দেশ্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাঞ্ছিত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইভাবে নির্ভরশীলতার অবাঞ্ছিত প্রভাবকে দূর করা সম্ভব হবে।

সবশেষে বলা যায় উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনসাধারণকে যুক্ত করার আরও কয়েকটি উপায় আছে। নীতিগত ও আইনগত সমর্থন, অংগ্রহণের মূল্যায়ণ, বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ ইত্যাদি অংশগ্রহণকে দ্রুততর করতে সহায়তা করে। সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যৌথভাবে অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে হবে। সেইসঙ্গে ইতিমধ্যে যে সব পদ্ধতি রয়েছে সেগুলিকেও আরও কার্যকর করতে হবে। তবেই অংশগ্রহণ অধিকতর অর্থবহ হয়ে উঠবে।

অনুশীলনী ৩

১। অংশগ্রহণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক কি কি ? চারলাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

২। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের দু'টি উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

.....

.....

.....

৩। জনগণের অংশগ্রহণের স্তরকে উন্নীত করার তিনটি পদ্ধতি ছয় লাইনে বর্ণনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২৮.১০ সারাংশ

এই এককটিটে আমরা দেখলাম উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা অংশগ্রহণের নানাবিধ দিক নিয়েও আলোচনা করেছি, যেগুলি 'অংশগ্রহণ' শব্দটিকে বুঝতে সাহায্য করে। অবশেষে এই এককে আমরা বর্তমানে সীমিত অংশগ্রহণকে কিভাবে ব্যাপকতর করা যায় তার পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছি।

২৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Chambers R. 1983, Rural Development : Putting the Last First, London, Longman.
Freire, P, 1970, Pedagogy of the Oppressed, Newyork : The Seabury Press.

২৮.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। হ্যাঁ।

২। ক) উন্নত প্রযুক্তির অভাব।

খ) সম্পদের অভাব।

অনুশীলনী ২

১। অবদানমূলক অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং রূপায়ণে অংশগ্রহণ। বন্টনমূলক অংশগ্রহণের অর্থ হ'ল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুফল সম্পর্কে মূল্যায়ণে অংশগ্রহণ।

২। ক) স্থানীয় অধিবাসী।

খ) স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

গ) পদস্থ কর্মীবৃন্দ।

ঘ) বিদেশী বিশেষজ্ঞরা।

৩। ক) গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েত।

খ) শহরাঞ্চলের পৌর-প্রতিষ্ঠান।

অনুশীলনী ৩

১। অংশগ্রহণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হ'ল অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অশিক্ষা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্রের অনীহা, সংবাদ ও তথ্যের অভাব এবং সাংগঠনিক সমস্যা।

২। ক) পঞ্চায়েতী রাজ।

খ) সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৩। ক) আয় সৃষ্টিকারী শক্তিগুলি।

খ) উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যের যোগান।

গ) সম্পন্ন এবং শিক্ষিত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীলতা দূর করা।

একক ২৯ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান

গ ঠ ন

২৯.০ উদ্দেশ্য

২৯.১ প্রস্তাবনা

২৯.২ ভারতে নারীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা

২৯.৩ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থিতি সম্বন্ধে পুরাণকথা ও কল্পিত ধারণা

২৯.৩.১ নারীর দাসত্বসূচক অবস্থান

২৯.৩.২ সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংস্কারকগণ

২৯..৩.৩ সামাজিক সমস্যাবলী এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

২৯.৪ নারীর শিক্ষাগত অবস্থান

২৯.৪.১ নারী শিক্ষার হার

২৯.৪.২ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকূল শক্তিসমূহ

২৯.৪.৩ নারী ও উচ্চশিক্ষা

২৯.৫ নারী ও অর্থনীতি

২৯.৫.১ নারী এবং কর্মনিযুক্তি

২৯.৫.২ নারীর কর্মনিযুক্তির সামাজিক রূপ

২৯.৫.৩ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীকর্মী

২৯.৬ নারীর সামাজিক অবস্থিতি

২৯.৬.১ পরিবার ও নারীর অবস্থান

২৯.৬.২ নারী ও বিবাহ

২৯.৬.৩ নারী ও অসম লিঙ্গানুপাত

২৯.৭ মর্যাদার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর পরিবর্তিত অবস্থান

২৯.৭.১ আইনগত পদক্ষেপসমূহ

২৯.৭.২ সরকারী ব্যবস্থা

২৯.৮ নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলন

২৯.৮.১ প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির পুরুজ্জীবন

২৯.৮.২ নারী সম্পর্কে পাঠক্রম ঃ গবেষণার বিষয়

২৯.৯ সারাংশ

২৯.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২৯.১১ উত্তরমালা

২৯.০ উদ্দেশ্য

এই বিষয় বিভাগটি পড়ে আপনার পক্ষে যা করা সম্ভব ঃ

- ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থিতি সম্বন্ধে বর্ণনা করা।
- নারীর অধিকার এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাঁরা যেসব সুযোগ পান সে বিষয়ে আলোচনা করা।
- সমাজে নারীর অবস্থান উন্নত করতে যে সব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা।
- ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ক অতিকথা এবং বাস্তব সত্য।
- ভারতীয় নারীর শিক্ষাগত এবং কর্মনিযুক্তিগত অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া।
- নারী সংগঠন এবং নারী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া।

২৯.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান পাঠ্যসূচীর 'একক'-এ আমরা ভারতীয় সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থিতি এবং তাদের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধান করতে চাই। এই অনুসন্ধানের কাজে অঅমরা ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান সম্বন্ধে পৌরাণিক কিছু অতিকথার অসারত্ব প্রমাণ করব এবং সেই সঙ্গে আমাদের সমাজে নারীর উন্নয়ন কি ভাবে ব্যাহত হচ্ছে, সে কথাও বলব। এই 'একক'-এ আমরা আরো আলোচনা করব যে কি কি উপায়ে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীতে তাদের প্রকৃত অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছে এবং ভারতে নারীদের নিজস্ব সংগঠন ও আন্দোলনের মাধ্যমে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।

২৯.২ ভারতে নারীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা

এই অনুশীলনীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৎসত্ত্বেও, ভারতের সর্বশ্রেণীর নারী সম্বন্ধে ধারণামূলক একটি চিত্র উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধে আছে, কারণ এই উপমহাদেশীয় প্রেক্ষিতে নারীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা সমরূপ নয়। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, পারিবারিক কাঠামো, জাতি, শ্রেণী, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি অনুযায়ী মর্যাদার রূপ ভিন্নতর হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, আমাদের সঠিকভাবে স্থির করতে হবে যে আমরা কাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইছি। গ্রামীণ, না শহরাঞ্চলের মহিলা, মধ্যবিত্ত না নিম্নবিত্তের মহিলা, ব্রহ্মণ না তপশিলী সম্প্রদায়ের মহিলা, হিন্দু না মুসলিম সমাজের মহিলা। কারণ নারীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আর্থ-সামাজিক ও ধর্মসংস্কৃতিগত পার্থক্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও, অল্প পরিসরের সীমবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা শহরাঞ্চলের নারীদের সম্পর্কে সম্ভবপর একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

সমাজ-নিরপেক্ষভাবে নারীর মর্যাদার বিষটি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থা,

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং সমাজের ভাবাদর্শ নারীর মর্যাদার বিষয়টি প্রভাবিত করে। এছাড়া, তাদের সম্পর্কে তাদের সমাজে অনুমোদিত নিয়মাবলী ও মূল্যবোধ মযাদার ভিত্তি তৈরী করে থাকে। অনেক নির্দেশবলী, অনুমোদন ও বিধিনিষেধ নারীর ক্ষেত্রে সমাজে বর্তমান যা কিনা পরিবারের বৃত্তের ভিতরে এবং বাইরে তাদের আচার-আচরণ ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে, নির্ধারণ করে। সমাজ আশা করে যে, একটি মেয়ে নম্র, শিষ্ট হবে; স্বর্থপর হবে না;ক্রোধ পরায়ণ হবে না। তার গতিবিধির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল পেরোলেই সাধারণভাবে ছেলেদের সঙ্গে তার মেশামিশি কমে আসছে এবং এটাতেই অনুমোদিত আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়। তার সম্বন্ধে আরো বলা হয়ে থাকে যে, তার চলাফেরা শান্ত, সংযত হবে, এবং বিবাহকে অবশ্য পালনীয় মনে করতে হবে। বিবাহ তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। এ ধরনের সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশী জানি এবং এ সম্বন্ধে পরে বিস্তরিত আলোচনা করা হবে।

২৯.৩ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থিতি সম্বন্ধে পুরাণকথা ও কল্পিত ধারণা

আপনি এমন বহুলোকের সংস্পর্শে এসেছেন যাঁরা আপনাকে বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজে নারী শক্তিরূপে পূজিতা হন। সুতরাং নারীকে সম্মান করা অতি অবশ্য কর্তব্য। শুধু সম্মান নয়, নারীকে সম্ভ্রম এবং ভয়ও করতে হবে। ভারতের প্রাচীন ঋষি মনু বলেছেন 'যেখানে নারীকে সম্মান করা,হয় সেখানে দেবতারা অবস্থান করেন'। আমরা যদি আমাদের দেবদেবীদের প্রতি দৃষ্টি দিই তাহলে দেখব যে, প্রতিটি দেব-ই পূজিত হন তাঁর দেবীর সঙ্গে, যথা — শিব পার্বতীর, রাম সীতার, নারায়ণ অথবা বিষ্ণু লক্ষ্মীর, কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে পূজীত হন। এছাড়া, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মত দেবী আছেন যাঁরা নিজেদের অধিকারেই পূজিতা হন।

দেবদেবীর কথা বাদ দিয়েও প্রতিদিনের জীবনে আমরা নারীর শক্তির অন্য রূপায়ন দেখতে পাই। আমরা মা ও সন্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানি। মমতা ও প্রতিপালন সংক্রান্ত মাতৃত্বের কোমল অনুভূতিগুলি নারীর আদর্শ রূপে চিহ্নিত। মা যে পুরুষের প্রেরণার উৎস এ দৃষ্টান্ত পৃথিবী বহু দেশেই দেখা গেছে, ভারতীয় সমাজেও। কিন্তু পৌরাণিক অতিকথা ও এধরণের সামাজিক রূপকথার ফলে নারী শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে দুর্বল, গৃহমুখী এক প্রাণীতে। তাকে শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে এবং নারীসুলভ মনমোহিনীতে তার ক্ষমতা; শক্তির ব্যবহার হয় পুরুষকে আকৃষ্ট করতে। কিন্তু এসব পৌরাণিক অতিকথা ও সামাজিক রূপকথা সমাজে বাস্তব নয় সে সম্বন্ধে আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারব।

২৯.৩.১ নারীর দাসত্বসূচক অবস্থান

তাহলে, বাস্তব অবস্থাটি কী? বাস্তব অবস্থাটি জানতে হ'লে সমাজের দিকে আমাদের পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরতে হবে। অনুপুঙ্ক্ষ ভবে অনুধাবন করতে হবে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন, লোককথা, সুপরিচিত আদর্শমূলক পুঁথি পুস্তকগুলি। তাহলেই দেখা যাবে যে, 'নারী শক্তির আধার' এই পৌরাণিক অতিকথাটি কত অসার, কত মিথ্যা। এখানে কবি তুলসীদাসের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। তুলসীদাস বলেছেন, "একটি পশু, একজন গ্রামীন মানুষ, একটি ড্রাম (বাদ্যযন্ত্র) এবং একজন স্ত্রীলোককে বাজিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।" মনু, যাঁর কাছে নারী দেবীজ্ঞানে পূজ্য, বলেন, "নারীর স্বাতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। নারীকে রক্ষা করবেন, যথাক্রমে, পিতা, স্বামী ও পুত্র। প্রচলিত লোককথায় ধরিত্রী/শস্যক্ষেত্র এবং বীজ বিশেষ ইঙ্গিতবহ। জন্মদাতা পিতার প্রতীক বীজ এবং শস্যক্ষেত্র, মায়ের। এখানে জন্মদাতা হিসেবে পিতার বীজের অবদানটি সূচিত করছে এবং বীজ-ই শিশুর পরিচয় বহন করে। অথচ বাস্তব প্রজনন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উভয়েই ভূমিকাই যে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার স্বীকৃতি থাকে না। প্রচলিত গল্পকথায় প্রজনন ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাটি-

ই অধিকতর গুরুত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়। নারীকে গৌণ ও দুর্বল, শক্তিহীন করে দেখবার এইসব কৌশল বর্তমান। কিন্তু আমরা চিন্তা করে দেখিনা বা দেখতে চাই না যে নারীর এই দুর্বল রূপটি সমাজেরই সৃষ্ট। কারণ নারীকে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে হয় এবং সেই কাজে তারা শস্যক্ষেত্রে জল-কাদার মধ্যে সুদীর্ঘ দশ ঘন্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে একটানা কাজ করে যায়। দুর্বল হ'লে নিশ্চয়ই তারা এই শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারত না। আবার যখন দেখা যায় কোন মহিলা মাথায় ভারী কাঠের বোঝা নিয়ে চলেছেন, তখন তার শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে কি ? দুর্বল মনে হয় তাকে ? কী শর্সক্ষেত্রে, কী অন্য কাজের জায়গায় মহিলারা ছয় থেকে আট ঘন্টা কাজ করে। দুর্বল, শক্তিহীন হলে দিনের পর দিন এই একটানা পরিশ্রম করা তাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হত না। সুতরাং, নারীর শক্তি সম্বন্ধে গল্প ও বাস্তবের ফারাক সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। নারী সম্বন্ধে আরো কিছু কল্পিত ধারণা বর্তমান। একথা বলা হয়ে থাকে যে, পুরুষরাই পরিবারের অন্নদাতা। তারা বাড়ীর বাইরে গিয়ে রোজগার করে এবং নারী বাড়ীর বৃত্তেই অবস্থান করে; রোজগারের জন্য বাড়ীর বাইরে যায়না। এ ধারণা সর্বৈব ভুল। সমাজে, খুব অল্পসংখ্যক উচ্চকোটি ও উচ্চবিত্তের মেয়েরা ছাড়া, অধিকাংশ মেয়েরাই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। পরিবারের পুরুষ ও নারী উভয়ের রোজগারের সংসার চালান হয়। বর্তমান সময়ে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশের ১৩ শতাংশ পরিবার নারী দ্বারা পরিচালিত। এদের মধ্যে বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা সব ধরণের মহিলাই আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী বর্তমান থাকা সত্বেও স্ত্রী-কেই সংসার প্রতিপালন করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু পুরুষেরা চাকরি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে চলে যায় এবং বিদেশেই থিতু হয়। তখন স্বদেশেস্থিত পরিবারের পালনপোষণ মহিলাদের উপরই বর্তায়। এক্ষেত্রে পুরুষই অন্নদাতা, পুরুষের রোজগারেই সংসার প্রতিপালিত হয়, মেয়েরা ভোক্তা মাত্র, এ ধরণের কল্পিত ধারণার অবকাশ আর নেই।

নারী সম্বন্ধে আরো একটি কল্পিত বা গালগল্পের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। সমাজে যৌন অত্যাচার এবং ধর্ষণের শিকার হয় মেয়েরা, একথা সকলেরই জানা আছে এবং এটাও জানা আছে যে, সব ক্ষেত্রে মেয়েদেরই উপরই দোষারোপ করা হয়ে থাকে এই বলে যে তারা পুরুষের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে, হয় হাবেভাবে আর নয়ত তাদের পোষাক পরিচ্ছদের মাধম্যে। এখানে সঙ্গতভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। একটি সাত বছরের মেয়ে ষাট বছরের একজন বৃদ্ধ দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে, এমন ঘটনা বর্তমান। এক্ষেত্রে, সাত বছরের মেয়েটি কি যৌন উত্তেজনামূলক আচরণে অপরাধী ? আবার যখন শোনা যায় এবং জানা যায় যে, পুলিশের হেফাজত অর্থাৎ থানায় কোন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে, তখন মহিলাটি কি যৌন উত্তেজক আচরণ করেছিল ? নারীর অবস্থান ভারতীয় সমাজে উচ্চে এবং সুদৃঢ় এই কল্পনার সঙ্গে বধূহত্যার মত বাস্তবের সঙ্গতি কোথায় ? বধূনির্যাতন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, যৌনলাঞ্ছনা নিয়মিত বাস্তব প্রেক্ষিতে সমাজে নারীর উচ্চস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভবপর হয়না।

নারীর স্থিতি সম্বন্ধে কল্পনা ও বাস্তবের চিত্রটি স্পষ্ট বোঝা যাবে যদি আমরা নারীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করি। সাধারণভাবে রাষ্ট্র, পরিবার, ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ, রাজনীতি ও কাজের জগতে বিভিন্ন ধরণের বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার নারী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানাধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। বহু শতাব্দের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী এমন এক সামাজিক কাঠামোর সৃষ্টি করেছে যেখানে নারীর স্থিতি সম্বন্ধে 'কল্পিত' ধারণার থেকে বাস্তব অবস্থা বহুগুণে করুণ ও ভয়াবহ; শোষণ, নিপীড়ন অব্যাহত। নীচের তালিকা থেকে নারীর বাস্তব অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ (সারা ভারতে)

অপরাধের প্রকৃতি	সাল					%থেকে '৮৯ থেকে '৯০
	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	
ধর্ষণ	৯,১৫০	৯,৫১৮	৯,৭৯৩	১১,১১২	১১,২৪২	২২.৯%
অপহরণ	১১,৬৭৩	১১,৬৯৯	১২,৩০০	১২,০৭৭	১১,৮০৭	১.৪%
যৌতুকের জন্য বধূহত্যা	৪,২১৫	৪,৮৩৬	৫,১৫৭	৪,৯৬২	৫,৮১৭	৩৮.০%
নির্যাতন	১১,৬০৩	১৩,৪৫০	১৫,১৪৯	১৯,৭০৫	২২,০৬৪	৯০.২%
শ্লীলতাহানি	২০,৪৯৭	২০,১৯৮	২০,৬১১	২০,৩৮৫	২০,৯৮৫	২.৪%
ইভটিজিং	৯,৯৩৪	৪,৬২০	১০,২৮৩	১০,৭৫১	১২,০০৯	২০.৯%
মোট	৬৭,০৭২	৬৮,৩১৭	৭৪,০৯৩	৭৯,০৩৭	৮৩,৯৫৪	২৫.৯%

১৯৯৪ সালে ভারতে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার মোট সংখ্যা ছিল ৮২,৮১৮। (সূত্র ঃ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো)

১৯৯০-৯৪ সালের মধ্যে শিশুধর্ষণের ঘটনা সারা ভারতে বেড়েছে ৮০ । এসব পরিসংখ্যান থেকে আমরা খুব সহজেই এই সিদ্ধান্ত পৌঁছতে পারি যে, নারীর স্থিতির কাল্পনিক আখ্যান ও বাস্তব এক নয়। উপরের পরিসংখ্যান আরো সংক্ষিপ্ত করে বলা যায় যে ভারতে

প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি করে ধর্ষণ হচ্ছে
প্রতি ২৬ মিনিটে একটি করে শ্লীতাহানির ঘটনা ঘটছে
প্রতি ৪৩ মিনিটে একটি করে অপহরণ হচ্ছে
প্রতি ৯০ মিনিটে একটি করে বধূহত্যা হচ্ছে
প্রতি ৩৩ মিনিটে একটি করে নারী নিগৃহীতা হচ্ছে
প্রতি ৭ মিনিটে একটি করে নারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধ ঘটেছে

২৯.৩.২ সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংস্কারকগণ

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর বাস্তব অবস্থা কি ? এ বিষয়টি পর্যালোচনা করার আগে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে — 'কেন আমরা সাম্প্রতিক কালে নারীর অবস্থান সম্বন্ধে এত ঔৎসুক্য দেখাচ্ছি ? এই ঔৎসুক্য কিন্তু একান্ত সাম্প্রতিক নয়। ঊনবিংশ শতাব্দতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে (এখনকার রাজ্য) বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকগণ মুক্ত ভাবধারার আবহে এবং বুদ্ধির মুক্তির সূত্রে স্ত্রী-পরুষের সামাজিক সমতার প্রশ্নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সহমরণ-এর মত নিষ্ঠুর ধর্মীয় সামাজিক প্রথা তাঁদের ব্যথিত ও বিচলিত করেছিল। এক পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায়, বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, স্বামীর মৃত্যুতে একাধিক স্ত্রী-কে সহমরণ বরণ করতে হ'ত। ১৭৯৯ সালে শতাধিক বিবাহের জনৈক স্বামীর মৃত্যুতে ৩৭ জন বিধবা সহমৃতা হন। তিন দিন ধরে চিতা প্রজ্জলিত রাখতে হয়েছিল। ১৮০৩-১৮০৪ সালে শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরী-র তত্ত্বাবধানে সতীদাহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। সমকালীন সময়ে রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মনীষীদের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে এই জঘন্য প্রথা বিলোপের ব্যবস্থা হয়। কুলীন প্রথা বা বহুপত্নীত্ব প্রথাও অপসারিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিবাহের অনুমোদন সূচক আইন

পাশ হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর "স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক" রচনাটির মাধমে এদেশে নারীর শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসে অগ্রণী হন। এসব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ছাড়াও অজস্র সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকা নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে গভীর ঔৎসুক্য ও আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৬-১২-১৮৩৭ তারিখের "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকায় আমরা একটি উল্লেখনীয় রচনা পাই ঃ

"জগদীশ্বর স্ত্রী-পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত কখনও মনে করেন নাই যে
একজন অন্যজনের দাস হইবে কিংবা একজন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য
করিবে। ..... কিন্তু মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃঙ্খল হইয়াছে,
ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে।"

ফলে, এদেশের নারীর শিক্ষার বিষয়টি এসব সমাজ-সংস্কারকদের মনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং এরই সূত্রে ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। মহিলারা কিন্তু জড় পুতুলের মত অবস্থায় ছিল না। সমাজ-সংস্কারের ঢেউ তাদের হৃদয়ের তটেও অল্পবিস্তর আঘাত করেছিল। এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় "চুচুড়া নিবাসী স্ত্রীগণস্য" স্বাক্ষরিত ১৮৩৫ সালের ১৫ই মার্চে লেখা এক সংবাদপত্রের চিঠিতে। মহিলাদের ছয়টি দাবী ছিল ঃ

১। সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের ন্যায় বিদ্যাধ্যয়নের অধিকার,
২। স্বচ্ছন্দভাবে অন্যদেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয়,
৩। বলদ বা অচেতন দ্রব্যের ন্যায় হস্তান্তরিত না হওয়া,
৪। কন্যা বিক্রয় বন্ধ করা,
৫। বহুবিবাহ রহিত করা,
৬। বিধবার পুনর্বিবাহ

বেথুন বালিকা বিদ্যালয় কলকাতা শহরের স্থাপিত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের মহিলারাও যাতে শিক্ষার আলো পান সেজন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশেষ উদ্যোগ নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলার গ্রামাঞ্চলে সহস্রাধিক মহিলা বিদ্যালয়ের পত্তন হয়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারগণ, যথা মহারাষ্ট্রে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গোপাল হরি দেশমুখ এরফে "লোকহিতবাদী", জ্যোতিবা ফুলে প্রভৃতি ধর্ম ও জাতপাতের উর্দ্ধে উঠে নারীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। "প্রার্থনা সভা", "মানবধর্ম সভা", "সত্যশোধক সমাজ" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এঁরা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী ছিলেন। উত্তর ভারতের দয়ানন্দ সরস্বতীও সমাজ-সংস্কারে তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এসব সমাজ-সংস্কারে এদেশীয় নারীজাতির অবস্থার উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধি অন্যতম লক্ষ্য ছিল এঁদের। শুধু সতীপ্রথা নিবারণ, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাদের পুনর্বিবাহ এধরণের আইন প্রণয়নে সহায়তা করেই এঁরা এঁদের কাজ শেষ করেননি। নারী শিক্ষার বিষয়টি এঁদের সমাজ-সংস্কার কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার পায়। ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন বা The Age of Cousent Bill পাশ হয়। এই আইনে বিবাহিতা মেয়েদের সহবাসের বয়স ১০ থেকে ১২-তে উন্নীত করা হয়।

সমাজ-সংস্কারকদের এই বিভিন্ন প্রয়াসের ফলে এদেশের মহিলারাও নিজেদের নব মূল্যায়ণে আগ্রহী হন। তাঁরা উপলব্ধি করেন নিজেদের Caged Bird বা খাঁচাবদ্ধ বিহঙ্গের অবস্থাটি। ফলে কলকাতায় স্থাপিত ১৮৪৯-এর বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পর বাংলার গ্রামগঞ্জেও শিক্ষার আগ্রহ বাড়তে থাকে। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত

বিভিন্ন সভাসমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। গত শতকের অতি বিখ্যাত "বামাবোধিনী পত্রিকা"-র মতে ১৮৭০ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে বাংলার মফঃস্বল শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের দ্বারা বহু সভাসমিতি স্থাপিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকটি সভা-সমিতি যথা, বরিশাল ফিমেল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, দ্য সিলেট সম্মিলনী, দ্য বিক্রমপুর সমিমিলনী সভা, ফরিদপুর সুহৃদ সভা, বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী সভা, দ্য যশোর-খুলনা ইউনিয়ন, টাকি হিতকারী সভা, শ্রীরামপুর হিতসাধিনী সভা, বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। কলকাতার বাইরে মফঃস্বল এলাকার এসব সভাসমিতি নারীজাগরণ ও নারী উন্নয়নের সহায়ক হয়েছিল। এসব এলাকার শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা কীভাবে সুদূরপ্রসারী ফল দিয়েছিল সে সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করছি।

কলকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতেই বাংলার শহরাঞ্চলে মহিলাদের শিক্ষার আগ্রহ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে, বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে তাঁরা উচ্চতর শিক্ষার দিকে যেমন, চিকিৎসা-বিদ্যায় ঝুঁকে পড়লেন। এইভাবে শহরাঞ্চলে কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ইত্যাদি স্থানে — একটি মহিলা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর প্রতিষ্ঠা হলে এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর কিছু মহিলা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু এঁরা সকলেই উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের মহিলা ছিলেন।

১৯১৪-১৯১৭ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের একটি মাইল ফলক। ভারতেরও এ যুদ্ধের ফলে প্রভূত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধ শেষ হবার অব্যহিত পরেই অর্থনৈতিক কারণে বহু নারীকে পারিবারিক ও সামাজিক অবরোধ উপেক্ষা করে অর্থোপার্জনের ভূমিকায় নামতে হয়। নারীর অবগণ্ঠন মুক্তির ক্ষেত্রে ওই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মোনহদাস করমচাঁদ গান্ধীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতীয় নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হবার উদাত্ত আহ্বান জানানো। এ ঘটনা ১৯২০ সালের পরবর্তী সময়ে। ফলে, শহরে, নগরে, গ্রামে, গঞ্জে সাড়া পড়ে যায় মেয়েদের মধ্যে দেশের জন্য 'কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান'। আমরা আগেই জেনেছি যে, কলকাতার বাইরে বাংলার মফঃস্বল শহরে, গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও আত্মনির্ভররতার প্রদীপ জ্বলেছিল মৃদুভাবে। এবার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর-র উদাত্ত আহ্বানে সে প্রদীপের শিখা ঊর্ধগামী হ'ল। মাঠে ময়দানে বেরিয়ে এল তারা ঘোমটা, বোরখা ছেড়ে, নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে। লবণ সত্যগ্রহে অংশগ্রহণ করে, উগ্রপন্থী আন্দোলনে সামিল হয়ে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। অজস্র প্রাণের বিনিময়ে তারা অর্জন করেছিলেন এ দুর্লভ সম্মান।

দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান চালু হ'ল ১৯৫০ সালে। সেই সংবিধানে আমরা পেলাম পুরুষ ও নারীর সমতার অঙ্গীকার। এই সমতার কথা কিভাবে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জেনে রাখা ভাল। সংবিধানে ১৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতের ভূখণ্ডে রাষ্ট্র আইনানুগ ভাবে কোন ব্যাক্তির সমতা খর্ব করবে না। ১৫(৩) ধারায় নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন আছে। ১৬(১) ধারা অনুযায়ী সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯ ধারা সকল নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। ২১ ধারায় আমরা পাই প্রতিটি মানুষের জীবনের অর্থাৎ বেঁচে থাকার অধিকার। ২৩ ধারায় সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার। ৩৯(খ) ধারা অনুযায়ী পুরুষ ও নারীকে সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি মালিককে কাজের মানবিক শর্তাবলী পূরণ ও প্রসূতিদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সুনিশ্চিৎ করতে হবে।

৫১(ক) ধারায় একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হ'ল নারীর মর্যাদার পরিপন্থী যে কোন আচরণ থেকে বিরত থাকা প্রাথমিকভাবে ভারীতয় সংবিধানে নারীর সমতা সম্বন্ধে এধরণের ব্যবস্থা ছিল। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকে এবং ভারতের আধুনিকীকরণে নারীর অংশগ্রহণকে কেন্দ্রে করে সংবিধানে নতুন ধারা সংযোজিত হচ্ছে; সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হারীর পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমতা সম্বন্ধে এসব ধারা সংযোজনের ফলে সাধারণ মানুষের মনে, বিশেষ করে নারীদের মনে, একটি অত্রশার সঞ্চার হয়েছিল যে যুগাতিযুগের বৈষম্য, অবরোধ, অবনমন, লাঞ্ছনার দিন বুঝি শেষ হতে চলেছে নারীর ক্ষেত্রে। তাছাড়া, সরকারী কাজে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নারীদের নিয়োগ, যেম, রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রাজ্যপাল হিসেবে সরোজিনী নাইডু, সাংসদ হিসেবে রেণু চক্রবর্তী, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সিসেবে রাজকুমারী অমৃত কাউর, ফুলরেণু গুহ প্রমুখ নারীদের কিছুটা হয়ত বিভ্রান্তও করেছিল যে তাদের অগ্রগতির পথে আর কোন বাধা থাকল না; নিষ্কটক হ'ল পথ। দীর্ঘদিন ধরে তারা যে সংগ্রাম করে এসেছে, আন্দোলন চালিয়েছে, তার বুঝি আর প্রয়োজন নেই। সংবিধানের মাধ্যমে সব মুস্কল আসান হবে। বিদেশের মহিলাদের মত ভারতের মহিলাদের আর ঝাণ্ডা বহন করতে হবে না পথে পথে।

কিন্তু ১৯৭৪ সালে Towards Equality বা সমতার লক্ষ্যে এই ষ্টেটাস রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে আমাদের দেশে নারীরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। ভারতের নারীর অবস্থিতি বা নর্যাদা সম্বন্ধে এটি একটি প্রামাণ্য দলিল। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

২৯.৩.৩ সামাজিক সমস্যাবলী এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

গত অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ভারতে নারীর অবস্থিতির বিষয়টি নিয়ে এদেশে মানুষের মধ্যে, নারীদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান ছিল। দেশবাসী মনে করেছে যে, ভারতীয় সংবিধান চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি পুরুষ ও নারীর মধ্যে অতীতের বৈষম্য, বঞ্চনার অবসান হবে। কার্যত দেখা গেল যে, বৈষম্য, বঞ্চনার অবসান দূরের কথা, নারী সম্বন্ধে নতুন করে হচ্ছে। আদিবাসী ও তপশিলীজাতিভুক্ত নারীদের নিগ্রহ শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। কি অর্থনৈতিকভাবে, কি শারীরিকভাবে তারা উচ্চবর্ণের মানুষের নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অবধি নেই। এই পরিস্থিতিতে ভারতে নারীর সঠিক অবস্থান মূল্যায়নের জন্য ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কামিটিকর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা ফুলরেণু গুহ। দীর্ঘ পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর সারা ভারতে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারীর অবস্থিতি বিষয়ক Towards Equality বা "সমতার লক্ষ্যে" শীর্ষক দলিলটি ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৫ সালে সংসদে দাখিল করা হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালটি 'আন্তর্জার্তিক মহিলা বৎসর' হিসেবেও চিহ্নিত। 'আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসর' সম্বন্ধে একটু পরেও বিশদ আলোচনা করা হবে। "সমতার লক্ষে" দলিলটি সংসদে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সারাভারতে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কারণ ঐ দলিলে পরিবেশিত তথ্যাদি সম্বন্ধে দেশের জনগণ একেবারেই অবহিত ছিল না। তারা এতাবৎকাল "মুর্খের স্বর্গে" বাস করেছে চোখ কান বন্ধ করে। ফলে, নারীদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ, নিপীড়নের সমস্ত কাহিনী, তথ্য তাদের অগোচরেই থেকে গেছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এ সম্বন্ধে তারা কোন খোঁজ খবর নেবার ঔৎসুক্য বা দায়িত্ব বোধ করেনি। "সমতার লক্ষ্যে" দলিলটি দেশবাসীকে দীর্ঘদিনের আয়েসী নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিল। ১৯৭৫ সাল থেকেই শুরু হ'ল

এদেশে নারীর অবস্থিতির মূল্যায়ণের নতুন পর্ব। এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাইল ফলক। ১৯৭৫ সালটি আর্ন্তজাতিক নারীবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় ভারতে নারীর এই নবমূল্যায়ণ প্রচেষ্টা একটা নতুন মাত্রা পেল, জোর বাড়ল এই প্রয়াসের।

এখন আমরা 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' ১৯৭৫ যা কিনা আন্তর্জাতিক নারী দশক ২০০-এ প্রসারিত হয়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। ভারতের মত এত তীব্র, তীক্ষ্ণ না হলেও, পৃথিবীর সবদেশেই, কি উন্নত, কি উন্নতিশীল সমাজে নারীর অবস্থিতি নিম্নমানের। দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ইউরোপের মহিলারা তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে অবিরল সংগ্রাম করে চলেছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে তাদের এই সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফরাসী বিপ্লবে "আঁসিয়ান রেজিম" বা সনাতনী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে জনগণ ফরাসী পার্লামেন্টের কাছে তাদের স্বাধীনতার সনদ "Declaration of the Rights of Man" পেশ করে। এই সনদে নারীর দাবীদাওয়া সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে ফরাসী বিপ্লব সফল করতে নারীদের অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। উপরোক্ত সনদ শুধুমাত্র পুরুষদের সনদ এই অভিযোগ তুলে ফরাসী বিপ্লবের কিছু নায়িকা তৈরী করল তাদের "Declaration of the Right of Woman" এবং ফরাসী পার্লামেন্টে পেশ করতে প্রয়াসী হ'ল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল ওলিম্পিয়া গুজে। কিন্তু মহিলাদের এই আবেদন ফরাসী পার্লামেন্ট গ্রহণ করা দূরে থাক, নেত্রীবৃন্দকে জেলবন্দী করে, অমানুষিক নির্যাতন ক'রে তাদের জীবনান্ত করে। কিন্তু ইতিহাস মনে রেখেছে এদের এবং এদেরই অনুপ্রেরণায় ইংলণ্ডে নারীদের। দাবীদাওয়া সম্বন্ধে আন্দোলনকারী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মেরী ওলষ্টোন ক্রাফ্‌ট্। ইংলণ্ডে নারীদের। দাবীদাওয়া সম্বন্ধে কেন আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল এ কথা জানতে ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক বলে কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে এখানে। রাজনীতির ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডে মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না; তারা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে পারত না; কোন সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা হ'ত না তাদের; তারা কোন রাজনৈতিক সংগঠনে অথবা কোন রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দিতে পারতে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না; কোন ব্যবসায়ে যুক্ত থাকতে পারত না; ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারত না; নিজেদের নামে কোন ঋণ নিতে পারত না। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোন আইনী সত্তা ছিল না, আইনের দৃষ্টিতে তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু বলে গণ্য করা হত। আইনের দৃষ্টিতে তারা ছিল নিম্নমানের সাক্ষী; ডিভোর্স করার অধিকারও তাদের দেওয়া হ'ত না; শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল চরম বৈষম্য, প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডী পেরোনো তাদরে ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল। অথচ, বিগত দুই আড়াই শতকে ইংলণ্ডে মানবাধিকার অর্জনের সূত্রে অনেক আন্দোলন হয়েছে।

এই বি-সম পরিস্থিতিতে ইওরোপের নারীরা সমতার লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন অক্লান্ত ভাবে চালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং তা' ইওরোপের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমতার অনুপ্রেণা জোরদারভাবে এসেছে পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যেখানে নারী ও পুরুষের অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমতার লক্ষ্যে, নারীবিদ্বেষহীন সমাজগঠনের লক্ষ্যে সারা পৃথিবীর নারী এবার একাত্ম হ'ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল ১৯৪৮ সালে ইউনাইটেড নেশনস্ কর্তৃক গৃহীত Declaration of Universal Human Rights অর্থাৎ সারা বিশ্বজনীন মানবিক অধিকারের সনদ। এই সনদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংযোজন হ'ল CEDAW (CONVENTION FOR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) অর্থাৎ নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সমঝোতা। রাষ্ট্রপুঞ্জের এসব ব্যবস্থার সূত্র ধরে সারা পৃথিবীতে নারী আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হয়ে ওঠে এবং নাইরোবি (আফ্রিকা)-র মহিলা সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং নারীর অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্নে সারা বিশ্বের মহিলারা অন্দোলন করে যাবে এবং ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ও ১৯৭৫-২০০০ সাল পর্যন্ত

সময়কে নারীদশক হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এই জাগরণ, এই আন্দোলনের ঢেউ ভারতে এসে পৌঁছয় এবং বেসরকারী, সরকারী সমস্ত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে জেগে ওঠে এবং কর্মসূচীগ্রহণ করে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী আন্দোলন অব্যাহত আছে এবং ব্যাপকতর আকার ধারণ করছে। ১৯৯৫ সালে সমাজতন্ত্রী চিন-এর পেইচিং শহরে চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে উদার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর সামিল হতে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ।

অনুশীলনী ১

১। সমাজে নারীদের অবস্থিতি সম্পর্কে যে কাল্পনিক ধারণা আছে তার সঙ্গে বাস্তবের যোগাযোগ কতটা? সাত লাইনে এই প্রশ্নের উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। উনবিংশ শতকের কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের নাম করুন যাঁরা সর্বপ্রথম এদেশে নারীর বি-সম অবস্থিতির প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। পাঁচ লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

৩। ভারতীয় নারীর অবস্থিতি সম্বন্ধে আশাবাদ ও আত্মতুষ্টি কিভাবে সাম্প্রাতিককালে বিনষ্ট হয়েছে? কারণ বিশ্লেষণ করে ছয় লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২৯.৪ নারীর শিক্ষাগত অবস্থান

"Towards Equality" বা সমতার লক্ষ্যে দলিলটি প্রকাশিত এবং সাংসদে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিত অবস্থিত নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা ও গবেষণা শুরু হয়ে যায়। এদিকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষার অগ্রণী ভূমিকা ও শিক্ষায় নারীদের ব্যপকভাবে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে শতাব্দব্যাপী যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত পরিবেশ ও মানসিকতা বর্তমান ছিল তার অবসান করা প্রয়োজন একথা সর্বসাধারণে স্বীকৃত হ'তে শুরু হ'ল। উনিশ শতকে অবশ্য ভবিষৎদৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ-সংস্কারকেরা নারীর শিক্ষার বিষয়েঅগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের প্রযত্নে বহু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ স্থাপিত হয়েছিল যা কিনা শুধুমাত্র শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্যোগী ছিল। "লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে"—এই অসত্য ধারণাটি মেয়েদের মধ্যেও বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সমাজ-সংস্কাবকদের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মেয়েরা ক্রমে ক্রমে এই অসাড় ভাবধারা থেকে মুক্ত হতে আরম্ভ করে। এছাড়া শিক্ষার যে একটা অর্থনীতিগত মূল্য আছে সে সম্বন্ধে তারা ধীরে ধীরে সজাগ হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বিশ্বব্যাপী মন্দা-র কারণে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট সংকট এসে পড়ে। কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই, সরকারী কর্মচারীদের বেতন থেকে দশ থেকে পনের শতাংশ কাটা ইত্যাদির ফলে দেশে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষিত মহিলারা শিক্ষকতা ক্ষেত্রে কিছু চাকরী পায়। শিক্ষার এই আশু ফললাভে তারা উৎসাহিত বোধ করে, ব্যাপকতর সংখ্যায় শিক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। এই উদ্যোগে ছেদ পড়েনি এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন মহিলারা শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই নয়, উচ্চতর শিক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শিক্ষাগ্রহণ করছে এবং দেশের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এ শিক্ষা ফলপ্রসু হচ্ছে।

২৯.৪.১ নারী শিক্ষার হার

নারীর শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক্ষেত্রে তারা তেমন সিদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। সার্বজনীন শিক্ষা-র তো প্রশ্নই ওঠেনা। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতে সাক্ষর নারীর অনুপাত ছিল ৩৯.১৩ শতাংশ। এই অনুপাত অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার। কেরলে শতকরা ৭৩ জন নারী শিক্ষিত। এটি যেমন একটি দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা, অন্য কিছু রাজ্যে সাক্ষর নারীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ (সংক্ষেপে বিমারু) রাজ্যগুলিতে ১০-১২ শতাংশ নারী সাক্ষরতা অর্জন করেছে। রাজ্যগতভাবেই নয়, অঞ্চল, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীগতভাবেও নারীর সাক্ষরতার হার বিভিন্ন এবং নিম্নমানের। এছাড়া, জনসংখ্যার হার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষাজগৎ থেকে নারী তত বাদ পড়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ আদমসুমারীতে দেখা গেছে ৬-১১ বছরের মেয়েদের ৪৫ শতাংশ, ১২-১৪ বছরের মেয়েদের ৭৫ শতাংশ এবং ১৫-১৭ বছরের মেয়েদের ৮৫ শতাংশ "বিদ্যালয় ছুট" বা School Dropout অর্থাৎ তারা হয়ত কোন সময়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। প্রাথমিক স্তরের পড়াশুনা শেষ হবার আগেই ৫০ শতাংশ মেয়ে বিদ্যালয় ছুট হয় বা হতে বাধ্য হয়। তুলনামূলকভাবে, মাধ্যমিক পর্যায়ে যেখানে ছেলে পড়ুয়াদের অনুপাত ৬৩ শতাংশ মেয়ে পড়ুয়ারা মাত্র ৩৬ শতাংশ। ছেলে ও মেয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে এই ফারাক কিন্তু মেয়েদের কোন বুদ্ধিবৃত্তির অভাবজনিত কারণে নয়, কারণটা আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতিগত।

২৯.৪.২ নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকূল শক্তিসমূহ

একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষাসম্বন্ধে আগ্রহ থাকলেও আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতিগত কারণে মেয়েদের শিক্ষা ব্যাহত হয়ে থাকে। নিম্নবিত্ত ও গ্রামীন পরিবারে একটি কন্যা শিশুকে (৬-১১ বছর বয়স) সংসারে বহু কাজকর্ম করতে হয় যেমন, ছোট ভাইবোনদের আগলান, টিউবওয়েল অথবা পুকুর থেকে জল আনা, জ্বালানী সংগ্রহ, ঘরের

কাজে মাকে সাহায্য করা, পরিবারের অসুস্থ আত্মীয়দের দেখা শোনা করা ইত্যাদি। সরেজমিনে একটি সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নিম্নবিত্ত পরিবারের একটি মেয়েকে (৬-১১ বছর বয়সের) সকাল ৫টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত বিশটি বিভিন্ন ধরনের সাংসারিক কাজ করতে হয়। ফলে, তার স্কুলে যাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না। সাময়িকভাবে স্কুলে গেলেও তাকে আবার ঘরের কাজ করবার জন্য স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ভাবনাটা একটু অন্য রকম। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হবে কারণ সে বড় হয়ে বাবা, মা-র প্রতিপালন করবে। মেয়েদের সম্বন্ধে হীনমন্যতার একটি আবহ থাকায়, যা কিনা বিভিন্ন গ্রামীন প্রবাদে পরিস্ফুট ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাদের শিক্ষার বিষয়টি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ তুলে ধরা হচ্ছে। এসব থেকেই স্পষ্ট হবে যে সংসারে মেয়েরা কতটা আদৃত এবং কতটা বর্জনীয়।

১। সাতরাজার ধন ব্যাটা
মেয়ে গলার কাঁটা

২। মেয়ে হয়ে জন্ম নিলি
আঁতুড়েই কেন না মরলি!

৩। যার নাই মেয়ে
সে বড়লোক সবার চেয়ে।

৪। ব্যাটা করবে পড়াশুনা
মেয়ে শিখবে ঘরকন্না।

৫। ছেলের বেলায় রূপার থালা
মেয়ের বেলায় হেলাফেলা।

৬। কন্যা যাবে পরের ঘরে
মানুষ করব কি?

৭। ব্যাটার ঘরের নাতি
স্বর্গে দেবে বাতি।

৮। মেয়ে হলে আয়ু কমে
বাবা মা-কে টানে যমে।

পরিবারে, সমাজে মেয়েদের হীনাবস্থার চিত্র এসব প্রবাদে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মেয়েরা যে 'lesser child' এসব প্রবাদে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। জনকজননীর কাছেও কন্যাসন্তান আপন ঘরের নয়, পরের ঘরের। সুতরাং কন্যাসন্তান সম্বন্ধে তাদের দায়িত্ব ন্যূনতম। এ অবস্থায় পরিবারে মেয়েদের পড়াশুনার বিষয়টিও ন্যূনতম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বরং তারা যদি খন্ডকালীন কাজ করে যেমন, অন্যের বাড়ীতে ঘরমোছা, বাসন ধোওয়া ইত্যাদি, মা বাবাকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেটাই বেশী কাম্য হয় মা বাবার কাছে। তাছাড়া, বাল্য বিবাহ প্রথা মহা আড়ম্বরে বহাল থাকায় এবং দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদের চলাফেরা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় মেয়েরা স্কুলে যাওয়া অর্থাৎ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ীর কাছাকাছি স্কুল থাকে না। ৩/৪ মাইল পথ হেঁটে যেতে হয় স্কুলে পৌছতে। আবার বাড়ীর কাছাকাছি স্কুল যদি বা থাকে, শিক্ষিকার অভাবে ঐসব স্কুলে বাবা-মা মেয়েকে পাঠাতে অনিচ্ছুক হন, কিংবা স্কুলে মেয়েদের পাঠালেও, অতি শীঘ্র ছাড়িয়ে আনতে দ্বিধা করেন না। এসব বাস্তব প্রতিকূলতা ছাড়াও কিছু অন্য ধরণের প্রতিকূলতা বর্তমান। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত গল্পকাহিনীগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই ছেলেদের গুণকীর্তন ধর্মী হয়ে থাকে। পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ই পুরুষপ্রাধান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ত আরোপ করে মেয়েদের বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করে, যেমন বিজ্ঞানে মেয়েদের দক্ষতা ছেলেদের থেকে অনেকাংশে কম অথবা মেয়েরা গণিত শাস্ত্র বিমুখ

হয়। একমাত্র রান্নাঘরেই মেয়েদের বিকাশ সুচারুভাবে হতে পারে ইত্যাদি ধরনের গৎবাঁধা অভিমত মেয়েদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করান হয়। জ্ঞানের কোন ক্ষেত্রেই যে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে ন্যূন নয় তা নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুদীপ্তা সেনগুপ্তার দক্ষিণ মেরু অভিযান, কল্পনা চাওলার মহাশূন্যে পাড়ি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অসামান্য অবদান প্রমাণ করছে যে, মেয়েদের সম্বন্ধে সাবেক কালের গৎবাঁধা অভিমতের দিন শেষ হয়েছে। সুযোগ পেলে ও সহায়তা পেলে মেয়েরা নিশ্চিতভাবে সমান শিক্ষার সুব্যবহার করতে পারে এবং সফল হয়। স্কুলে কলেজের পাঠ্যবস্তুতে মেয়েদের সম্বন্ধে যেসব কাল্পনিক এবং গৎবাঁধা অভিমত আছে, সেই লিঙ্গভিত্তিক বিচারগুলি অগ্রাহ্য করে নতুন পাঠ্যবিষয় লেখার চেষ্টা চলেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর এবং সংশিষ্ট শিক্ষা আয়োগগুলি, যথা NCERT এই লিঙ্গ সূচক পাঠ্যবিষয়গুলি বদল করার কাজে উদ্যোগ নিয়েছে।

২৯.৪.৩ নারী ও উচ্চশিক্ষা

নারী ও উচ্চশিক্ষা-এই ক্ষেত্রটি কিছুটা ব্যতিক্রমী। আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কলেজীয় শিক্ষা একটি প্রচলিত ব্যাপার। ১৭-২৩ এই বয়সী মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের অনুপাত ৩ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে, ঐ অনুপাত ছেলেদের ক্ষেত্রে এমন কিছু আশাব্যঞ্জক নয় অর্থাৎ৫ শতাংশ। সার্বিক তালিকায় মেয়েদের অনুপাত ৩০ শতাংশের মত। এ থেকে দু'টি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, উচ্চশিক্ষা উচ্চবিত্তের মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব এবং দ্বিতীয়ত, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এসব মেয়েরা তাবৎ কুসংস্কারের বন্ধনমুক্ত হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে থাকে।

তবে উচ্চশিক্ষার পথ এসব নারীদের পক্ষে সুগম হলেও বিভিন্ন বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকায়, মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে বাধার সৃষ্টি হয়। মেয়েদের মধ্যে মানবিকী বিদ্যার প্রতিই আকর্ষণ বেশী। কিন্তু বানিজ্য বিষয়ক শিক্ষায়ও মেয়েরা আগ্রহ দেখাচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও ইনজিনিয়ারিং, স্থাপত্য, আইন প্রভৃতি বিভাগে ছাত্রীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়ই ছিল। কিন্তু বর্তমানে ঐ সব বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে। চিকিৎসাবিদ্যায়ও মেয়েদের আগ্রহ বাড়ছে। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশে এ বিষয়টির অধ্যয়ন ও অনুশীলন নিন্দনীয় নয়। কারণ আজ থেকে শতবর্ষ আগে আনন্দীবাই যোশী, অবলা বসু (বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী) বিদেশ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ে এসেছিলেন। তবে বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নে আমাদের দেশে একটি বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তা হল পঠনেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীকে এক মোটা অঙ্কের মাশুল (Capital Fee) দিয়ে শিক্ষায়তনে ভর্তি হতে হয়। এবং এই ব্যবস্থাটি ক্রমবর্ধমান ও স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে যদিও এর বিরুদ্ধে ভারত সরকারের আইন বলবৎ আছে।

এখানে একটি সঙ্গত প্রশ্ন তোলা যেতে পারে — মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা কি? শিক্ষার অভিজাততন্ত্রী প্রকৃতি এবং অত্যন্ত কঠিন প্রতিযোগিতামূলক বিয়ের বাজারের প্রেক্ষিতে, কলেজ নামক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঠিক বিদ্যাবিতরণ ও বিদ্যাঅর্জনের সংস্থা বলা যায় না। অথবা চাকরির জন্য প্রকৌশল অর্জনের কেন্দ্রও বলা যায়না। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের সুরে সুর মিলিয়ে বরং বলা যেতে পারে যে, কলেজগুলি, হ'ল বিবাহেচ্ছুক মেয়েদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট প্রতীক্ষালয়। তাছাড়া, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমগুলি, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ফিল্মগুলি, এখনও শিক্ষিতা মেয়েদের সন্দেহের চোখে দেখে। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে কিছু নঞর্থক চারিত্রক বৈশিষ্ট্য যথা, আক্রমণাত্মক মনোভাব, দুর্বিনীত এবং অসৎ। এক কথায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে, নারীর শিক্ষগত উৎকর্ষ যা-ই হোক না কেন, তাকে নির্ভরপরায়ণ হতেই হবে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থিতি এক উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি করে। এ কারণে শহরভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের দাবী করতে পারে না।

২৯.৫ নারী ও অর্থনীতি

শিক্ষার্থী বন্ধু, অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীর অবদান সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা প্রকট হয়নি অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা অনেক বেশী করে প্রকট হয়েছে। একথা ঠিক নয় যে, নারীর কর্মে নিযুক্তি সাম্প্রতিক

কালের ঘটনা। স্মরণাতীত কাল থেকেই তারা পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অর্থকরী কাজ করে এসেছে এবং তাদের এই ভূমিকা সমাজ মেনেও নিয়েছে। সাবেকী গ্রামীন অর্থনীতিতে কর্মরত কৃষক, দক্ষকারিগর এবং চাকরবাকর শ্রেণীর কাজে, উৎপাদন ও বেচাকেনার কাজে নারী অসামান্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। সাম্প্রতিককালে, যেখানেই সাবেকি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে, বিশেষত দরিদ্র কৃষিজীবী, তফশিলী সমাজ এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী আগের মতই কাজ করে চলেছে। আপনি নিশ্চয়ই তাদের ঝুড়ি বোনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মাছ ও সবজী বিক্রি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখেছেন। দরিদ্র স্বামীদের ক্ষেতের জমি তৈরীর কাজ এবং অন্যান্য কাজেও দেখে থাকবেন। অর্থনীতির আধুনিক শাখার সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, শিল্পোদ্যগের প্রাথমিক স্তরে বস্ত্রশিল্পে, পাটশিল্পে এবং খনি ও বাগিচা শিল্পে মেয়েদের অংশগ্রহণ স্বীকৃত হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের যাবতীয় শ্রমিকদের মধ্যে নারীশ্রমিকই ছিল এক চতুর্থাংশ। এদের ৮০ শতাংশ সূতা পেঁচানো এবং ২০ শতাংশ সূতা কাঠিমজাত করার কাজে নিযুক্ত থাকত।

২৯.৫.১ নারী ও কর্মনিযুক্তি

কয়েকটি কারণে নারীর কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ বিষয়টি সংশয়পূর্ণ।

প্রথমত, নারীর বহু কাজই অপ্রত্যক্ষ থেকে যায় অর্থাৎ দৃষ্টির আড়ালে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারণ, তারা বাড়ীর গন্ডিতে কাজ করে, গরু বাছুরের রাখালি করে, চাষের কাজে স্বামীকে সাহায্য করে, রান্নাবান্না করে, জল, জ্বালানী সংগ্রহ করে। কিন্তু এসব কাজের কোন হিসেব রাখেনা কেউ। বলা হয় যে, তারা বাড়ীর কাজেই নিযুক্ত। এসব কাজ থেকে যা আয় হতে পারে বা হয়, তার কোন ভাগ পায় না মহিলারা। আদমসুমারী বা Census -এর হিসেব অনুযায়ী কৃষিখাতে ৭৫ শতাংশেরও বেশী এবং কৃষি বর্হিভূত খাতে ৩৮ শতাংশ নারী "যোগাড়ে" হিসেবে কাজ করে। Census কর্মচারীরা এসব নারীদের 'কী কাজ করা হয়?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তাদের একমাত্র জবাব থাকে "ঘরের কাজ"। এসব নারীরা কত যে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীল কাজে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে সে সম্বন্ধে নারীবাদী অর্থনীতিবিদেরা এক পদ্ধতি প্রকাশ করতে বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন। আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হ'ল কর্মরত শ্রমিক সংখ্যায় নারীদের অংশগ্রহণের হার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ১৯০১ সালে সমগ্র নারী জনসংখ্যার ৩১.৭০ শতাংশ ছিল নারীকর্মী। ১৯৮১ সালে এই হার ২০.৮৫ শতাংশে নেমে যায়। অনুরূপভাবে, ১৯০১ সালে প্রতি ১০০০ পুরুষ প্রতি নারীকর্মী ছিল ৫০৪, ১৯৮১ সালে ঐ সংখ্যা ৩৬৭-তে হ্রাস পায়।

আদমসুমারীতে তালিকাভুক্ত হবার আগে অধিকাংশ নারীশ্রমিক বা Main Worker হিসেবে কাজ করেছে। প্রান্তিক কর্মী তাদেরই বলা হ'ত যারা বছরের যে কোন একটি সময়ে কাজ করেছে এবং যারা বছরের কোন সময় একবারের জন্যও কাজ করেনি তাদের অ-কর্মী Non-Worker বা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নারীকর্মী যথা, যোগড়ে, প্রান্তিককর্মী এবং অনিয়মিত কর্মীর তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রায় ৭৫ শতাংশ নারী "অসংগঠিত" ক্ষেত্রে কাজ করে। এর অর্থ হ'ল নারীকর্মীরা নিরাপদ নয়; শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহারকারী প্রতি,ঠানের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা সুরক্ষিত নয়, তাদের দিনের দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয় কিন্তু পারিশ্রমিক অত্যন্ত নগণ্য। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ নিচের সারণি বা Table থেকে পাওয়া যাবে। যদিও এই পরিসংখ্যান ১৯৮১-র আদমসুমারীতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে তৈরী, তবু মহিলাদের কর্মে নিযুক্তি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা এই সারণি থেকে করা সম্ভব।

১৯৮১-তে শিল্পক্ষেত্রে শ্রেণীগতভাবে প্রধান, প্রান্তিক ও সমগ্র
(প্রধান + প্রান্তিক) নারী শ্রমিকদের শতকরা হারের বন্টন

শিল্পক্ষেত্রের শ্রেণী		প্রধান কর্মী		প্রান্তিক কর্মী		সমগ্র কর্মী		
		পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	শ্রমিক	পুরুষ	নারী
	মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
(১)	চাষী	৪৩.৭০	৩২.২০	৪১.৬৬	৪৭.৯১	৪২.০৬	৪৩.৬৬	৩৭.৫০
(২)	কৃষি শ্রমিক	১৯.৫৬	৪০.১৮	৩৩.২৯	৪১.৪৩	২৬.৩১	১৯.৮৩	৪৪.৭৯
(৩)	প্রাণীজ সম্পদ বনজ সম্পদ মৎস্য সম্পদ চাষ আবাদ বাগিচা এবং অনুরূপ কাজকর্ম	২.৩৪	১.৮৫	৩.৬৮	১.৬৪	২.২২	২.৩৭	১.৭৯
(৪)	খনি ও খনিখাত	০.৬২	০.৩৬	০.২৫	০.০৬	০.৫২	০.৫১	০.২৭
(৫)	গঠন, প্রস্তুতকরণ, মেরমতি কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্প	৩.১৮	৪.৫৯	৩.০৩	৪.০৭	৩.৫১	৩.১৮	৪.৪৪
		৮.৯২	৩.৫৫	৫.৩৪	২.১৫	৭.৩৭	৮.৮৫	৩.১৪
(৬)	নির্মাণ	১.৮১	০.৪০	১.৯৫	০.৩৯	১.৫২	১.৮১	০.৬৮
(৭)	ব্যবসা বাণিজ্য	৭.৩৩	২০৪	৪.৮৬	১.০৪	৫.৮৪	৭.২৮	১.৭৫
(৮)	পরিবহণ, মজুতকরণ/ যোগাযোগ	৩.৩২	৩.৩৮	১.৭১	০.০৬	২.৫১	৩.২৯	০.২৯
(৯)	অন্যান্য পরিষেবা	৯.২২	৭.০৫	৪.২৩	১.২৫	৮.১৪	৯.১২	৫.৩৫

চটকল ও সূতাকলে আগে নারীশ্রমিক ছিল ২৫ শতাংশেরও বেশি, বর্তমানে এই সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম। বাগিচা শিল্পে ১৯৭২ সালে নারীশ্রমিকের সংখ্যা ২৫ হাজার কমে যায়। এখন আরও কমে গেছে। কয়লাখনিতে ওয়াগন বোঝাই করার কাজে ৫০ হাজার ছাঁটাই হয়ে গেছে। তামাক শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই নারী। এই শিল্পে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের তিনটি কেন্দ্রে ১৫ হাজার নারীশ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে নারীশ্রমিক কৃষিতে কাজ পেয়ে থাকে বছরে ৬ মাস, মজুরি খুবই সামান্য। কৃষিতে যন্ত্রপাতি আমদানির ফলে প্রচুর নারীশ্রমিক বেকার হচ্ছে। পুরুষের সমান, এমন কি বেশী কাজ করলেও, নারীশ্রমিককে পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরি দেওয়া হয় না। নারীর শ্রম-অংশগ্রহণের পরিমাণ হ্রাস ও তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ভৌগলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান ছাড়াও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে প্রযুক্তির পরিবর্তন বা Technological Change-এর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কৃষিকাজে নিড়ানির কাজ (weeding) ছিল প্রধানত নারী কৃষি শ্রমিকদেরই। ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ ছিল তাদের একচেটিয়া। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিতে আগাছানাশক রাসায়নিক এবং ধান ভানার মেশিন তাদের অনেকাংশে স্থানচ্যুত করেছে এবং সেখানে জায়গা করে নিয়েছে, সংখ্যায় স্বল্প হলেও, পুরুষ শ্রমিকেরা। আবার আরেকটি ব্যতিক্রমী ঘটনাও চোখে পড়ে। উচ্চ ও মধ্য বর্ণের পরিবারে, যারা ব্যবসা এবং কৃষক ও সম্পন্ন পরিবার গোষ্ঠীতে আছেন, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মেয়েদের শ্রমক্ষেত্র বা চাকরি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। মেয়েদের কাজ করাটাকে পরিবারের মর্যাদাহানিকর বলে মনে করা হয়। অধ্যাপক

শ্রীনিবাস এই ঘটনাটিকে "improvement of women at the top" বলে সনাক্ত করেছেন। ভারতীয় সমাজে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান এবং ঘরের বাইরে গিয়ে চাকরী করা (extramural work) ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উচ্চবর্ণের মহিলারা এবং গ্রামাঞ্চলের সংস্কৃতায়ন প্রাপ্ত (sanskritised) মহিলারা এই "মর্যাদা ফাঁদ" -এর শিকার হয়ে থাকে।

২৯.৫.২ নারীর কর্মনিযুক্তির সামাজিক রূপ

নারীর শ্রমনিযুক্তি সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত চিত্রটি থেকে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত মহিলাদের কর্মনিযুক্তির চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শহরাঞ্চলে যা হামেশাই চোখে পড়ে তা' হল ভদ্রসভ্য (white collared job) কাজে মহিলাদের বেশিমাত্রায় যোগদান। শহরাঞ্চলে জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষার সুযোগ এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই পূর্বতন বিধিনিষেধ অনেকাংশে শিথিল হয়েছে এবং সে কারণেই মহিলারা তৃতীয় পর্যায়ের (Teriary Sector) বিভিন্ন চাকরী ও পেশায় যোগ দিতে সক্ষম হচ্ছে। এসব পেশা ও চাকরির দরজা আগে তাদের জন্য রুদ্ধ ছিল। সরকারী ও বেসরকারী খাতে প্রশাসনিক চাকরির সংখ্যা বাড়ার ফলে শিক্ষিত কর্মচারীর চাহিদাও অনেক বেড়ে গেছে। উন্নয়নমূলক এবং কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং আধাভেষজবিদ্‌দের (Para-medical) জন্য রাস্তা খুলে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা পেশাই সমাজে গ্রহণীয় ছিল এবং সেটি যদি কোন মহিলা কলেজে পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। এই কাজে বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয়না, কাজের জায়গায় পুরুষদের সঙ্গে মিশবার অবকাশ কম, গ্রীষ্মাবকাশ ইত্যাদি, নারীর সনাতন সন্তান পালনের ভূমিকার-ই নামান্তর মাত্র। অনেক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, বহু নতুন ক্ষেত্রে নারী কাজ করতে সক্ষম। আবার অনেক কাজ আছে যা কিনা নারীর জন্য "নিষিদ্ধ" বা Ta-booed। তবে ভবিষ্যতের নতুন নতুন সমীক্ষায় জানা যাবে যে, তাদের কর্মক্ষেত্র ও কর্মনিযুক্তি সম্বন্ধে বিধি নিষেধ অনেক শিথিল বা "flexible" হয়েছে অর্থাৎ পূর্বেকার গোঁড়ামি কমেছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীর কর্মনিযুক্তির নিহিতার্থ বা Implication সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমাদের লক্ষ্য হবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারী শ্রমিকেরা। বিবাহিতা ও কর্মরতা হয়েও তারা কিন্তু পুরুষ প্রধান পিতৃতান্ত্রিক সমাজেরই অঙ্গ। ফলে, তাদের কাজ হাজার মর্যাদাপূর্ণ ও আর্থিকভাবে লোভনীয় হলেও, তারা কিন্তু পারিবারিক অর্থাৎ নারীসুলভ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায় না। পরিবার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষায় এসব তথ্য পাওয়া যাবে। সমাজ এখনও মনে করে যে, সমাজে নারীর ভূমিকা মুখ্যত গৃহস্থালী অথবা Home-making -এর।

২৯.৫.৩ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীকর্মী

সম্প্রতিকালে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বহুবিধ চেষ্টা হয়েছে। বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায় যে, নারী অ-কৃষিখাতে, ছোটখাটো ব্যবসায়ে স্বনিযুক্ত হয়ে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে অথবা পোষাক তৈরী, বিড়ি বাঁধা, চুড়ি তৈরী, ইমারতী কাজে, যন্ত্রাংশ সন্নিবেশের কাজে, প্যাকিং-এ নিযুক্ত থাকে। নিপানি-র তামাক চাষে, অথবা লেস তৈরীতে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের দুরবস্থার কাহিনী টিলিভিশনের অবাণিজ্যিক তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দেখান হয়েছে। এইসব বিড়ি শ্রমিকেরা ভোর না হতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ৫/৬ মাইল পথ হেঁটে পৌছয় কাজের জায়গায়। ফিরে আসতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। শিল্পমালিকরা নারী শ্রমিকদেরই পছন্দ করে, কারণ অল্প পয়সায় তাদের নিয়োগ করা যায়, সহজে ধোঁকা দেওয়া যায় এবং মেয়েরা ইউনিয়নবাজি করে না। আর ক্ষুদ্র এবং অসংগতি ক্ষেত্রের অছিলায় মালকেরা এদের প্রাপ্য বহু সুযোগ সুবিধা যথা, প্রসূতি ছুটি ও ভাতা, ক্রেশ এবং ন্যূনতম মজুরী থেকে বঞ্চিত করে। বাণিজ্যের মুক্তঞ্চল (Free Trade) এবং রপ্তানী প্রবর্ধক অঞ্চল (Export Promotion Zones) গুলিতে এসব দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। কান্ডুলা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে, যেখানে পোষাক তৈরী, পশমবোনা, ইলেকট্রনিক ইত্যাদির ছোট ছোট কারখানা আছে, লাইসেন্সবিহীন কনট্রাকটরেরা সিংহভাগ নিয়োগের কাজটি করে থাকে। অধিকাংশ নারীকর্মী ২০ বছরের কম বয়সী

এবং অবিবাহিত। তাদের কাজের দিন শুরু হয় ভোর ৪টে থেকে এবং শেষ হয় রাত্রি ১০টায়। তাদের আবার বাড়ীর কাজও করতে হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, শ্রেণী, বর্ণ যা-ই হোকনা কেন ঘরের কাজের দায়িত্ব নারীরই। পরিবারের মধ্যে লৈঙ্গিক শ্রম-বিভাজনের চেহারা অতি প্রকট ও স্পষ্ট। ঘরে এবং বাইরে দু' জায়গার কাজের বোঝা বহন করে নারী শ্রমিকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে বলা যায়, অর্থনীতি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে বাইরের কাজে নারীর সুযোগ আসলেও, তাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায্য পাওনা থেকে তারা বঞ্চিত।

২৯.৬ নারীর সামাজিক অবস্থিতি

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে তাদের সম্পর্কে কি যুক্তিযুক্ত সমাজের এই ধারণাটিই তাদের সেই ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ নির্ধারণ করেছে। ঐ সব বিধিনিষেধের মোদ্দা কথাটি হ'ল নারীর প্রাথমিক ভূমিকা গৃহে এবং গৃহস্থালীতে, গৃহের প্রয়োজনে এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিরুচি, জীবিকা, পেশা সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে পারেনা। আমরা পরিবার ও বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব।

২৯.৬.১ পরিবার ও নারীর অবস্থান

ভারতে পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক দুই ধরনের পরিবার বর্তমান থাকলেও পিতৃতান্ত্রিক এবং যৌথ পরিবারের-ই প্রাধান্য বর্তমান। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডঃ ইরাবতী কার্ভে যৌথপরিবার সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়েছেন "একটি জনসমষ্টি, যারা সাধারণত এক ছাদের নীচে বাস করে, একই রান্নাঘরের রান্না খেয়ে থাকে, যৌথভাবে সম্পত্তির অধিকারী হয়, পারিবারিক পূজাপার্বণে অংশগ্রহণ করে এবং একে অন্যের সাথে কোন না কোন আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ থাকে।" ভারতের সর্বত্র এই ধরণের যৌথ পরিবার বর্তমান এমন কি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রাদায়, যথা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যেও যৌথ পরিবার দেখা যায়। উচ্চবর্ণ ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা আরো ব্যাপক। অবশ্য ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পয়নের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার আদর্শগতভাবে যতটা বর্তমান, ব্যবহারিক ভাবে যৌথ বসবাস ততটা প্রাধান্য পায়না।

স্বামীর গৃহে বসবাস সহ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে বিবাহের পর নারী লিঙ্গ সমতার সেরকম একটি সুষ্ঠু পরিবেশ পায়না। পিতৃতান্ত্রিক যৌথপরিবারে শাশুড়ী এবং ননদের হাতে বধূদের কীরকম নিগ্রহ, নির্যাতন হয় এসব কাহিনী বহু লোকগাথায় ও গানে অমর হয়ে আছে। ঐ পরিবারে বধূরা সম্পূর্ণভাবে শাশুড়ী ও ননদের কর্তৃত্বাধীন। কর্মরতা নারীদের ক্ষেত্রে যৌথপরিবারে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি ভাসাভাসা ধারণা আছে যে, তাদরে সংসারের দায়িত্ব তেমন একটা পালন করতে হয় না। কিন্তু বিশদ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে এসব ক্ষেত্রে যৌথপরিবার তিন প্রজন্মের পরিবার নয়, বরং কোন দম্পতির সঙ্গে হয় পিতা, নয়ত মাতা বাস করছেন।

২৯.৬.২ নারী ও বিবাহ

নারীর জীবনে বিবাহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রমতে বিবাহ-ই একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নারীর পক্ষে। এছাড়া, সমাজ যখন নারীর সতীত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, দাম্পত্য সম্পর্কের স্থায়িত্ব সেখানে অত্যন্ত মূল্যবান। বৈধব্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ, একক নারীজীবন পুরুষের লোভ লালসার লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠতে পারে। নারীর পক্ষে বিবাহ বাধ্যতামূলক সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের অধিকতর অবমূল্যায়ণের ক্ষেত্র হ'ল পণপ্রথা। কোন কোন গোষ্ঠীর মর্যাদা পরম্পরায় (status hierarchy) কন্যাপক্ষের মর্যাদা পাত্রপক্ষের মযওাদার চেয়ে কম। কোন বিশেষ বর্ণে মেয়ের বিবাহ দিতে হ'লে বাবা-মাকে পাত্র বা পাত্রপক্ষকে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ টাকা ও অন্যান্য

সামগ্রী দিতে হয়। এইসব দানসামগ্রী ও যৌতুক উভয়পক্ষের মার্যাদা বৃদ্ধিকর বলে মনে করা হয়। দুটি দেহ ও মনকে মেলবার পক্ষে এটি একটি প্রকাশ্য বাণিজ্যিক লেনদেন ছাড়া আর কী হতে পারে? নারী অবশ্যই সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিদান বই নয়! সমাজের আধুনিকীকরণে এই প্রথা কিছু মাত্র কমেনি বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চশিক্ষিত সরকারী চাকুরে, উচ্চবেতনে উচ্চ পেশায় নিযুক্ত পুরুষেরা আকাশছোঁয়া পণ দাবী করে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের বিয়েতে বর্তমানে লক্ষাধিক টাকা দরকার হয়। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হ'ল যে, উচ্চশিক্ষিত ও চাকুরীরতা মেয়ের বিয়েতেও পণ দিতে হয় বাবা-মাকে। এবং এই হুমকি দেশের সর্বত্র দাবানলের মত বিস্তার লাভ করছে। একসময় পণ দেওয়া-নেওয়াকে সামাজিক কুপ্রথা হিসেবেই গণ্য করা হ'ত। বিশেষ করে উত্তর ভারতে এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে। বর্তমানে এ ধরনের সীমারেখা আর নেই। পণপ্রথা দারিদ্রশ্রেণীর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে, মর্যাদা বৃদ্ধি করতে এবং কন্যা বিক্রির ব্যাপারটি আইনুনুগ করতে বাবা-মাকে এখন পণ দিতে হচ্ছে। এতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় নারী সম্বন্ধে গোটা সমাজের চূড়ান্ত অমানবিক মনোভাব এবং নতুন প্রজন্মের চরম বৈষয়িক অভিরুচি। নারীর নিম্ন অবস্থানের আরও ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুরতম প্রমাণ হ'ল পণপ্রথার বলি হিসেবে বধূমৃত্যু। পাত্রপক্ষের বাড়ীর লোকেদের এবং স্বামীদেরও লোভের কোন মাত্রা না থাকায় যৌতুক ও দান সামগ্রীর জন্য প্রতিনিয়ত নববধূকে বিব্রত হ'তে হয়। অন্যদিকে, সম্মান, মর্যাদা, 'ইজ্জত' এর দোহাই দিয়ে নির্যাতিতা কন্যার বাবা-মাও পরিবারে তাকে আশ্রয় দিতে চায় না। ফলে, কোথাও কোন জায়গায় শান্তি ও আশ্রয় না পেয়ে সে বাধ্য হয় আত্মহত্যায় অথবা তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে পণপ্রথাজনিত মৃত্যু এক নির্মম ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

২৯.৬.৩ নারী ও অসম লিঙ্গানুপাত

সমাজে নারীর নিম্নমানের অবস্থানের আরেকটি সূচক হ'ল লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য। সাধারণভাবে জনসংখ্যার লিঙ্গানুপাত নির্ধারিত হয় জৈবিক ও সামাজিক কারণ দ্বারা। সাম্প্রতিককালের একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা হ'ল যে, এদেশে জন্মসময়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের টিকে থাকার সম্ভবনা কম। এটি কিন্তু অন্যান্য দেশে ঘটেনা। লিঙ্গানুপাতে ভারতে বৈষম্যের অবকাশ বরাবরই আছে কিন্তু বর্তমানে গভীর উদ্বেগজনক কথা এই যে, নারীর সংখ্যা ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে। এই সংখ্যার নিম্নগতি নীচের সারণি থেকে স্পষ্ট হবে।

সারণি (প্রতি এক হাজার পুরুষে)

বৎসর	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
১৯০১	৯৭২	৯৪৫
১৯১১	৯৬৪	৯২৫
১৯২১	৯৫৫	৯০৫
১৯৩১	৯৫০	৮৯০
১৯৪১	৯৪৫	৮৫২
১৯৫১	৯৪৬	৮৬৫
১৯৬১	৯৪১	৮৭৮
১৯৭১	৯৩০	৮৯১
১৯৮১	৯৩৪	৯১১
১৯৯১	৯২১	৯১৭

অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে, যথা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহারে এই লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য আরও তীব্র। তবে কেরল রাজ্য এর ব্যতিক্রম, সেখানে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী। লিঙ্গানুপাতের এই বৈষম্য কিছুটা মনুষ্যসৃষ্টও বটে।

বর্তমানে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষার এবং তার শারীরিক কোন খুঁত বা রোগ আছে কিনা এই পরীক্ষা করার একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি "Amneocentesis" ডাক্তারি মহলে চালু আছে। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি চালু করার ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে রোগযুক্ত বিকলাঙ্গ সন্তান না জন্মায়। কিন্তু এই পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে এবং হয়েছে। গুজরাট রাজ্যে ১৯৯০ সালে লক্ষাধিক কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সূচক হিসেবে গণ্য করা হলেও উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি কিন্তু কন্যাভ্রূণ হত্যার কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিষম লিঙ্গ নুপাতের পথ প্রশস্ত করছে। সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে এই বিসম লিঙ্গানুপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অনুশীলনী ২

১। ভারতে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কিভাবে ধারণা এবং মত পরিবর্তিত হয়েছে। সাত লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। ভারতে নারীশিক্ষার হার কী? গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নারীশিক্ষার হাত কত? পাঁচ লাইনে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

৩। **শুদ্ধ উত্তরটিতে (✓) এই চিহ্ন দিন**

(ক) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্তেও নারীর নির্ভরশীলতা বজায় রেখেছে,

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) চিরাচরিত গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বেচাকেনার ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়,

হ্যাঁ ☐ না ☐

(গ) বর্তমান সময়ে পরিবারের অর্থনৈতিক মর্যাদাবৃদ্ধির অজুহাতে মেয়েদের চাকরি থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে,

হ্যাঁ ☐ না ☐

(ঘ) শিল্পে নারীদের চাহিদা আছে কারণ তাদের কম মজুরীতে নিয়োগ করা যায়, তাদের সহজে প্রতারিত করা যায় এবং তারা ইউনিয়ন করেনা,

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৯.৭ মর্যাদার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর পরিবর্তিত অবস্থান

ছাত্র/ছাত্রীবন্দু, এতক্ষণ আমরা শিক্ষা, কর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করেছি। মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে এবং রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে একথা মনে করা হয়েছিল যে, ঐ পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পরিমাণ অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে এবং জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাবে। আরো মনে করা হয়েছিল যে, কোন একটি বিভাগ অথবা শ্রেণী অথবা লিঙ্গের সমৃদ্ধি ক্রমশ অন্যান্য খাতেও ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু এই ভাবনা নির্ভুল ছিল না। পক্ষান্তরে, আজ একথা স্বীকৃত হয়েছে যে অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি দেশের আর্থসামাজিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি নারীদের পক্ষে কোন কাজে আসেনি। কারণ দেশের অর্থনীতি, আধুনিকীকরণের সুত্রে, গ্রাসাচ্ছদন ব্যবস্থা থেকে অর্থভিত্তিক ব্যবস্থায় পৌঁছেছে এবং বাজারকেন্দ্রিক হয়েছে। এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারীরই। আগাছা নির্মূল করার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নেওয়ায় রাজস্থানের নারীকর্মীদের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যা তাদের চাকরি খুইয়েছে। অনুরূপভাবে, চালকলে নিযুক্ত নারীকর্মীদের একাংশ ধানভানার যন্ত্র বসাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাকরি হারিয়েছে। এরা এই যন্ত্র বসাবার আগে হাতে ধানভানত। আবার হিমায়ণের সুবিধাযুক্ত নৌকা চালু হতে নারী মৎস্যকর্মীরা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। তাদের ঠেলে পাঠান হয়েছে নিবিড় শ্রমদান শিবিরে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

বিগত তিন চার দশকে আরেকটি ভুল ধারণার অবসান ঘটেছে। সেটি হ'ল পরিবারই একমাত্র সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান। পরিবার প্রধানকে মদত দিলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরাও লাভবান হবে, এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দারদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অথবা প্রান্তিক চাষীদের সাহায্যের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, সহায়ক অর্থ পুরুষদের কাছেই পৌঁছয়, নারীরা ও শিশুরা কদাচিৎ তার ভাগ পায়। সমীক্ষা করে আরো দেখা গেছে যে, পুরুষেরা আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যপণ্য ও বিলাস দ্রব্যের পিছনে খরচ করে। সেক্ষেত্রে নারী ব্যয় করে তাদের পরিবারের জন্য। ১৯৭৮-৮৩-র খসড়া পরিকল্পনায় সকলের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা, দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং সমবন্টনের সমাজ গঠনই লক্ষ্য ছিল কিন্তু তা পূরণ হয়নি। আগেই দেখেছি যে নারীর কর্মনিযুক্তি কমেছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি, পণজনিত কারণে বধূহত্যা বেড়েছে এবং কন্যাশিশুর অবমূল্যায়ন ঘটেছে অত্যন্ত করুণভাবে। এতেই প্রমাণ হয় যে কী ধরনের উন্নতির পথে চলেছি আমরা!

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, গত দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে এসব কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ যোজনা পর্যন্ত মহিলাদের জন্য বরাদ্দ ছিল কিছু কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। ষষ্ঠ যোজনা দলিলেই প্রথম নারী ও উন্নয়নের উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লেখা হয়। এতে নারীদের জন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। মহিলাদের গ্রামোন্নয়নের অংশীদারত্ব কতখানি হচ্ছে তার স্বতন্ত্র হিসেব রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়। এরই ভিত্তিতে ১৯৮২ সালে যখন দেখা গেল যে, IRDP-র সুযোগের শতকার একভাগও মহিলাদের কাছে পৌঁছচ্ছেনা তখন IRDP সুবিধাভোগীদের মধ্যে মহিলাদের অনুপাত শতকরা ১০ ভাগ হবে এই লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মহিলা প্রাপকদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ করে ঋণদানের জন্য "গ্রামীণ" নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রকল্প অথবা (DWCRA) নামে সহায়ক প্রকল্পও চালু করা হয়।

সপ্তম যোজনাকালে (১৯৮৫-৯০) এবং অষ্টম যোজনা কালে (১৯৯২-৯৭) এই একই প্রকল্পগুচ্ছের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। IRDP-র মহিলা প্রাপক লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ১৯৮৫ সালে করা হয় ৩০ ভাগ এবং ১৯৯০ সালে শতকরা ৪০ ভাগ। অন্যদিকে ১৯৮৯-৯০ অর্থবর্ষে জওহর রোজগার যোজনা (JRY) চালু করে মোট কর্মসংস্থানের

শতকরা ৩০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা মহিলাদের জন্য বেঁধে দেওয়া হয়। এছাড়া, সপ্তম যোজনায় অনেক রাজ্যেই নারী উন্নয়ন নিগম (Woman Develppment Undertaiking) গড়ে উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গেও উঠেছে। এর মাধ্যমে সমস্ত উন্নয়ন-কর্মসূচীর কিছুটা সমন্বয়সাধন করা যাবে। অষ্টম যোজনায় "ইন্দিরামহিলা যোজনা" চালু করা হয়েছে। এটির মাধ্যমে সকল নারী-কেন্দ্রিক কর্মসূচির সমন্বয়সাধন করা যাবে এবং সমস্ত নারী কর্মীকে একত্র করে কাজে লাগান যাবে।
এবার আমরা সংক্ষেপে নারীদের সম্পর্কে বিচার বিভাগে মনোভাব এবং আইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

২৯.৭.১ আইনগত পদক্ষেপসমূহ

সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হ'ল দেশের আইনব্যবস্থা। ভারতীয় সংবিধানে আনুষ্ঠানিকভাবে নারীদের সমতা স্বীকৃত হয়েছে একথা আগেই আলোচনা করেছি। গত ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেগুলি নারীর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া এই দশকে ঘোষিত কয়েকটি বিচার বিভাগীয় রায় নারীর সমানধিকারের বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দিয়েছে।
কর্মক্ষেত্রে নারীর আধিকার সুরক্ষিত করতে পাশ হয়েছে Maternity Benefit Act. 1961, Minimum Wages Act এবং Equal Remuneration Act 1976। ১৯৭৮ সালে স্ত্রীর উপর স্বামীর দাম্পত্য অধিকার পুনঃস্থাপন বিরোধক আইন পাশ করে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয় সরকার। ১৯৮৩ সালে ফৌজদারী আইন সংশোধন ধর্ষণের সংজ্ঞায় মহিলাদের অনুকূলে যায় এমন কিছু নতুন মাত্রা সংযোজন করে। শাহবানু মামলায় বিচার বিভাগ একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছিল কিন্তু সেটিকে নানাবিধ কারণে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যায়নি। এছাড়াও সংবিধানে ৭২ এবং ৭৩ তম সংশোধনীতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। নারীর সমতার স্বীকৃতিতে ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত আইনগুলি প্রণয়ন হয়েছে যথা —

(ক) বিজ্ঞাপনে মহিলাদের অশ্লীল চিত্র প্রদর্শক বিরোধী আইন ১৯৮৬।
(খ) সতীপ্রথা নিবারণ আইন ১৯৮৭।
(গ) মহিলাদের আইনী সাহায্য দান সংক্রান্ত আইন ১৯৮৭।
(ঘ) পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৪।
(ঙ) স্বাস্থ্যের কারণে গর্ভাপাত আইন (Medical Termination of Pregnancy) ১৯৭১।
(চ) পণবিরোধী আইন ১৯৬১-এর সংশোধনী ১৯৮৪, ১৯৮৬।
(ছ) মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা ১৯৯৩/রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ ১৯৯৩।

বিচার বিভাগীয় রায় এবং উপরোক্ত আইনের মাধ্যমে নারীর অবস্থান কিছুটা সুরক্ষিত হয়েছে অথবা তারা ন্যায়বিচার পাবার ক্ষেত্রে সদর্থক বা ইতিবাচক কিছু সুযোগ পেয়েছে।

২৯.৭.২ সরকারী ব্যবস্থা

সরকার বিগত দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসবের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে কয়েকটি কার্যকরী পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে।
১৯৭৬ সালে শ্রম সম্পর্কিত একটি মহিলা বিভাগ মন্ত্রীসভায় গঠিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে এই বিভাগ কাজ করে আসছে নারী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। ১৯৭৮ সালে প্রথম মহিলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে যোজনা কমিশন কর্তৃক একটি কার্যকরী দল সংগঠিত হয়েছিল যেটি মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মহিলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত সম্ভাবনামূলক তথ্য জুগিয়েছিল। এর ফলে একটি নীতি গৃহিত হয়েছিল যে,

মহিলাদের এখন থেকে কল্যাণমূলক পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে না দেখে তাদের উন্নতিবিধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। মহিলাদের উন্নতিবিধানের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে একটি কার্যকরী জাতীয় পরিকল্পনাও তৈরী করা হয়েছিল মহিলাদের জন্য। এর ফলে মহিলাদের কল্যাণসাধন এবং উন্নতিসাধনের জন্য মন্ত্রিসভার সমাজকল্যাণ দপ্তরে একটি সংস্থা তৈরী করা হয়েছিল যার কাজ ছিল মহিলাদের উন্নতির জন্য নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সর্বশেষ, একজন বিশিষ্ট মন্ত্রীকেও নিয়োগ করা হয়েছে মহিলাদের স্বার্থ-রক্ষার দিকগুলি দেখার জন্য।

কতকগুলি নীতি নির্ধারণের পদক্ষেপ ছাড়াও সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি কার্যপদ্ধতিরেও উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিয়োগ সুনিশ্চত করার পরিকল্পনা, তপশিলী জাতি ও উপজাতির মহিলাদের সামাজিক সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত নিবিড় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, পারিবারিক আদালত স্থাপন, পুলিশ বিভাগে মহিলা সেল এবং সাম্প্রতিককালে গঠিত নারী কমিশন, যেখানে দরিদ্র বিভাগে স্ব-ক্ষেত্রে নিযুক্ত মহিলাদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সমসাগুলির তীব্রতা কমানর জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় — এগুলি হ'ল কয়েকটি উদাহরণ যেগুলিকে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কিছু সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারী কর্মতৎপরতা হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগও কয়েকটি পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করেছে যার মাধ্যমে নারীর একঘেয়ে জীবনকে কিছুটা ক্লান্তিমুক্ত করা যাবে প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনার বৃদ্ধি ঘটিয়ে।

অবশ্য এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণস্বত্ত্বও যদি সংবেদনশীল আমলা অথবা কর্মীদের দলগুলির মাধ্যমে বাস্তব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা না হয় তাহলে পরিকল্পনাগুলির গল্পকথা হবে যে এগুলিতে মহিলাদের সমস্যার প্রতি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না।

২৯.৮ নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলন

গত দশকের একটি অত্যন্ত লক্ষণীয় ঘটনা হ'ল অক্ষমতা দূরীকরণের জন্য নারীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা কিছু গোষ্ঠীর চাপ, লিঙ্গ বিচারের দাবীর স্থায়িত্ব এবং নারীরা যে সব বিষয়ের সম্মুখীন হন সেগুলির প্রতি সমাজের বৃহত্তর অংশের মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে যে শান্তি বিরাজমান ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে মনে করা যেতে পারে। নারী গোষ্ঠীগুলি প্রতিনিয়তই কোন না কোন মহিলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন এবং তাঁরা ঐগুলি নিয়ে হয় প্রচারাভিযান করছেন অথবা ক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। এটি হয়ত মঞ্জুশ্রী হত্যার কেস নিয়ে হতে পারে অথবা ভ্রূণ পরীক্ষার বিষয়ে প্রবল বাধা হতে পারে অথবা কোন সুপরিচিত নারী পত্রিকার সৌজন্যে পরিচালিত 'মিস ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে হতে পারে অথবা লিঙ্গের প্রতীক হিসেবে গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য মহিলাদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে হতে পারে, শতাধিক নারীর খরাক্লিষ্ট অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থার প্রতি জনসাধরণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হতে পারে অথবা উপজাতিভুক্ত নারীদের জমির অধিকার স্থায়ীকরণের জন্যও এই ধরনের নারী ক্ষোভপ্রদর্শন হতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনেকগুলিই এই অর্থে স্বয়ংশাসিত যে তারা কোন রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভরশীল নয় যদিও স্বতন্ত্রভাবে কোন সদস্যার কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্তি থাকতেও পারে। কলেজীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শহরুরে মেয়েরা এই ধরনের সদস্যপদ নিয়ে থাকেন, তাঁরা কোন একনায়কত্বের অবস্থানে বিশ্বাস করেন না এবং কোন একটি সংগঠনের গোঁড়া কাঠামোরও বিরোধীতা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য তাঁদের নিজস্ব পত্রপত্রিকা আছে, মহিলাদের প্রশ্নের জবাবও আছে। আপনি নিশ্চয়ই এমন সমস্ত গোষ্ঠীর মহিলাদের নাম শুনেছেন, যেমন, "সহেলী", "মৈত্রিণী", "সহিয়ার" আওয়াজ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে মহিলাদের মতামত প্রকাশের মঞ্চ ইত্যাদি।

২৯.৮.১ প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন

বিগত পাঁচ বছর ধরে যে একটি অত্যন্ত উৎসাহজনক কর্মধারা লক্ষ্য করা গিয়েছে তা হ'ল অল ইন্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স, ইয়ং উইমনেস্ খ্রীষ্টান এ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশানাল ফেডারেশন অফ্ ইউনির্ভাসিটি উইমেন ইত্যাদি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবন, যে প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক বেশী জড়িত ছিল উচ্চজাতির শিক্ষিত নারীর সমস্যা নিয়ে। ঠিক ঐ সময় নারী ধীরে ধীরে তার বহিরাবরণ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে সভাসমিতি ও আলোচনাসভা গড়ে তুলেছে অথবা প্রতিবাদমূলক কাজের মধ্য দিয়ে অন্যান্য শক্তিগুলির সাথে মিলিত হচ্ছিল অথবা তৃণমূল স্তরে কাজ করেছে। সেদিন আর নেই যখন শুধুমাত্র মেয়েদের সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করেই অথবা "ফেমিনিস্ট" শব্দটি উচ্চারণ করেই এমন সাড়া জানান যেত যে, যৌথ পরিবারে ভারতীয় নারীর একটি সুদৃঢ় ভিত্তি আছে এবং তাঁদের চারিদিকে তাঁদের প্রশংসা করার মত লোক আছেন, যার ফলে তাঁদের নারীদের জন্য আন্দোলন করার প্রয়োজন নেই। একইভাবে তৃণমূল স্তরেও মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পৌঁছে দিতে এবং মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং আবাসনের বন্দোবস্ত করতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিও আজকের সমাজে নারীর বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছে।

অনুশীলনী ৩

১। কিভাবে নারীকে পরিবারকে সাহায্য দেবার লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ভুল ধারণা করা হয়ে থাকে ব্যাখ্যা করুন। সাতটি লাইন ব্যবহার করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। ১৯৭৬ সালের সমান মজুরী আইন ব্যাখ্যা করুন। তিনটি লাইন ব্যবহার করুন।

.....

.....

.....

৩। নারী কল্যাণের জন্য সরকারী নীতিগুলির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলি আলোচনা করুন। পাঁচটি লাইন ব্যবহার করুন।

.....

.....

.....

.....

২৯.৮.২ নারী সম্পর্কে পাঠক্রম ঃ গবেষণার বিষয়

নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে যত কাজ হচ্ছে সেগুলির সাথে এবং নারীগোষ্ঠীর মধ্যে যত কাজ হচ্ছে তার সাথে আমাদের সেইসব পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে পরিবর্তনগুলি নারী শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসছেন। গবেষণা এবং শিক্ষাদানের বিষয় হিসেবে নারী সংক্রান্ত পাঠক্রম বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে। নারী বিষয়ক পাঠক্রম সংক্রান্ত বিভাগ ও পরিকল্পনাগুলি গবেষণার মাধ্যমে নারীর সমস্যাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখিয়েছে এবং সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন-সাধন ও তাকে বজায় রাখার জন্য নারীর অবদানের কথাও তুলে ধরেছে। ১৯৮১ সালে ভারতবর্ষে এ্যাসোসিয়েশন অব উইমেনস্ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল যেটি এর বাৎসরিক সভা, আলোচনা সভা এবং অন্যান্য সমর্থনমূলক কাজ মহিলাদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত পাঠক্রমকে সরকারী এবং বে-সরকারী শিক্ষাদান পরিকল্পনা এই উভয় ক্ষেত্রেই উৎসাহিত করবে। অনেক গবেষক মহিলাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নারীর অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করছেন।

অবশ্য, একটি অতি লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। মহিলাদের শাখা সৃষ্টির মাধ্যমে বক্তব্য রাখার বিভাগ তৈরী হচ্ছে। এটি বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে। এমন একটি সময় ছিল যখন বামপন্থী দলগুলি মনে করতেন যে খেটে-খাওয়া শ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সমস্যাগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করা উচিত। মহিলাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানর পরেই তাদের বিভিন্ন প্রশ্নগুলির সমাধান করতে হবে। বর্তমানে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বিবেচনা করে রাজনৈতিক দলগুলিকে অধিকসংখ্যক মহিলা ও পার্টিসদস্যাদের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

এইভাবে শুধুমাত্র নারী সংগঠনের মধ্যেই নয় নারীদের সমস্যাগুলি তাৎপর্য লাভ করছে সেই সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেও যাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য আন্দোলন করছেন। এক কথায় বলতে গেলে, এই সমস্যাগুলি মানুষের চিন্তার জগতে আলোড়ন এনেছে।

২৯.৯ সারাংশ

এই বিভাগে আমরা ভারতে নারীর প্রকৃত অবস্থান এবং সমস্যাগুলি বুঝতে চেষ্টা করেছি; যে প্রচেষ্টা চলাকালীন আমরা নারীদের সম্পর্কে কিছু রূপকথা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এই রূপকথাগুলি নারীকে হয়ত বেদীর ওপর বসিয়েছে আবার কখনও দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করেছে। এই উন্নতির পদ্ধতি নারীকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষাব্যবস্থা এখনও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় নারীর কোন জায়গা থাকছে না দক্ষতা অর্জনের জন্য—যে দক্ষতা তাদের বিভিন্নক্ষেত্রে দক্ষতা ভিত্তিক কাজে প্রবেশ সম্ভব করবে।

নারীর মর্যাদা এবং সমস্যাগুলির যে চিত্র দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য হ'ল একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে, ভারতীয় মহিলাদের অবস্থানে কোন পরিবর্তন হয়নি। বস্তুত, আমরা যে বিষয়টি সবার নজরে আনতে চাই তাহ'ল কিছু বৃহৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলি এবং একই সাথে আদর্শগত অতিরিক্ত বিষয়গুলি নারীর অবস্থানকে

প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছে। পরিবর্তনের আরও কিছু আশাপ্রদ লক্ষণ হ'ল নারীর প্রকৃত অবস্থা এবং সেই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তাদের সক্রিয় মধ্যস্থতা বিষয়ে নীতি-নির্দ্ধারকদের দ্বারা স্বীকৃতি দান। গত ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর ধরে যে উন্নতি সেটি নির্দেশ করে যে, লিঙ্গ বিষয়ে সমতা কখনই সংবিধানের মাধ্যমে স্থায়ী হবে না। এটি আলোচিত কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে হবে।

২৯.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Neera Desai and Maithreyi Krishna Raj (Eds) : Women and Society in India, Ajanta Publication, 1987

Amit Kumar Gupta : Women and Society. The Developmental Perspective, Criterion Publications, 1986

Neera Desai and Vibhuti Patel : Change and Challenge in the International Decade, 1975-85 Popular Prakashan, 1985

Kamala, Bhasin and Bina Agarwal : Women and Media, Analysis, Alternatives and Action. Kali for Women, New Delhi, 1985

Joanna Liddle and Rama Joshi : Daughters of Independence, Gender Caste and Class in India, Kali for Women, 1986

২৯.১১ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। নারীর মর্যাদা সম্পর্কে রূপকথাগুলি এইরকম যে তাঁকে শক্তির দেবীর সমান মর্যাদা দেওয়া হয় অথবা শক্তির নীতির সমান মনে করা হয়। ভারতীয় সমাজে মাতৃমূর্তি শ্রদ্ধার পাত্র। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে তাকে মনে করা হয় নম্র ও দুর্বল হিসেবে, যাকে রক্ষা করবেন পরিবারের পিতা, স্বামী ও পুত্র। তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না এবং একজন দক্ষকর্মী ও উৎপাদক হিসেবে তাঁর অবদানকে মূল্য দেওয়া হয় না।

২। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত সমাজ সংস্কারকগণ ভারতবর্ষের মহিলাদের অসম মর্যাদার প্রশ্নটি তুলেছিলেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এম. জি. রাণাডে, মহর্ষি কার্ভে, জ্যোতিবা ফুলে, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য কয়েকজন।

৩। ভারতবর্ষের নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আশা এবং আত্মতুষ্টি আধুনিককালে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে যখন ষ্ট্যাটাস কমিটি নারীর মর্যাদা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেছেন ১৯৭৪ সালে। এই বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে সমীক্ষা দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশ করেছে যেখানে দেখান হয়েছে মহিলাদের প্রতি নিপীড়ন আমাদের সমাজে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অনুশীলনী ২

১। ভারতবর্ষের নারীশিক্ষা সম্পর্কে মতের পার্থক্য দেখা দিয়েছে। আগে এমন বিশ্বাস করা হ'ত যে তার কাজের পরিধি ছিল বাড়ী এবং সেইজন্য গৃহস্থালী এবং এই সম্পর্কিত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ তার শেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গত একশ বছরের ক্রমবর্দ্ধমান অনুকূল হাওয়া নারী শিক্ষার সমর্থনে বইছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীকে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছু সামাজিক সংস্কার আনা হয়েছিল।

২। ১৯৮১ সালের আদসুমারীর হিসেব অনুযায়ী ভারতে নারী শিক্ষার হার শতকরা ২৪.৮ ভাগ। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে এটি প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ এবং শহরাঞ্চলে এটি বেশী, প্রায় শতকলা ৪৭.৮ ভাগ।

৩। (ক) হ্যাঁ (২৯.৪.৩ অনুচ্ছেদটি দেখুন)

(খ) না (২৯.৫ অনুচ্ছেদটি দেখুন)

(গ) হ্যাঁ (২৯.৫.১ অনুচ্ছেদটি দেখুন)

(ঘ) হ্যাঁ (২৯.৫.৩ অনুচ্ছেদটি দেখুন)

অনুশীলনী ৩

১। পরিবারকে সাহায্যের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে মনে করা একটি ভুল ধারণা। পরিবারের প্রাধান্যকে সাহায্য করলে পরিবারের সবাইকে সাহায্য করা হয় এই বিশ্বাসটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে যাঁরা আছেন অথবা প্রান্তিক চাষীর শ্রেণীতে যারা আছেন তাঁদের সাহায্য করার জন্য যে পরিকল্পনাগুলি আছে সেগুলি মূলত পুরুষদের জন্য সাহায্যকারী পরিকল্পনা, নারী অথবা শিশুদের কাছে সেগুলি কদাচিৎ পৌঁছায়।

২। ১৯৭৬ সালের সমান মজুরী আইন নিয়োগকারীদের ওপর একই কাজের জন্য পুরুষ ও নারীকে সমান মজুরী দেবার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল।

৩। সরকারী নীতিতে যে সব পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনগুলি শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে। নারী কল্যাণকর পরিকল্পনাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখার বদলে তাদের একটি জটিল গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে—যাদের উন্নতি বিধান প্রয়োজন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নতির জন্য একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

একক ৩০ শিক্ষা সমাজ-পরিবর্তনের মাধ্যম

গঠন

৩০.০ উদ্দেশ্য

৩০.১ প্রস্তাবনা

৩০.২ শিক্ষায় ঔপনিবেশিক অবদান

৩০.২.১ মেকলের সংক্ষিপ্ত বিধি, ১৮৩৫

৩০.২.২ উডের বিজ্ঞপ্তি, ১৮৫৪

৩০.২.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৮৮২

৩০.২.৪ সরকারী সিদ্ধান্ত, ১৯০৪

৩০.২.৫ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯০৬

৩০.২.৬ শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণ

৩০.৩ শিক্ষায় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব

৩০.৩.১ জাতীয় আন্দোলন ও শিক্ষা পদ্ধতি, ১৯২০-৩৭

৩০.৩.২ বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা

৩০.৩.৩ সার্জেন্ট রিপোর্ট, ১৯৪৪

৩০.৪ স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা

৩০.৪.১ স্কুলে ছাত্রভর্তির হার

৩০৪.২ পশ্চাদ্‌গামী রাজ্যে শিক্ষা

৩০.৪.৩ উচ্চ-শিক্ষা

৩০.৪.৪ উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের স্তর

৪০.৪.৫ উচ্চ-শিক্ষার সমস্যা

৩০.৫ নতুন শিক্ষা-নীতির অভিমুখে

৩০.৫.১ পরিমাণগত বিস্তার

৩০.৫.২ ন্যায়পরায়ণতা

৩০.৫.৩ উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনী শক্তি

৩০.৫.৪ জাতীয়, মানবিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ

৩০.৬ প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সমাজ-পরিবর্তন

৩০.৭ সারাংশ

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩০.৯ উত্তরমালা

৩০.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের পাঠ শেষ হলে ঃ
- ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পদ্ধতির ধারণা করা যাবে,
- শিক্ষার প্রতি জাতীয় আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করা যাবে,
- স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা যাবে,
- নয়া শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করা যাবে এবং
- ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বর্ণনা করা যাবে।

৩০.১ প্রস্তাবনা

এই অংশে ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে শুরু করে ১৮৩৫-এর মেকলের সংক্ষিপ্ত বিধি, ১৯৫৪-এর উডের বিজ্ঞপ্তি, ১৮৮২-এর ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯০৪-এর সরকারী সিদ্ধান্ত আর ১৯০৬-এর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ, আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে শিক্ষা ও সাক্ষরতার বিষয়টি এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা আর ১৯৮৬-এর নব শিক্ষা-পদ্ধতির মূল বিষয়গুলিও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে এই অংশে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩০.২ শিক্ষায় ঔপনিবেশিক অবদান

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত দেখা যায় ১৮১৩-এর সনদের বলে প্রণীত আইন প্রবর্তনের সময় থেকে যখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাধ্য হয় ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। সেই সময়ে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ্য টাকা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এইভাবে ভারতে ওপনিবেশিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ১৮১৩ সালের সনদে কিছু অস্পষ্টতা থাকায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মধ্যে বিশুদ্ধবাদী ও ইংরেজ ভাবাপন্নদের মধ্যে তখন কিছু বিরোধীতা দেখা যায়। এটা স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশরা পশ্চিমী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষা মাধ্যম প্রবর্তন করতে চায়। অন্যদিকে বিশুদ্ধবাদীরা ইংরেজী ভাষা এবং বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়ার বিরোধী ছিলেন।

৩০.২.১ মেকলের সংক্ষিপ্ত বিধি, ১৮৩৫

লর্ড টি.বি. মেকলে (Lorn T.B. Macaulay) গভর্ণর জেনারলের প্রশাসন পরিষদে আইন বিভাগের একজন সদস্য হিসেবে ভারতে আসেন। গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁকে জনশিক্ষার জন্য গঠিত

সাধারণ সভার সভাপতি নিযুক্ত করেন। শিক্ষায় বিশুদ্ধবাদী ও ইংরেজী ভাষা-প্রধানদের তর্ক-বিতর্ক মেকলকে জানান হয়। এসবের ফল হিসেবে ১৮৩৫-এ মেকলের সংক্ষিপ্ত-বিধি প্রকাশিত হয়। মেকলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষে মতামত দেন। তিনি বলেন, "আমাদের সীমিত ক্ষমতায় সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। আমরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালভাবে এমন একটা শ্রেণী তৈরী করতে পারি যারা আমাদের মধ্যে ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ব্যাখ্যাকর্তার কাজ করতে পারবে; এই শ্রেণী রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু অভ্যাস, মতামতে, নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।" তিনি বলেন, "এই বিশেষ শ্রেণীর উপর স্বদেশী ভাষার সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে এবং পশ্চিমের শব্দভাণ্ডার থেকে বিজ্ঞানের শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের ভাষার উন্নতি সাধন করে এই শ্রেণীই দেশের বিশাল জনসংখ্যার জন্য জ্ঞান বিস্তারের বাহনের কাজ করতে পারে।" আদর্শবাদী ও ইংরেজীপন্থীদের তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটিভাবে এগুলিই মেকলের বক্তব্য। ১৮৩৫-এর মার্চ মাসের এই সিদ্ধান্তই ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম ঘোষণা।

৩০.২.২ উডের বিজ্ঞপ্তি, ১৮৫৪

মেকলের দৃষ্টিভঙ্গীকে নিশ্চিত ও জোরদার করে ১৮৫৪-এর উডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "আমরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারি যে ভারতে যে শিক্ষা আমরা বিস্তার করতে চাই তার উদ্দেশ্য হবে ব্যাপক উন্নত কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইউরোপীয় সাহিত্য; সংক্ষেপে ইউরোপীয় জ্ঞান।"

উডের ঘোষণার ফলে আইন করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করা হয়। ১৮৭৭ সালেই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা চালু করে। এরপরে ১৮৮১-তে মাদ্রাজে ও ১৮৮৩-তে বোম্বাই-এ এই ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়।

৩০.২.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৮৮২

১৮৫৪-এর উডের বিজ্ঞপ্তির সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে অসুবিধা হওয়ায় ১৮৮২-তে স্যার ইউলিয়াম হান্টারকে (বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের সদস্য) সভাপতি ও অন্য আরও কুড়িজন সদস্য নিয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। কখনও কখনও একে হান্টার (Hunter) কমিশনও বলা হয়।

এই কমিশনের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলি হ'ল ঃ (১) স্বদেশী শিক্ষায় উৎসাহ দান, (২) প্রাধমিক শিক্ষার প্রয়োগ, বিস্তার ও উন্নতির জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা করা হবে, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষারগ ক্ষেত্রে—যে সমস্ত জেলায় জনসাধারণের প্রয়োজন আছে কিন্তু সামর্থ নেই সেই সব জেলায় একটি উচ্চ আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে এবং (৪) উচ্চ বিদ্যালয়ে ওপরের শ্রেণীগুলির দু'টি ভাগে ভাগ থাকবে ঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আর অন্যটি ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য।

৩০.২.৪ সরকারী সিদ্ধান্ত ১৯০৪

লর্ড কার্জনের (Lord Curzon) আমলে ১৯০৪ সালে এক সরকারী সিদ্ধান্তে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ, জোর দিয়ে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের তরফে এটিই হবে প্রয়োজনীয় কাজ। শিক্ষা পদ্ধতির মান, আর্থিক স্থায়িত্ব, সঠিক পরিচালন সমিতি এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় উচ্চ মানের ওপর এই সিদ্ধান্তে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ঐ

একই বৎসর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষক নিয়োগ, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের উন্নতি ও শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহদানের অধিকার দেওয়া হয়। পাঁচ বছরের জন্য সিনেটে সদস্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সিনেটের সদস্যরা প্রত্যেকে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়িজন সদস্য নির্বাচনের অধিকার পায়। সিণ্ডিকেটকে আইনী মর্যাদা দান করা হয় এবং সিনেট ও সিণ্ডিকেটে অধ্যাপকদের প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করা হয়।

৩০.২.৫ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯০৬

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের পদ্ধতি ও পরিকল্পনায় অসন্তুষ্ট ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালে বাংলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ রেজিষ্ট্রি করেন। ভারতীয়দের নিজের হতে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের এটিই প্রথম নজির।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা অর্থাৎ ঃ (ক) ভারতীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান; (খ) ভারতীয় ভাষায় ভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন; (গ) শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা; (ঘ) দেশ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানেরউপর জোর দেওয়া; (ঙ) ভারতীয় জ্ঞানসহ বৈজ্ঞানিক, পেশাগত ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাদান এবং (চ) শৃঙ্খলা ও পারদর্শিতা।

দাদাভাই নওরোজী ১৮৮২-এর ১৬ই সেপ্টেম্বরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সমর্থন জানিয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কাছে একটি বিজ্ঞপ্তি পেশ করেন কিন্তু আমরা সবাই জানি যে এটি গৃহীত হয়নি। যদিও ১৮৩৩ সালে ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট শিক্ষাখাতে বিশ হাজার পাউণ্ড অনুদান দেয় আর ১৮৮২-তে ব্রিটেনে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রচলন করলে ব্রিটিশ জনসংখ্যার প্রতি সাতজনে একজন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হয়। কিন্তু ১৮৮২ সালে নওরোজী যখন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আবেদন জানান তখন ভারতে জনসংখ্যায় ১১৪ জনে ১ জন মাত্র শিক্ষার্থী। ঔপনিবেশিক শিক্ষার চিত্রটি এখানে স্পষ্ট দেখা যায়।

১৯০৬ সালে বরোদার গাইকোয়াড বরোদা রাজ্যের সর্বত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেন। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে ১৯১০ সালে গোখলে আইন পরিষদে এক প্রস্তাব আনেন এবং ১৯১১ সালে ব্রিটিশ রাজকীয় আইন পরিষদের কাছে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আইনের একটি খসড়া উত্থাপন করেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত তুলে নিতে হয় ও পরিষদে আইনের প্রস্তাবটি পরাস্ত হয়।

৩০.২.৬ শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণ

ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে বিশেষ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে একটি পদ্ধতিকে দেখান যায় যে পদ্ধতি "নিম্নাভিমুখী পরিশোধন তত্ত্ব" ("down ward filtration theory") নামে পরিচিত। ১৭৮০ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে এই এই তত্ত্ব বিকশিত হয় ও ১৮৫৪ সালে "উডের বিজ্ঞপ্তি" পর্যন্ত চালু থাকে। উডের বিজ্ঞপ্তিতে ভারতে ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর অনুরূপ একটি শাসক শ্রেণী সৃষ্টির পূর্বতন নীতির পরিবর্তন করা হয়। সেই সময়ে প্রশাসনিক দ্বিতীয় ভ্রান্তি ছিল ইংরেজীর মাধ্যমে উচ্চ-শিক্ষা প্রদান। মাধ্যমিক শ্রেণী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীই ছিল মাধ্যম এবং ভারতে একটি শাসক গোষ্ঠী তৈরী করার জন্য এর ওপরেই জোর দেওয়া হত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজী-মাধ্যম মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টাকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হত।

১৮৫৪-তে উডের বিজ্ঞপ্তিতে, ১৮৮২-এর ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ও ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের সময় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলার কথা বলা হয়। মুনরো (Munro) ও এ্যাডাম (Adam) নির্দিষ্ট করে দেখান যে, দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে জনশিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে দেশীয় স্কুলগুলি ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সরকার শিক্ষা দপ্তর খোলার ফলে ১৯০৪ সালের পর থেকে বিশেষ ধরনের তৈরী বাড়িতে নতুন ধরনের প্রাথমিক স্কুল চালু হয়। এইসব স্কুলে বিস্তৃত পাঠ্যতালিকার চলন হয়, যথেষ্ট শিক্ষিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়, নিয়মিত শিক্ষাদান ও প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এখানে ছাপান বই ও নতুন ধরনের শিক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

উনিশ শতকে শিক্ষা-জগতের বাইরের কতকগুলি কারণে শিক্ষার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, যেমন (১) ব্রিটিশের কেন্দ্রীয় ও নগরভিত্তিক প্রশাসনে গ্রামগুলি অবহেলিত হয়, (২) ব্রিটিশ প্রশাসন জনসাধারণের জীবনের মানোন্নয়নের ব্যর্থ হয় এবং (৩) শিক্ষায় আর্থিক যোগান খুব সীমিত হয়ে পড়ে। ১৮৭০ সালে মেয়োর (Mayo) নির্দেশানুসারে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী অনুদান সাধারণত মোট ব্যায়ের এক-তৃতায়াংশর বেশী হত না। ১৮৭০-এ যে সময় মেয়োর আদেশ জারি হয় ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ডে স্থানীয় কর আদায়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু ভারতে ১৮৫১ থেকে ১৮৭১-এর মধ্যে স্থানীয় কর আদায় চালু করা হয়। কিন্তু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকে।

কে. জে. সাঈডাইন (K. J. Saiyidain), জে. পে. নায়েক (J. P. Nayek) এবং আবিদ্ হোসেন (Abid Hassain) ১৮১৩ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত সময়টিকে অবহেলার সময় বলে বর্ণনা করেন।

এঁদের মতে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯০২ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে প্রচণ্ড আন্দোলনের সময়ে। এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাথমিক-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বরোদার মহারাজা সরাজি রাও গায়কোয়াডের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। তিনি ১৯০৬ সালে বরোদা রাজ্যের সর্বত্র স্বাধীন ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করেন। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে রাজকীয় আইন পরিষদের সদস্য গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ১৯১০ সালে একটি প্রস্তাব আনেন।

এইভাবে দেখা যায় বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ব্যবস্থায় খুব কমই অগ্রগতি ঘটেছে। মেকলের সংক্ষিপ্ত বিধি অনুযায়ী ভারতে একটি শাসকশ্রেণী তৈরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার উচ্চশিক্ষা উন্নতির ক্ষেত্রেই বেশী জোর দেয় যদিও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মচারী এবং চিন্তাবিদ্‌রা ব্যাপক উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সুপারিশ করেন।

৩০.৩ শিক্ষায় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯০৬ সালে বাংলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছে। সেই একই বছরে বরোদার মহারাজা সরাজি রাও গাইকোয়াড সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও মুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করেন। গোখ্‌লে ১৯১১ সালে সাম্রাজ্যের আইন পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু এটি বাতিল হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯২০ সালেই কংগ্রেসের মধ্যে শিক্ষায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য এক তীব্র জাতীয় স্বার্থ প্রতিফলিত হয়।

৩০.৩.১ জাতীয় আন্দোলন ও শিক্ষা পদ্ধতি, ১৯২০-৩৭

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব, সাহায্যপ্রাপ্ত বা নিয়ন্ত্রিত স্কুল বা কলেজের সমস্ত শিশু ও যুবকেরা পাঠ পরিত্যাগ করবে। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপকভাবে জাতীয় স্কুল ও কলেজ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। এই সময়েই, এক বছরেই আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, বাংলা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, লাহোরের কোয়ামী বিদ্যাপীঠ প্রভৃতির মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হতে দেখি। দেশীয় অর্থ ও নেতৃত্ব ভারতের জাতীয় রকংগ্রেস সর্বস্তরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করে। এইভাবে ১৯২০ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে জাতীয় ব্যক্তিগত উগ্যোগে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেখতে পাওয়া যায়। এদের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি ছিল জাতীয়। ভারতীয় রাজা, বড় জমিদার ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি এদের আর্থিক ভাবে সাহায্য করতেন আর শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সাহায্য করতেন। এই সময়ই ভারতীয় ভাষায় সংবাদ-পত্র বহুল প্রচারিত হয়। জাতির জনক ও নেতা মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষার এক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা রচনা করা হয় আর ১৯৩৭-এর হরিপুরা কংগ্রেসে এর উপর আলোচনা ও বিতর্ক হবার পর গৃহীত হয়। ব্রিটিশ সরকার এরং সময় প্রাদেশিক স্বাধিকার প্রলচন করে ও অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আসীন করে। সুতরাং ১৯৩৭ সালে দেশের সর্বত্রই বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলিত হয়।

৩০.৩.২ বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা

বুনিদায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা সাধারণের কাছে ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা বলে পরিচিত। এই বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শেখা এই পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় ধারণা আর এটিকে নিয়েই পরবর্তীকালে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে জাতীয় কর্মীদের সমাবেশে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষা হবে কায়িক শ্রম অবলম্বনে কিছু সৃষ্টিশীল কাজ। পরবর্তীকালে ১৯৭৮-এর আদেশিষিয়া কমিটিতে এই ধারণাকেই বলা হয় 'সমাজ-হিতকারী সৃষ্টিশীল কাজ'। এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, যদি শিশুরা কোন সমাজ-হিতকারী সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণ করে তাহলে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাধা দূর হয়ে শ্রমের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হবে। জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ সাধনের জন্য এই ধারণার প্রয়োজন মনে করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয় তিনটি দিক আছে, যেমন হাতের কাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। এই ব্যবস্থার সমস্ত দিকই হ'ল জীবনের মূল শিক্ষায় জ্ঞানের সাথে দক্ষতার সমন্বয় সাধন। পরবর্তীকালে এটিই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দেয়। বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করতে সাত বছর সময় লাগে। চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা থাকলেও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন হবার পর শিক্ষার সর্ব্বস্তরে এটিই প্রধান জাতীয় প্রচেষ্টা হয়ে দেখা দেয়।

বুনিয়াদী শিক্ষায় পাঠ্যতালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। প্রয়োজনীয় হাতের কাজ—যেমন, সুতাকাটা ও কাপড় বোনা, কাঠের কাজ, কৃষিকাজ, ফল ও শাকসব্জির বাগান করা, চামড়ার কাজ বা স্থানীয় ও ভৌগলিক পরিবেশ যে সমস্ত কাজে সাহায্য করে।

২। মাতৃভাষা ঃ ভাষা শিক্ষায় সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়।

৩। অঙ্ক ঃ ব্যবস্থা-পদ্ধতি ও হিসাবনিকাশ রাখার জন্য যেন অঙ্কের ওপর জোর দেওয়া হয়।

৪। সমাজ-বিদ্যা।

৫। সাধারণ বিজ্ঞান।

৬। অঙ্কন।

৭। সঙ্গীত।

৮। হিন্দুস্থানী—শিশুরা যাতে জাতীয় ভাষায় কিছু দক্ষতা লাভ করে তার জন্য হিন্দুস্থানী কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দীর বদলে হিন্দুস্থানীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণকথ্য ভাষা যার সঙ্গে সামান্য উর্দুও মিশ্রিত আছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

এই পাঠ্যতালিকায় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই কাম্য বলে মনে করা হয় না। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে মেয়েরা হাতের কাজের বদলে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান গ্রহণ করবে বলা হয়।

৩০.৩.৩ সার্জেন্ট রিপোর্ট, ১৯৪৪

ঔপনিবেশিক শাসনকালে আর একটি মাত্র বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় যা ১৯৪৪-এ প্রকাশিত "যুদ্ধ পরবর্তী শিক্ষার বিকাশ" নামে, সাধারণের কাছে সার্জেন্ট রিপোর্ট বলে পরিচিত। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড অনুসৃত বুনিদায়ী শিক্ষার ধারণাই সার্জেন্ট রিপোর্টে গৃহীত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এই রিপোর্টে দুই স্তরে ভাগ করা হয় ঃ নিম্নবুনিদায়ী ও উচ্চ-বুনিয়াদী। নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরে পাঁচ বছর আর উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরে তিন বছর সময় লাগে। সাধারণভাবে এটি পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা ও তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল।

সার্জেন্ট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে নিম্ন-বুনিয়াদী ও উচ্চ-বুনিদী শিক্ষার নির্দেশ দেয়।

বুনিয়াদী ধাঁচের ব্যবস্থা ছাড়াও সার্জেন্ট রিপোর্টে প্রাক্-প্রথমিক স্কুলের কথাও বলেছে। রিপোর্ট এছাড়াও দু'ধরণের হাইস্কুলের কথা বলে এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম চলবে ছয় বছর ধরে আর এই স্কুলে ভর্তির বয়স হবে সাধারণত এগার বছর। দু'ধরনের হাইস্কুলের পরিকল্পনা করা হয় ঃ পঠন-পাঠন ও প্রযুক্তি বিষয়ক।

উচ্চ মাধ্যমিকের ছ'বছর শিক্ষাক্রম নির্দেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে সার্জেন্ট রিপোর্ট ইন্টারমিডিয়েট পাঠক্রম তুলে দেবার সুপারিশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক ডিগ্রী হিসাবে সার্জেন্ট রিপোর্ট তিন বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রবর্ত্তন করার সুপারিশ করে। এইভাবে সার্জেন্ট রিপোর্টেই আমরা প্রথম বর্তমানের শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) ১০ + ২ + ৩ ব্যবস্থার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করা দেখতে পাই।

অনুশীলনী ১

১। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম ঘোষণা কি ? (সঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দিন)

(ক) উডের বিজ্ঞপ্তি।

(খ) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন।

(গ) মেকলের সংক্ষিপ্ত-বিধি।

(ঘ) ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত।

২। "নিম্নমুখী পরিশোধন তত্ত্ব" বলতে কি বোঝায়? (উত্তরের জন্য দু'টি লাইন ব্যবহার করুন)

.....

.....

৩। প্রাক্-স্বাধীন ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল? (সঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দিন)

(ক) বুনিয়াদী শিক্ষা।

(খ) শিক্ষায় বুনিয়াদী পদ্ধতি।

(গ) শিক্ষায় ওর্য়াধা পরিকল্পনা।

(ঘ) শিক্ষায় মেহ্তা পরিকল্পনা।

৩০.৪ স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতে শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) বেশ কিছু সংখ্যক সুপারিশ করে। ১৯৬৮-তে ভারত সরকার নীতিগতভাবে শিক্ষা কমিশনের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সময় থেকেই ১৯৬৮-এর নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেই ভারতে শিক্ষার বিকাশ হতে থাকে।

৩০.৪.১ স্কুলে ছাত্রভর্তির হার

ভারতে শিক্ষাবিকাশের ক্ষেত্রে কিছু তথ্য যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করে। নীচের তালিকায় বয়ঃক্রম, অঞ্চল ও নারী-পুরুষ ভেদাভেদে ভারতে কতকগুলি প্রধান রাজ্যে শিশুদের উপস্থিতির শতকরা হার দেখান হয়েছে। (উৎস ঃ আদমসুমারী ১৯৮১)।

	৫-৯ বছর			১০-১৪ বছর		
	ব্যক্তি	ছেলে	মেয়ে	ব্যক্তি	ছেলে	মেয়ে
সার্বিক	৩৮.৪৫	৪৪.৩৩	৩২.২১	৫০.৪৫	৬২.০৭	৩৭.৪৭
গ্রাম	৩২.৯৫	৩৯.৬৩	২৫.৮৩	৪৪.২৭	৫৭.৭৫	২৯.১৮
শহর	৫৮.৬৯	৬১.৬৫	৫৫.৫৫	৭১.৫৮	৭৭.০০	৬৫.৬০

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যায় ৫-৯ বছরের শিশুদের শতকরা ৯১ জন স্কুলে যায়। ৫-১১ বছরের অবশিষ্ট শিশুদের স্কুলে আনা খুব একটা অসুবিধার নয়। কিন্তু অসুবিধা হ'ল, ১০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ২,০০,০০০ জনবসতি থেকে ছাত্র আনতে হবে। এছাড়াও বহু বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও দুর্গম এলাকা আছে। আবার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিনিষেধও আছে। আদিবাসী ও উপজাতিদের মত সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্রতর শ্রেণীদেরও স্কুলে আনতে হবে। ৭ম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় সার্বিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা। মাধ্যমিক স্তরে অবশ্য কিছু ঘাটতি থেকেই যাবে। চতুর্থ সর্বভারতীয় সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী ১১-১৪ বছরের মাধ্যমিক স্তরের এই অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৮২-৮৩ এর মধ্যে স্বীকৃত স্কুলের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

প্রাক্-প্রাথমিক স্কুল	১২,৭১৬
প্রাথমিক স্কুল	৫,০৩,৭৪১
মাধ্যমিক স্কুল	১,২৩,৩২৩
উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	৫২,২৭৯

এতে মোট প্রায় ৭ লক্ষ স্কুলের উল্লেখ আছে। ১৯৮১-৮২তে তালিকাভুক্ত শিশুদের সংখ্যা ১০ কোটি। ১৯৮২-৮৩-তে স্কুল স্তরে প্রাথমিক-শিক্ষক সংখ্যা ১৩ লক্ষ, মাধ্যমিক স্তরে ৮.৫ লক্ষ আর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯.৯৩ লক্ষ্য; মোট সংখ্যা ৩১.৪ লক্ষ্য। এতে দেখা যায় ১৯৮২-৮৩ তে ৭ লক্ষ্য স্কুল, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১০ কোটি ছাত্র ও মোটামুটি ভাবে ৩০ লক্ষ শিক্ষক।

আমাদের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে বলা আছে যে, রাষ্ট্র ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে স্বাধীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে আর এরই ফলে ভারতে স্কুল-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার দেখতে পাই। এটা দেখা যায়, ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্যে আমরা উপস্থিত হয়েছি আর মনে হয় শতকের শেষে ১৪ বছরের লক্ষ্য উত্তীর্ণ হতে পারে যাবে।

৩০.৪.২ পশ্চাদ্‌গামী রাজ্যে শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রক ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে নয়টি রাজ্যকে "পশ্চাদ্‌গামী" বলে চিহ্নিত করেছে। এই সমস্ত পশ্চাদ্‌গামী রাজ্যের ব্যাপক হারে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সাহায্য নিয়ে বিশেষ চেষ্টা চালান হচ্ছে। মেয়ে, উপজাতি ও আদিবাসীদের থেকে ব্যাপক ছাত্র ভর্তি করার সংহত প্রচেষ্টা ছাড়াও স্কুল-বাড়ী, আসবাব-পত্র ও অন্যান্য উপাদান এবং বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন। দেশের এমন কিছু অংশ আছে যেখানে প্রায়ই বন্যা হয়ে থাকে, বেশ কিছু জমি আছে নিম্বলা, এ ছাড়াও পাহাড়ী এলাকায় মানুষ এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে থাকে। এ কারণে, এ সমস্ত পশ্চাদ্‌গামী রাজ্যের বহু অংশে যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্র-ভর্তি করা সম্ভব নয়। একজন শিক্ষক পরিচালিত স্কুলের হার যথেষ্ট বেশি কারণ এই সমস্ত স্কুলে আরেকজন বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের জন্য খুব বেশী পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। এক শিক্ষক-পরিচালিত স্কুলে বেশ কিছু ছাত্র শিক্ষকের যথেষ্ট নজর পায় না, এর ফলে তারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক স্তরে আরও বেশী সংখ্যক স্কুলের প্রয়োজন হয়। যদি এর সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার কথা বলা হয় এর সংখ্যা আরও বেশী হবে। আমরা নীচের তালিকা তুলে ধরতে "Education Commission and After" নামে ১৯৮২ প্রকাশিত জে. পি. নায়েকের বই থেকে উদ্ধৃত করতে পারি।

১ম থেকে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তির হার (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭-৭৮)

১ম থেকে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তির হার (১০ লক্ষ অনুপাতে)

	ছেলে মেয়ে	সমষ্টি	
১৯৫০-৫১	১৩.৭৭	৫.৩৯	১৯.১৬
	(৬০-৬)	(২৪.৮)	(৪৩.১)
১৯৬৫-৬৬	৩২.১৮	১৮.২৯	৫০.৪৭
	(৯৬.৩)	(৫৬.৫)	(৭৬.৭)

১৯৭৫-৭৬	৪০.৬৫	২৫.০১	৬৫.৬৬
	(১০০.৪)	(৬৬.১)	(৮৩.৮)
১৯৭৭-৭৮	৪০.৫৪	২৪.৫২	৬৫.০৬
	(৯৭.৪)	(৬২.৬)	(৮০.৫)

*বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা ৬-১১ বছরের সমষ্টির শতকরা হিসেব।

৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তির হার (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭৭-৭৮)

৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তির হার (১০ লক্ষ অনুপাতে)

	ছেলে মেয়ে	সমষ্টি	
১৯৫০-৫১	২.৫৯	০.৫৩	৩.১২
	(২০.৬)	(৪.৬)	(১২.৯)
১৯৬৫-৬৬	৭.৬৮	২.৮৫	১০.৫৩
	(৪৪.২)	(১৭.০)	(৩০.৮)
১৯৭৫-৭৬	১০.৯৯	৫.০৩	১৬.০২
	(৪৮.৬)	(২৩.৯)	(৩৬.৭)
১৯৭৭-৭৮	১২.১৯	৫.৯৬	১৮.১৫
	(৪৮.৬)	(২৪.৪)	(৩৬.৯)

* বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা ১-১৪ বছরের সমষ্টির শতকরা হিসেব।

উল্লিখিত তালিকা দুটিতে ১৯৭৮ পর্যন্ত ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি ৭ম পরিকল্পনার সময়ে ১৯৯০ সালে সম্ভব হয়নি। কিন্তু, দেখা যায় যে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে ১১ থেকে ১৪ বছরের মেয়েদের নাম নথিভুক্ত করা যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ। যদি এভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয় তবে ২০০০ সালে কাজ সম্পন্ন হবে।

৩০.৪.৩ উচ্চ-শিক্ষা

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত দ্রুত ও বিস্তৃত উচ্চ-শিক্ষার যুগ। ১৯৭৭-৭৮-এ উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল প্রায় ৯০০০ যার মধ্যে ১২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৭টি গবেষণা কেন্দ্র, সাধারণ শিক্ষার জন্য কলেজ ৩,৮৪৮টি, বৃত্তিমূলক শিক্ষার কলেজ ৩,৩২৮টি, আর অনান্য শিক্ষার জন্য কলেজ ছিল ১,৩৯৯টি। ১৯৭৭-৭৮এ মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল, ৫,৬৩,০০০। এই সময়ে উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২,৩৫,০০০। জে. পি. নায়েক মন্তব্য করেন, "এ ব্যাপার...খুব আশ্চর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে যদি উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট আরও চলতে থাকে; শিক্ষিত লোকের অধিক সৃষ্টি ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষিত বেকারসৃষ্টি করে ছাত্রদের মতিগতি দুর্বল করবে, শিক্ষাক্ষেত্রে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে; প্রায়শই প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে, মানের অবনতি ঘটবে এবং সবার ওপরে নীতিহীনতা ও যা কিছু করা হবে তার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে না।" তখনকার পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জে. ডি. শেঠি ১৯৮৩ সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত তাঁর বই "The crisis and Collapse of Higher Education in India" -তে বলেন, মোট জাতীয় আয় (GNP) বছরে ৬ থেকে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় ১১ থেকে ১২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পয়েছে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৩.৫ থেকে ৪.৫ শতাংশ আর

মাথাপছু ব্যয় বেড়েছে ৯ থেকে ১০ শতাংশ। কেউ বলতে পারে না যে, সরকার ও পরিকল্পনাবিদ্‌রা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ যোগান দেননি।"

তিনি বলেন "জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে বৈজ্ঞানিক জনবল এখনও যথেষ্ট কম। জনসংখ্যার প্রতি ১০০০-এ ভারতে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা ৩.৬ জন যেখানে তুলনামূলকভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১২, পশ্চিম জার্মানীতে ১৯, সোভিয়েত রাশিয়ায় ৮২ ও জাপানে ১৮৫ জন।"

তিনি আরও বলেন "আমাদের দেশে গবেষণা ও উন্নতির কাজে রত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা প্রতি ১০০০-এ ০.৯ জন, তুলনামূলক ভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ২.৬৪, পশ্চিম জার্মানীতে ২.৯৭, সোভিয়েত রাশিয়ায় ৩.৭২ ও পোলাণ্ডে ৪.৯৯ জন।"

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের প্রাপ্ত তথ্য হিসেবে দেখা যায় নিবন্ধিকৃত চাকরী প্রার্থীর সংখ্যা ১৯৬১-তে ১৮.৩৩ লাখ থেকে ১৯৭৮-এ ১২৬.৭৪ লাখ হয়ে বার্ষিক হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ১২। জে.ডি.শেঠি আরও বলেছেন ম্যাট্রিকুলেটদের সংখ্যা যেক্ষেত্রে বৎসরে শতকরা ১৪.৫ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক ২৩ শতাংশ হারে।

এভাবে উচ্চশিক্ষার তথ্যগুলি চিন্তার উদ্রেক করে। একদিকে আমাদের বেশী-সংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ প্রয়োজন, অন্যদিকে মধ্যবর্তী স্তরে ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শেঠির মতে একজন সাধারণ স্নাতকের জন্য আমাদের বছরে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়। এ সমস্তই অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।

৩০.৪.৪ উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের স্তর

স্বাধীনতার সময় থেকে উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে স্পষ্ট দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায় ঃ (১) দ্রুত বিস্তারের সময় আর (২) স্থিতিশীলতার সময়। ১৯৭৫-৭৬ ও ১৯৮১-৮২-এর মধ্যে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩.৯। দেখতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মধ্যে কলা ও বাণিজ্য শাখায় বৃদ্ধির হার বিজ্ঞান শাখায় বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি। স্তর বিশেষ লক্ষ্য করলে দেখা যায় স্নাতক স্তরে কলা ও বাণিজ্য শাখায় ভর্তির সংখ্যাই বেশি। উচ্চ-শিক্ষা ক্ষেত্রে স্নাতক স্তরে ভর্তির ৯০ শতাংশ এই হারেই চলছে আর গত কুড়ি বছরে এর কোন হেরফের হয়নি।

উচ্চ-শিক্ষায় অনেক অসাম্য দেখা যায় ঃ

(১) উপজাতি ও অন্যান্যদের মধ্যে; (২) আদিবাসী ও অন্যান্যদের মধ্যে; (৩) পুরুষ ও নারীর মধ্যে; এবং (৪) উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের ক্ষেত্রে।

১৯৭৭-৭৮-এ সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতিদের হার ছিল ৭.৭ শতাংশ ও বৃত্তি শিক্ষায় ৭ শতাংশ। উচ্চ-শিক্ষায় নারীদের অংশ ছিল ২৭.৭ শতাংশ। পুরুষ ও নারী উচ্চ-শিক্ষায় অনুপাত ছিল ৩ ঃ ১।

৩০.৪.৫ উচ্চ-শিক্ষার সমস্যা

উচ্চ শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি ছিল ঃ

১। প্রবণতার সমস্যা ঃ

(ক) গুণগত বনাম পরিমাণগত (খ) সমতা বনাম দক্ষতা

(গ) মূল্যবোধ বনাম উপযোগিতা (ঘ) প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা বনাম বিচ্ছিন্নতা

২। বিষয়ের সমস্যা ঃ

(ক) সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ (খ) শিক্ষা ও শিক্ষণ

(গ) বিশেষজ্ঞ ও সাধারণবোধ-সম্পন্ন

৩। পরিচালনার সমস্যা ঃ

(ক) এককেন্দ্রীকরণ ও বিচ্ছুরণ (খ) স্বাধিকার ও দায়িত্ববোধ

(গ) গণতন্ত্র ও কেন্দ্রীকরণ (ঘ) মূল্যবোধ ও মূল্য-আরোপন

অনুশীলনী ২

১। স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৬৮ পর্যন্ত কোন্ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়? (সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন)

(ক) সার্জেন্ট রিপোর্ট (খ) নওরোজী রিপোর্ট

(গ) মেকলে রিপোর্ট (ঘ) নায়েক রিপোর্ট

২। শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে ক'টি রাজ্যকে পশ্চাদ্‌গামী বলে চিহ্নিত করা হয়? (সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন)

(ক) ৫টি রাজ্য (খ) ৬টি রাজ্য

(গ) ৯টি রাজ্য (ঘ) ১০টি রাজ্য

৩। ভারতে উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কয়টি পর্যায় দেখা যায়? দু-লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

৪। উচ্চ-শিক্ষার তিনটি প্রধান সমস্যা উল্লেখ করুন।

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

৩০.৫ নতুন শিক্ষানীতির অভিমুখে

বর্তমানে ঘোষিত নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার চারটি দিক আছে। এগুলি হ'ল ঃ

(ক) পরিমাণগত বিস্তার

(খ) ন্যায়পরায়ণতা

(গ) ঔৎকর্ষ ও উদ্ভাবনী-শক্তি

(ঘ) জাতীয়, মানবিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ

৩০.৫.১ পরিমাণগত বিস্তার

প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১৯৫১-তে ২০.৯ লাখ থেকেবৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫-তে ৫.৫ লাখ হয়েছে। মধ্যবর্তী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ১০ গুণ ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫-তে মধ্য শিক্ষার জন্য স্কুল ১$^{১}/_{২}$ লাখ ও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে ৬০,০০০ হয়েছে। ১৯৫০-৫১-তে ৫৪৮টি কলেজ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫-তে ৩,৫০০টি হয়েছে। এই সমস্ত সংখ্যা কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর সাথে যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার কলেজ যোগ করা হয় তাহ'লে ১৯৮৫তে কলেজের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০০০। শিক্ষায় এ এক ব্যাপক বিস্তার। আগেই বলা হয়েছে, ১৯৮৫-তে ছাত্রের সংখ্যা ১০ কোটির বেশী আর শিক্ষক সংখ্যাও ৩৫ লক্ষের বেশী। মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ও শিক্ষার প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে বলা যেতে পারে যে সামনের কয়েক বছরে শিক্ষার পরিমাণগত বিস্তারের হার বেশি হবে।

অবশ্যই চোখে পড়বে যে, উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে এবং দরিদ্রতর শ্রেণীর জনসংখ্যার ক্ষেত্রে মেয়ে ও শিশুদের ভর্তির হার যথেষ্টই কম। আগেই বলা হয়েছে, এজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৯টি নির্দিষ্ট রাজ্যে। যেখানে মেয়েদের তপশীলিজাতি ও আদিবাসীদের, ভর্তির হার খুব কম।

পরিমাণগত বিস্তার শুধুমাত্র প্রথাগত কয়েক বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর বিস্তার হতে হবে। প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষার প্রয়োজন পাহাড়ী এলাকা, বিশে, করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, শহরাঞ্চলে বস্তি ও শিশু শ্রমিক প্রভৃতিদের এলাকা।

৩০.৫.২ ন্যায়পরায়ণতা

নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার সুযোগের সমতার উপরে জোর দিয়েছে, বিশেষতঃ, যারা এতদিন সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছে তাদেরই নির্দিষ্ট প্রয়োজনের ক্ষেত্রে।

১। **নারীর সমতার জন্য শিক্ষা ঃ** শিক্ষাকে নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে মৌল পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। নয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন ভাবে রচিত পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকদের শিক্ষণ ও মনোভাদ পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী, প্রশাসক এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ভূমিকা সহযোগে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। কর্মমুখী, প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণে বিশে, জোর দেওয়া হবে।

২। **তপশীলভুক্ত জাতির জন্য শিক্ষা ঃ** সারা দেশে শিক্ষার সমস্ত স্তরে ও পর্যায়ে তপশীলি জাতি ও অ-তপশীলি জাতির মধ্যে সমতা আনাই তপশীলি জাতির শিক্ষার উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু। এই উদ্দেশ্যে নিম্নেলিখিত কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

(ক) দরিদ্র পরিবারগুলিকে তাদের সন্তানদের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত স্কুলে পাঠাবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দানের ব্যবস্থা।

(খ) নীচুস্তরের, অত্যন্ত অধস্তন কাজে নিযুক্ত পরিবারে, য়েমন মেথর ইত্যাদির সন্তানদের প্রাক্-ম্যাট্রিক বৃত্তিপ্রদানের ব্যবস্থা।

(গ) তপশীলি জাতির মধ্য থেকেই শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে ও নিকটবর্তী এলাকায় স্কুল বাড়ী তৈরী করতে হবে যাতে ঐ জাতিভুক্ত শিশুরা সহজেই আসতে পারে। নয়া শিক্ষা নীতিতে এ ধরনের কতকগুলি ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৩। **আদিবাসীদের শিক্ষা ঃ**

(ক) আদিবাসী এলাকায় প্রাথমিক স্কুল স্থাপনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(খ) শিক্ষিত ও উদ্যোগী আদিবাসী-যুবকদের আদিবাসী এলাকায় শিক্ষকতার জন্য উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(গ) আবাসিক স্কুল ও আশ্রম-বিদ্যালয় প্রভৃতি ব্যাপক প্রচলন করতে হবে।

নয়া শিক্ষা-নীতিতে এ-ধরনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই নীতি শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অংশ ও অঞ্চল, বিশেষ করে গ্রামীন এলাকা, পার্বত্য ও মরুভূমি অঞ্চল, দূরবর্তী ও দুর্গম্য এলাকা এবং দ্বীপ অঞ্চলে বিশেষ কতকগুলি পরিকল্পনার উল্লেখ করেছে। সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রয়োজনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কতকগুলি বিশেষ, মনোযোগ দিতে হবে।

৩০.৫.৩ ঔৎকর্ষ ও উদ্ভাবনী শক্তি

এই নীতির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের কাজের ঔৎকর্ষকে স্বীকৃতি দিতে ও পুরস্কৃত করতে হবে। নিম্ন-মানের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব রোধ করতে হবে। সমস্ত বিভাগকে সংশ্লিষ্ট করে উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনীশক্তি সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।"

"নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব ও নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন মাত্রায় অন্তর্নিহিত শিক্ষা-প্রশানের ও আর্থিক স্বাধিকার দিতে হবে।" সেকেলে মনোভাব দূর করে বেশী মাত্রায় আধুনিকীকরণের সুযোগ করে দিতে হবে।

৩০.৫.৪ জাতীয়, মানবিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ

নয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘোষণা করা হয়েছে, "প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের ক্রমবর্দ্ধমান অবক্ষয় ও সমাজে নৈরাশ্য শিক্ষকে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশসাধনের হাতিয়ার করার উদ্দেশ্যে পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।"

"আমাদের কৃষ্টিগত বহুত্ববাদী সমাজে জনগণের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা এবং সার্বজনীন ও অবিভক্ত মূল্যাবোধকে রক্ষা করা উচিত। শিক্ষার অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা, উগ্রতা, কু-সংস্কার ও অদৃষ্টবাদ দুর করতে সাহায্য করা উচিত।"

"এই সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা ছাড়াও উত্তরাধিকার, জাতীয় লক্ষ্য ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে মূল্যবোধ-শিক্ষার এক গভীর সুস্পষ্ট যোগ আছে। এই সারমর্মের দিকেই শিক্ষার প্রথম জোর দেওয়া উচিত।" এখানে বিশেষ করে বলা দরকার যে, জাতপাতের বিভিন্ন লক্ষ্যণীয় গতিপ্রকৃতি, সংকীর্ণ ভাষাগত বিবেচনা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে মূল্যবোধ, মানবিকতা ও সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। যে কেউ সমকালীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে, নানা জাতপাতের মধ্যে ও নানা সাম্প্রদায়িক শ্রেণীর মধ্যে বহু দ্বন্দ্বের ঘটনায় অবাক হয়ে যাবে। স্কুল স্তরে ও পরবর্তীকালের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাবের মোকাবিলা করা। সর্বস্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে তাই অবশ্যই মানবিকতা, জাতীয়তাবাদ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার মূল্যবোধ উজ্জীবিত করার কথা স্পষ্ট বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৩০.৬ প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সমাজ-পরিবর্তন

সমাজ পরিবর্তনের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল ঃ শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিকাশ। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির সাথে সাথে বিবর্তনের পথে মানুষ কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। এটা অবশ্যই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, মানব-সমাজের বিকাশে নতুন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষ প্রকৃতি ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে নতুন সম্পর্কবোধ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশ মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে এক প্রচণ্ড অগ্রগতি সৃষ্টি করে ও পৃথিবীব্যাপী এর বিস্তারের বিশেষ, গতি দেখা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে তাই আমরা খাদ্য উৎপাদনে বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাই। অবশ্য প্রযুক্তি ব্যাপক হারে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য করে ফেলেছে, তাই আজ সঠিক প্রযুক্তির প্রশ্ন এত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক কালে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ এক ব্যাপক বিষয় হিসাবে চিহ্নিত, যেমন দেখা গিয়েছে মানব-সমাজের বিকাশের গোড়ার দিকে অর্থাৎ পরিবর্তন যখন মানুষকে অভিযোজনীয় পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেছিল। মানব-সমাজের কাহিনী একটি বিশেষ ধাঁচের শিল্প বা কারিগরীর পদ্ধতি বা অন্যকিছু সৃষ্টি যা মানুষের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে, তার কাহিনী বলে মনে হয়। নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষার প্রয়োজন এবং তা মানব সম্পর্কের মধ্যে যথাযথ পরিবর্তনও আনে। এ কারণে সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তির গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা উচিত।

শিক্ষাই ব্রিটিশ যুগে ভারতীয়দের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে মৌলিক ও স্থায়ী পরিবর্তন এনেছিল। শিক্ষাই সমাজে নতুন প্রতিষ্ঠান, জ্ঞান, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছে। আধুনিক জীবনধারা সৃষ্টি, প্রাগ্রসর যোগাযোগ ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় অধিক হারে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণ এবং ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্ভব হয়েছে শিক্ষার দ্বারা। স্কুল ও কলেজের বিস্তার ও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ভারতের এক বিশাল সংখ্যক মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক ও সনাতন জ্ঞান বিতরণ সম্ভব হয়। বই, পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের প্রকাশন জনগণের কাছে জ্ঞানের জগতের সীমারেখাকে এগিয়ে দেয়।

সাধারণভাবে সমাজ-পরিবর্তনের পথে ও সংস্কৃতয়াণ, পশ্চিমীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে শিক্ষা যথেষ্টই অবদান রেখেছে।

সমাজে জনসাধারণের এক বিশেষ, অংশের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে শিক্ষা একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। শহরাঞ্চলে কর্মসৃষ্টির সুযোগের বাইরেও শিক্ষিত-সমাজে বিশেষ আত্ম-মর্যাদাবোধের সৃষ্টি করেছে শিক্ষা। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য কমাতে ও শিক্ষিত-জনসমাজের সংহতি বাড়াতে শিক্ষা বিশেষভাবে কার্যকরী। ভারতীয় জনসমাজের সমস্ত অংশ যদিও সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ পায়নি; তবুও মূল্যবোধ, আচরণ ও জীবনধারায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ও সমাজে নতুন আদর্শ সৃষ্টিতে শিক্ষা অবশ্যই বিশেষ অবদান রেখেছে।

গ্রামাঞ্চলে কোন বিশেষ জাতের প্রাধান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষাকেই একটি বিশেষ, বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। জাতপাত ব্যবস্থায় শিক্ষাই উল্লম্বী সচলতা (upward mobility) ঘটাতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ জাতপাতের ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াণের ফলে উল্লম্বী সচতলা ঘটে থাকে। অবশ্যই শিক্ষার ফলেই এ সমস্ত ঘটে থাকে।

পশ্চিমীকরণের শক্তিগুলি শিক্ষার জোরে কার্যকরী হয়। পশ্চিমীকরণ পুরানো প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল (সতী প্রথা, শিশুবিবাহ, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি) ও নতুন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে (যেমন সংবাদপত্র, নির্বাচন, আমলাতন্ত্র, আইন ও বিচার ইত্যাদি। পশ্চিমীকরণ মানবিকতাবাদের মূল্যবোধ সৃষ্টি করে যা মানব-হিতের জন্য বর্ণ, অর্থ, ধর্ম, বয়স ও নারী-পুরুষ প্রভৃতি নির্বিশেষে সচেতনভাবে কার্যকর থাকে।

শিক্ষা ভারতে আধুনিকীকরণের প্রভাবকে মসৃণ করেছে। পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তাদের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কৃতির লেনদেনের পথও এর ফলে জোরদার হয়ে ওঠে। এই সময়ে সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে শিক্ষা অবশ্যই বিশেষ, অবদান রেখেছে ও প্রবুদ্ধীকরণের শক্তিগুলিকে উদ্দীপ্ত করেছে। রাজা রামমোহন রায় বাংলায় নবজাগরণের সূত্রপাত করেন।

শিক্ষা ভারতীয় সমাজে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে। ধর্মীয় বলতে আগ যা বোঝাত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে এখন আর তা বোঝায় না এবং সমাজের বিভিন্ন দিকে, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও নৈতিকতায় এর বিভিন্ন প্রায়োগ আছে। প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মতবাদের পরিবর্তন হিসেবে এই ব্যবস্থা যুক্তিবাদী আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার করেছে।

শিক্ষা ভারতে জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করেছে। এদেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই স্বাধীনতা আন্দোলনে মূল নেতৃত্ব দিয়েছেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষাকেই দ্রুত সমাজ পরিবর্তন, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমাজে আধুনিকতার ভিত্তিপ্রস্তর বলে মনে করা হয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা এক নির্দ্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। যাই হোক, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগই ভারতের বিশাল জনগণকে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষিত বেকার সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের শিক্ষা নীতিকে নতুন ধারায় পরিচালিত করার এটা যথেষ্ট উপযুক্ত সময়। আমাদের সমাজের পরিবর্তিত প্রয়োজনের জন্যই নয়া শিক্ষা নীতি তৈরী হয়েছে।

অনুশীলনী ৩

১। নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় চারটি দিক কি কি ?

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

(ঘ) .....

২। শিক্ষায় সমান সুযোগের জন্য কোন্ কোন বিশে, ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে?

.....

.....

৩০.৭ সারাংশ

এই এককে ভারতে শিক্ষার উন্নতির বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ও তার পরবর্তীকালের শিক্ষা নীতিসমূহকে এখানে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ও জাতীয় সরকারের শিক্ষা নীতির প্রধান উপাদানগুলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার পরিবর্তনের প্রধান সমস্যাগুলির সাথে সাথে এখানে শিক্ষা-ব্যবস্থাও নিরীক্ষণ করা হয়েছে। এই এককে ভারতে উন্নতি ও সমাজ পরিবর্তনের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

Agarwal, J.C. : Landmark in the History of Modern Indian Education, 1984. Vikas Publishing House, New Delhi.

Naik, J. P. The Education Commission and After. Allied Publishers, 1982. New Delhi.

Srinivas, M.N. : Social Change in Modern India. Orient Longman, 1967. New Delhi.

৩০.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। (গ)

২। ইংলণ্ডের অভিজাতশ্রেণীর অনুরূপে ভারতে একটি শাসকশ্রেণী গড়ে তোলা।

৩। (গ)

অনুশীলনী ২

১। (ক)

২। (খ)

৩। দ্রুত বিস্তারের যুগ ও স্থিতিস্থাপতার যুগ।

৪। প্রবণতার সমস্যা, বিষয়ের সমস্যা, পরিচালনের সমস্যা।

অনুশীলনী ৩

১। (ক) গুণগত বিস্তার।

(খ) সমতা।

(গ) উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনী শক্তি।

(ঘ) জাতীয় ও মানবিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ।

২। নারীর সমান অধিকারের জন্য শিক্ষা, তপশীলিজাতির জন্য শিক্ষা, আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা।

পর্যায় ৮

ভারতবর্ষ ও বর্তমান বিশ্ব

আগের পর্যায়গুলিতে ভারতীয় প্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তন ও তার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে পাঠ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে ঐ সমস্যাগুলিই বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করে আলোচনার চেষ্টা হবে। এজন্য চারটি আলোচ্য বিষয়বস্তু চিহ্নিত হয়েছে। বিস্তারিত ভাবে সেগুলি হল ঃ শান্তি, বাস্তুরীতি, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারণ এবং বর্ণবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

একক ৩১-এ বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চলতি সংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। সেখানে বলা হবে পুরোন, অবশিষ্ট উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিয়ার একাধিক দেশে যে সংগ্রাম চলছে তার কথা (যেমন, পশ্চিম সাহারা অঞ্চলে) এবং বিশেষ করে শক্তিশালী নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধেও — যুগপৎ বহুজাতিক সংস্থাসমূহের রাজনৈতিক কৌশলের এবং সামরিক শক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশসমূহে এই নয়া উপনিবেশবাদ বর্ণদ্বেষী মতবাদ এবং অভ্যন্তরীণ বিসংবাদ ছড়াতেও উস্কানি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং আধিপত্যের এইসব নিদর্শনের বিরুদ্ধে ভারত নিরন্তর প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এ সব দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে প্রভূত উৎসাহ জুগিয়েছে।

৩২ সংখ্যক এককে পরমাণু অস্ত্রের প্রসারের ফলে যে অদ্ভুত বিশ্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিচয় দেওয়া হবে। মহাশক্তি সমূহের সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেলে যে পারমাণবিক শৈত্যের বিভীষিকা দেখা দিতে পারে এবং এই দুর্দিন ঠেকিয়ে রাখতে অধুনা শান্তির সপক্ষে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। শান্তির সপক্ষে নেওয়া উদ্যোগে দুনিয়া জোড়া শান্তি-আন্দোলনের গুরুত্বও এখানে দেখানো হয়েছে। শান্তি ও অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামতের আলোচনা শান্তির এই বিকল্প চেহারাকে আরও মূর্ত করে তুলবে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিবেশ ভারসাম্যহীনতার সমস্যার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে ৩৩ সংখ্যক এককে। প্রতিবেশ ভারসাম্যের প্রকৃতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই এককে লোভার্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্ররোচনায় যে ব্যাপক অরণ্যসংহার (যেমন ইন্দোনেশিয়ায়) চলছে তার ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। ঐ সঙ্গে পেট্রোরাসায়নিক অথবা পরমাণুজাত শক্তি কিংবা সাম্প্রতিককালের পরমাণু অস্ত্রপ্রসারের বাড়াবাড়ি প্রতিবেশ ভারসাম্যকে যেরকম স্থায়ীভাবে বিঘ্নিত করছে সে বিষয়েও অনেক কিছু জানা যাবে। বলা দরকার, এখানেই শান্তি ও পরিবেশের প্রশ্নগুলি এক জায়গায় চলে আসে।

৩৪ সংখ্যক এককের আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞানমনস্কতা এবং তার প্রসার। এখানে নেহরু ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বিষয়ক আলোচনা এককটিকে যথার্থ প্রেক্ষিত স্থাপন করে। নেহরু যে কথা বলেছেন, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসার ঘটালেই আমরা একদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কাঠামো এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান আন্তঃরাষ্ট্র প্রবণতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারব। সমকালীন এই সব সমস্যার মোকাবিলা করা যায় একমাত্র বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধির জোরেই।

তাহলে এই পর্যায়ে ভারতবর্ষকে বিশ্বপ্রেক্ষাপটে রেখে আলোচনা চলতে থাকবে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সমকালীন বেশ কিছু বিপত্তিরও স্বরূপ বুঝতে সুবিধে হবে।

একক ৩১ □ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বর্ণগত সমতা

গঠন

৩১.১ উদ্দেশ্য

৩১.২ প্রস্তাবনা

৩১.৩ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও উপনিবেশ উচ্ছেদে তার প্রভাব

- ৩১.৩.১ এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম
- ৩১.৩.২ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম
- ৩১.৩.৩ ভারতের স্বাধীনতার প্রভাব

৩১.৪ উপনিবেশ বাদ ও তার অবশিষ্টাংশ

- ৩১.৪.১ দক্ষিণ এশিয়া
- ৩১.৪.২ নামিবিয়া
- ৩১.৪.৩ পশ্চিম সাহারা
- ৩১.৪.৪ দিয়েগো গার্সিয়া

৩১.৫ নয়া উপনিবেশবাদের বিবিধরূপ

- ৩১.৫.১ তিনটি রূপ
- ৩১.৫:২ অর্থনৈতিক রূপ
- ৩১.৫.৩ রাজনৈতিক রূপ
- ৩১.৫.৪ সামরিক শক্তির ভূমিকা

৩১.৬ বর্ণবৈষম্য এক অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ ও নয়া উপনিবেশবাদের সহায়ক

- ৩১.৬.১ 'বর্ণ' শব্দটির অর্থ
- ৩১.৬.২ বর্ণ বা জাতিভেদ শোষণে এক হাতিয়ার
- ৩১.৬.৩ ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপ ও তার প্রভাব
- ৩১.৬.৪ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম

৩১.৭ অনুশীলনী

৩১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন —

- এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য সংগ্রামে একটি নাতিদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত।
- এই সব সংগ্রামের প্রেরণাস্থল।
- স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য চলতি সংগ্রাম সমূহের পরিচয়।
- এইসব সংগ্রামের সমকালীন শত্রুপক্ষ যারা নয়া উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের সঙ্গে যুক্ত।
- স্বাধীন ও সমতাভিত্তিক বিশ্বনির্মাণে ভারতের অবদান।

৩১.২ প্রস্তাবনা

এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও চাহিদা ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সমতা। সমতার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে ওঠে কারণ দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয় উপনিবেশি শক্তি অ-ইউরোপীয়দের বুদ্ধিগত দৈন্যের দোহাই দিয়ে তাদের শাসন করার ও সভ্য করে তোলবার অধিকার ভোগ করে আসছিল। এই হীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে।

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আশ্চর্য বলে মনে হলেও জুলে ফেরি (Jules Ferry) নামক এক ফরাসী বুদ্ধিজীবী ভারত, চীনের উপর ফরাসী আগ্রাসনের সমর্থনে বলে, নিম্নজাতিকে সভ্য করে তোলার দায়িত্বভার পালনের উদ্দেশ্যেই উচ্চতর জাতি এই ধরনের নীতি গ্রহন করে থাকে। ইংরাজ কবি কিপলিঙ (Kipling) এশিয়দের সভ্য করার জন্য শ্বেতাঙ্গদের দায়িত্বের কথা বলেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ম্যাকিনলি (Mckinely) ফিলিপিন আক্রমণের সমর্থনে বলেন ফিলিপীয়দের শিক্ষিত, উন্নত, সভ্য ও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই এই ঘটনা ঘটে।

এই যুক্তিগুলি নিছক আবরণমাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বাজার, রসদের উৎস, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র, সামরিক ঘাঁটির উপযুক্ত স্থান ও সামরিক বাহিনীতে সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের যোগানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি ঃ প্রথমত ইউরোপীয় বা শ্বেতাঙ্গদের জাত্যাভিমানের অসারতা প্রমাণ করে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মানুষ ও সম্পদের উপর শ্বেতাঙ্গদের শোষণের অবসান ঘটানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষই প্রথম স্বাধীনতা অর্জনে সফল হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির উপর ভারতের উপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ অন্যান্য দেশের আশা আকাঙ্খাকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অংশ। আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ১৯৫৫ সালের ১৮-২৪ এপ্রিলে বানদুং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া আফ্রিকা জতীয় সম্মেলনে নেহরু মন্তব্য করেন, "It

is upto Asia to help Africa to the best of her ability because we are sister continents. We are determined not to fail and in this new phase of Asia and Africa to make good....." (আফ্রিকাকে সাহায্য করা এশিয়ার একান্ত দায়িত্ব, কারণ আমরা সহোদরা দুই মহাদেশ এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নের এই সম্ভাবনাময় যুগকে যেন অবহেলা না করি)

৩১.৩ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও উপনিবেশিকতা উচ্ছেদে তার প্রভাব

উপনিবেশিকতা উচ্ছেদের অর্থ হল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা লাভ — রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় অর্থেই। প্রশ্ন হল ঃ এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে ভারতবর্ষে কী কোন প্রভাব ফেলেছে? দেখা যাচ্ছে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা অর্জনের সুবাদে ভারতের দিক থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'রকম প্রভাবই পড়েছে। ভারতীয় সংগ্রাম পদ্ধতির সাফল্য বিশেষত আমজনতার অংশগ্রহণ। ঔপনিবেশিক বিধি-বিধান অমান্য করা, বিদেশ থেকে আমদানি পণ্য বর্জন, কর্মবিরতি, বাজার বন্ধ করে দেওয়া এবং অগণিত দেশ প্রেমিকের কারাবরণ — অন্যত্র সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষিত এই সব পদ্ধতি তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন।

৩১.৩.১ এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম

স্বাধীনতা সংগ্রাম বেশির ভাগ দেশগুলোতে শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দের সূচনাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন হিটলার যখন ইউরোপকে গ্রাস করছিলেন সেই সময় জাপান এশিয়ায় আক্রমণ চালায় এবং ছোট দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে। প্রতিটি জাতীয়তাবাদী এশিয় দেশ জাপানের এই দখলদারি প্রতিহত করেছিল।

১৯৫৫-র আগস্ট মাসে যখন মিত্র দেশগুলি জাপানকে পরাজিত করল তখন থেকে উপনিবেশ উচ্ছেদের কাজটি ত্বরান্বিত হয়। ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং মার্কিনরা পুনরায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা জাতীয়তাবাদের তেজ সহ্য করতে পারল না। ১৯৫০ সালে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। কম্বোডিয়া ফরাসী অধিপত্য থেকে মুক্তি পেল ১৯৫৩ সালে। সেই সঙ্গে দু'বছরের এক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৪৮ সালে কোরিয়া দুটি স্বাধীন হিসাবে পরিগণিত হল। ইংরাজরা তাদের আধিপত্য মালয়ে ১৯৫৭ এবং সিঙ্গাপুরে ১৯৫৯ অবধি বজায় রেখেছিল। ১৯৪৯ সালে চৈনিক বিপ্লব জনগণের এক বিরাট জয়ের সূচনা করে।

ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে বিদ্রোহীরা ক্ষমতা দখল করল। ১৯৫৪ সাল অবধি তাদের লড়াই করতে হয়েছে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যারা পুনরায় দেশটিকে উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। তাদের হো-চি-মিন প্রতিহত করেছিলেন। ফরাসীদের পরাজয়ের পর এই বিদ্রোহীদের ১৯৭৫ সাল অবধি মার্কিনীদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল অ-কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীকে মদত দেবার জন্য।

ভারত প্রথম থেকেই মার্কিনী দখলদারির বিরোধিতা করেছিল এবং হো-চি-মিনের কম্যুনিস্ট শাসনকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এবং পশ্চিমী শক্তি যখন চীনকে U.N.O.-তে প্রবেশের অধিকার দিচ্ছিল না, ভারত তখন চীনকেই সমর্থন করেছিল।

৩১.৩.২ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

আফ্রিকাতে উপনিবেশ উচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় এশিয়ার সংগ্রামের থেকে আরও দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সেই সংগ্রাম চলেছে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত।

সম্প্রতি নামিবিয়া স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সম্প্রতি বহু রক্তক্ষয়ের পর ইউরোপীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দখলে এসেছে।

১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত ৬টি আফ্রিকান দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ২,০০,০০০ আফ্রিকান নিজেদের আত্মাহুতি দিয়েছে।

১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক সাহায্যের ফলে আফ্রিকান জাতীয় মুক্তি যোদ্ধারা ইংরেজ, ফরাসী এবং বেলজিয়াম উপনিবেশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

এই সময় ৩১টি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭০ সালে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পতন এবং সাম্প্রাদায়িক বর্ণবিদ্বেষী গোষ্ঠীর পরাজয় জিম্বাবোয়েতে হওয়ায় বেশির ভাগ আফ্রিকান দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়, এই স্বাধীনতা অর্জন করতে মানুষকে মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর। ভারতবর্ষ এইসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নৈতিক ও বস্তুগত সব হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৬১ সালে গোয়ার স্বাধীনতা এবং '৭১-এ বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে অস্ত্র এবং মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেবার কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়াতে বর্ণদ্বেষী সাম্প্রদায়িক রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে ভারত নৈতিক সমর্থন এবং সমর উপকরণ ও সামগ্রীগত সাহায্য করেছিল।

৩১.৩.৩ ভারতের স্বাধীনতার প্রভাব

পৃথিবীর অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাজত্বের অবসান ঘটাতে, মুক্তি যুদ্ধের আন্দোলনে ভারতের সক্রিয় ভূমিকা এশিয় ও আফ্রিকার নেতাদের প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং ওরা মনে করেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তার জয় অন্যান্য দেশগুলিকে অনুপ্রেরিত করতে সক্ষম হয়েছে।

আফ্রিকা এবং অন্যান্য এশিয় নেতারা মনে করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য সাদা-কালো পৃথিবীর মানুষেরই সাফল্য। স্বাধীনতা আন্দোলন বর্ণবৈষম্যে তত্ত্ব ধূলিসাৎ করে প্রমাণ করল যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে তথাকথিত 'নিকৃষ্ট' মানুষদের দ্বারা দমন করা যায়।

প্রভাবের ধরন ঃ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে অভিজ্ঞতা ওদের মনে জোর বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এই মনোভাব গণ আন্দোলন পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া রাজনৈতিক দলগঠন এবং জনমত সংগ্রহের কাজেও তারা এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল। কারাবরণ এবং ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধাচরণে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জন দেওয়ার আত্মত্যাগের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিল। বহু এশিয় এবং আফ্রিকান নেতারা ইংল্যান্ড এবং রাষ্ট্রসংঘে পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই সব আলোচনায় এশিয় এবং আফ্রিকান নেতারা ভারতীয়

সংগ্রামের বিষয়ে ধারণা লাভ করে এবং উপনিবেশ বিরোধী; বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ভারতীয় দলের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, ইসতেহার এবং কার্যক্রম ওরা মনোযোগ এবং উৎসাহের সঙ্গে পড়েন। এইসব দলিয় এবং অন্যান্য তথ্যগুলি ওদের রাজনৈতিক দলের পরিকাঠামো গঠনে সাহায্য করে।

আফ্রিকার সাধুবাদ ঃ

ঘানার নেতা কাওয়ামে নকরুমা (Kwame Nkurmah) ভারতের প্রেরণাদায়ী ভূমিকার প্রশংসা করে লেখেন "বহুদিন্ ধরে গান্ধীর নীতি নির্দেশ অধ্যয়ন এবং তাঁর কার্যকারিতা লক্ষ্য করে আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থন পুষ্ট হলে এই পথেই উপনিবেশিকতা সমস্যার সমাধান আসতে পারে।" অন্য এক উপলক্ষে উনি বলেছেন, "নেহেরুর অ্যাফ্রো-এশিয় সমস্যা বোঝার দৃষ্টিভঙ্গীও আমাদের অনুপ্রেরিত করেছে। আমরা যারা আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধে একাত্মভাবে যুক্ত ছিলাম।

আফ্রিকার স্বার্থে ভারতের সাহায্যদান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশংসিত হয়েছে। উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন তীব্র করে তুলতে ভারতের সমর্থন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার নেত্রী উইনি ম্যান্ডেলা, আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার স্ত্রী জোরালো অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, "ভারতীয় জনগণের ঐকমত্য, ঐকান্তিক ভালবাসা এবং সহমর্মিতা আমাদের সাহস এবং প্রেরণা জুগিয়েছে — দুর্বহ বর্ণবৈষম্য এবং অমানবিক রাজশাসনের বিরুদ্ধে মাথা সোজা করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে।

স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি ঃ

ভারতীয় উদাহরণ এশিয় এবং আফ্রিকার দেশগুলিকে জোট নিরপেক্ষতার পথ অনুসরণ করতে সাহায্য করেছিল। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করার দুটি কারণ ছিল —

(১) ওরা ওদের পূর্বতন ঔপনিবেশিক শাসকদের বিশ্বাস করতেন না। ওরা চিন্তিত ছিল যে, পূর্বতন শাসকেরা পুনরায় রাজনৈতিক এবং সামরিক কর্তৃত্ব ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। ভারতের মতো তারা উপনিবেশকারীদের সাথে কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়নি।

(২) যেহেতু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্বন্ধে ওদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং ওয়ারশ চক্তিভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের পথ ওদের জন্য খোলা ছিল না সেইহেতু এরা জোট নিরপেক্ষ থাকারই সিদ্ধান্ত নিল। এ ভাবে জোট নিরপেক্ষ নীতি ওদের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির রাস্তা দেখাল।

৩১.৪ ঔপনিবেশিকতা এবং তার অবশিষ্টাংশ

একদিকে যেমন বহু সংখ্যক সামরিক ঘাঁটি নিয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলি তাদের পূর্বতন উপনিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ করছিল তেমনই কিছু রাজ্য (প্রায় ২০টি) তখনও সরাসরি উপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শাসিত হত। উপনিবেশের কঠোর সংজ্ঞা অনুযায়ী উপনিবেশ না হলেও প্রথাসিদ্ধ অর্থে আরও চারটি এলাকাও মুক্তিলাভ করেছে অতি সম্প্রতি। উপনিবেশিক শক্তি এই কটি এলাকাতে এমন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল যে, এলাকাগুলির নিয়ন্ত্রণ

ক্ষমতা তখনও তাদের মিত্রশক্তি এবং বিদেশাগত বসবাসকারীদের হাতে ছিল। এই ক্ষেত্রে যদিও নিয়মানুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা অনেক দিনই স্বাধীন তবুও সংখ্যালঘু শ্বেত অধিবাসীদের চাপে নামিবিয়া এই সেদিনও দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিদ্বেষী ক্ষমতার অধীনে ছিল।

পশ্চিম সাহারা এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, কারণ স্পেন যাবার আগে মরোক্কো, মাউরিটানিয়াকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছিল। যতদিন ইংরেজ মরিশাসকে স্বাধীনতা দান করেনি ততদিন একটি দ্বীপ দিয়াগো গার্শিয়া মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের অধীনে ছিল। ওরা দিয়াগো গার্শিয়াকে নিজের অধীনে রেখে পরে মার্কিনীদের কাছে ইজারা দিয়েছিল।

৩১.৪.১ দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা উপনিবেশিকতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সাদা বসবাসকারীদের জনসংখ্যা ৩২ কোটির মধ্যে ৪.২ কোটি এবং কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মত একই উপায়ে ১৯১০ সালে এই বিদেশী বসবাসকারীরা ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সেই ১৯১০ সাল থেকে শ্বেত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্ত রকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আফ্রিকান সংখ্যাগুরুদের শাসন করে আসছিল। ১৯১২ সালে যখন আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হয়, তখন থেকেই ওখানকার অধিবাসীরা নিজেদের স্বাধীন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। আফ্রিকান ছাড়াও অন্যান্য এশিয় জাতি, ওখানে শিল্প শ্রমিক হিসাবে ইউরোপীয় আবাদে কাজ করছিল। ওদের সাথে যোগ দিয়েছিল শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশার কারিগরেরা। জনগণের একটি বড় অংশ ছিল ইউরোপীয়, আফ্রিকান এবং এশিয়া থেকে আগত মাতাপিতার মিশ্র বংশজাত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৩ শতাংশ অধিবাসী আফ্রিকান। আইনের সাহায্যে এদের বৈষম্য মূলক ভাবে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। শ্বেতসংখ্যালঘুরা আইনের সাহায্য অবলম্বন করে বৈষম্য মূলক নীতির দ্বারা দেশ শাসন করে এসেছে।

বর্ণবৈষম্যের অর্থ শ্বেতাঙ্গদের থেকে আফ্রিকান এবং অন্যান্য বর্ণের (এশিয়ানরাও অন্তর্ভুক্ত) গোষ্ঠীকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আলাদা করে রাখা। শ্বেতগোষ্ঠীর যুক্তি অনুযায়ী ভিন্নবর্ণে এবং জাতির ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি এবং সভ্যতা বজায় রাখতে হলে পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। এই কারণ দেখিয়ে শাসকগোষ্ঠী ওদের বাসস্থান সংরক্ষিত ও আফ্রিকানদের বাস্তুভিটা এলাকা পৃথক করে দিয়েছিল। যেহেতু সাদারা ৮.৭ শতাংশ জমি সংরক্ষিত করে রেখেছিল — জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ আফ্রিকানরা শুধুমাত্র ১৩ শতাংশ জমিতে বসবাস করবে এই আশা করছিল। এই ব্যবস্থা কার্যকর করা অসম্ভব ছিল, কারণ সমস্ত আফ্রিদিরা তথাকথিত অ-আফ্রিদি এলাকাগুলিতে বিদেশী বা বহিরাগত হিসাবে চিহ্নিত হত। ওদের ওপরওয়ালার কাছ থেকে প্রশাসনিক অনুমতির প্রয়োজন হত। আফ্রিদিদের খুব কম বেতন দেওয়া হত অথচ ওই একই কাজের জন্য একজন ইউরোপীয় কর্মচারী অনেক বেশি বেতন পেত।

আফ্রিদিরা আপত্তি তুলল এই বর্ণবৈষম্য আইন প্রবিধান, বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে। ওদের যুক্তিতে এই বর্ণবৈষম্যের নীতি শুধু অযৌক্তিক নয় অমানবিকও। ওরা বলল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা উন্নয়ন প্রকল্প থাকতে পারে না। আফ্রিকানরা বর্ণবৈষম্যের বিলুপ্তি এবং গণতন্ত্রের দাবি জানাল। শ্বেত শাসকগোষ্ঠী এই বর্ণবৈষম্য নীতিকে বদলে ফেলতে রাজি হল না। এই নীতি সন্ত্রস, হিংস্রতা, সামরিক এবং পুলিশি দমনের সাহায্যে

আফ্রিকানদের রাজনৈতিক দাবিকে বঞ্চিত করেছিল। বহু পশ্চিমী শক্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর বিনিয়োগ করেছিল এবং সেখানকার সামরিক শক্তির সাথে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। এর ফলে বর্ণবৈষম্য শাসন ব্যবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসীরা অভ্যন্তরীন শ্বেত শাসকদের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা হবে কিনা গভীরভাবে নির্ভর করছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের স্বার্থসিদ্ধির উপর।

৩১.৪.২ নামিবিয়া

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাতে আরও একটি দেশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছিল — তার নাম নামিবিয়া। নামিবিয়ার ঔপনিবেশিকতা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮০ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ দেশীয় মানুষের সংহার করার পর এই এলাকাটি জার্মান উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা জার্মানির কাছ থেকে নামিবিয়া দখল করে নেয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সরকারকে নিয়োগ করে নামিবিয়াকে শাসনের অধিকার দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিগত বৈষম্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত হয়েও ইংরেজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে নামিবিয়া শাসনের ভার দেয়। জাতিসংঘের নিয়মানুসারে ওই শাসন ব্যবস্থা "সাধারণের সর্বাধিক নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি বর্ধন করবে।" কিন্তু এর পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের এলাকা শ্বেত উপনিবেশকারীদের জন্য খুলে দিয়েছিল এবং পক্ষপাতমূলক আইন ও বিধিনিষেধ চালু করেছিল।

এই ইউরোপীয় উপনিবেশকারীদের পরিকল্পনামাফিক ১৯১৫ সালে যে জনসংখ্যা ছিল ১৫,০০০ — সেটা বেড়ে গিয়ে ১৯৪৯ সালে দাঁড়ায় ৫০,০০০। বেশির ভাগ আফ্রিকানরা তাদের জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং নিরুপায় হয়ে ওদের শ্বেত উপনিবেশীদের অধীনে কাজ করতে হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দ্বারা প্রদত্ত শাসন ব্যবস্থার অস্বীকার ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ পরিবর্তিত হয় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' নামে। জাতিসংঘ প্রদত্ত শাসন ব্যবস্থার বদলে (আছি ব্যবস্থা) চালু করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্যে নতুন করে জনসাধারণের সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রসংঘের রদবদলকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বক্তব্য ঃ ওরা জাতিসংঘের নিয়মবিধি মেনে নিতে রাজি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নয়। এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। জাতিসংঘের প্রদত্ত শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা। দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়াকে নিজেদের দখলে রেখেছিল এবং রাজ্যে বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি চালু করেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন করছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি এবং জাপান। ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ আরও একটা পদক্ষেপ নিল। নামিবিয়াকে কাউনসিলের প্রশাসনের হাতে তুলে দিল যতক্ষণ না ওই রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন করছে। এর চার বছর পরে আন্তর্জাতিক আদালতের (১১ বছর পরে) নির্দেশ এল দক্ষিণ আফ্রিকা বেআইনী ভাবে অধিকৃত নামিবিয়াকে ফিরিয়ে দিক। নামিবিয়া কাউনসিল ১৯৬৮ সালের মধ্যে নামিবিয়াকে স্বাধীনতা দেবে এই সিদ্ধান্ত নিল।

নামিবিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকা একটি নতুন সরকার গঠনে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে, নামিবিয়ার টার্ন হলে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলন একটি নৃ-গোষ্ঠী নির্ভর শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব দেয়।

এমন কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা প্রদান করার প্রয়াস চলে যাদের উপর সহজেই নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে পরোক্ষভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করা যাবে — এই ধরনের গোষ্ঠীগুলিকে গণতান্ত্রিক টার্নহল জোট নামে একটি সাধারণ সংগঠনের অধীনে রাখার কথা ভাবা হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও আফ্রিকার ঐক্য সংগঠন বা OAU কর্তৃক স্বীকৃত নামিবিয়ার জনসাধারণের প্রতিও SWAPO-র ক্ষমতা বা গুরুত্বকে অস্বীকার করা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জ, OAU এবং SWAPO পশ্চিমী দুনিয়ার সমর্থনে টার্নহল সমাধানকে অগ্রাহ্য করে।

জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ৩৮৫ নং প্রস্তাবে স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে সমাধানের দাবি তোলা হয় এবং প্রধান পশ্চিমী শক্তি সমূহ যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি এবং ফ্রান্স একটি সংযোগ গোষ্ঠী (Contact Group) গঠন করে এই সমাধানের পথ সন্ধানের প্রয়াসী হয়। তবে এই সংযোগ গোষ্ঠী কেবলমাত্র দীর্ঘসূত্রতাকেই স্থায়ী করে তোলার একটি ব্যবস্থা হয়ে ওঠে? পশ্চিমী দুনিয়া চেয়েছিল SWAPO-র একটি বিকল্প গড়ে তুলতে কারণ ওই সংগঠনটি ক্রমশই সুসংগঠিত বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা সংযোগ গোষ্ঠীর কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করে নি। ১৯৭৮ সালে জাতিপুঞ্জ পুনরায় ৪৩৫ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে নামিবিয়ায় নির্বাচনের দাবি তোলে এবং ৭৫০০ জনের একটি সামরিক বাহিনী ও জাতিপুঞ্জের বিশেষ মধ্যবর্ত্তী সহায়ক দল (Transitory Assistance Group)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে এটি হস্তান্তরের প্রস্তাব দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ১৯৭৮-এ একটি অথহীন নির্বাচনের অনুষ্ঠান করে যেখানে DTA-এর হাতে ক্ষমতা প্রদানের চেষ্টা হয়। এটি SWAPO এবং বর্ণবৈষম্য বিরোধী শক্তিগুলির স্বীকৃতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

সংযোগ তত্ত্ব বা Linkage Theory ঃ

এই সময় যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে যতক্ষণ না আঙ্গোলা থেকে কিউবার সৈন্যবাহিনী অপসৃত হচ্ছে ততক্ষণ নামিবিয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। এই দুই বিষয়ের মধ্যে সংযোগের সূত্র কিন্তু স্পষ্ট হয় না। SWAPO আঙ্গোলা ও কিউবার সেনাবাহিনীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অংশীদার এবং আঙ্গোলার সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণ সেখানকার নিরাপত্তা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সুতরাং আঙ্গোলাও জানিয়ে দেয় যদি দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়া থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিয়ে SWAPO-র হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেয় তবে সেখান থেকে কিউবার বাহিনীকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

৩১.৪.৩ পশ্চিম সাহারা

উপনিবেশিকতার অপর একটি অবশিষ্ট পশ্চিম সাহারা। পশ্চিম সাহারা বর্তমানে সাহারা আরব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত। এটি একটি মরুপ্রদেশ এবং আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। স্পেন এই ভূখন্ডের সমুদ্রতীরবর্তী শহরগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাব ১৮৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলনে অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তি সমূহের সমর্থন পায়। ১৯৫৭ সালের ১৪ই নভেম্বর স্পেন মরক্কো এবং মরিটানিয়ার সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে ওই অঞ্চলটি পরিত্যাগ করে। সাহারা তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর অংশ মরক্কোর ভাগে পড়ে এবং দক্ষিণ অংশ মরিটানিয়ার অধীনে আসে — এরা দুই প্রতিবেশী দেশ। স্পেন নিজের জন্য মৎস্যপূর্ণ সমুদ্রাংশটি রাখে এবং ফসফেট খনি থেকে লাভের একটি বড় অংশের জন্য উপযুক্ত অঞ্চলে স্থায়ী হয়।

মরক্কোর আধকার লাভ ঃ

সর্বাপেক্ষা অধিক ফসফেট সমৃদ্ধ উত্তর অঞ্চলটি মরক্কো অধিকার করে। ফ্রান্স এই বিষয়ে আগ্রহী হওয়ায় মরক্কোর প্রতি সমর্থন জানায়। মার্কিন দেশ ফসফেটের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হিসাবে এই দুই দেশকে সমর্থন করে। এই সমর্থনকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে মরক্কো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক অস্ত্র কিনতে সম্মত হয়। ১৯৭৫ সালে মার্কিন অস্ত্র বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

পেলিসারিও (POLISARIO) ঃ

এই আগ্রাসন দমনের জন্য স্বভাবতই পশ্চিম সাহারায় রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনটি POLISARIO নামে পরিচিত। ফ্রাঙ্কো নামক নেতার মৃত্যুর পর স্পেন সাহারা আরব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উপর থেকে দাবি প্রত্যাহার করে। ১৯৭৮ সালে একটি সামরিক জোটের পর মরিটানিয়া শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং দক্ষিণ সাহারার উপর থেকে দাবি উঠিয়ে নেয়। POLISARIO দেশের তিন চতুর্থাংশ অধিকার করে এবং সেই অংশটি স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। OAU এই দাবি স্বীকার করে নেয় এবং একান্নতম সদস্য হিসাবে গণ্য করে।

মরক্কোতে একটি মুক্ত অবাধ রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত করে সাধারণ মানুষকে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবা হয় কিন্তু এর ফলে মরক্কোর উপর অধিকার হারাবার ভয়ে কোন না কোন অজুহাতে এই সম্ভাবনা স্থগিত করে দেওয়া হয়।

এভাবেই সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা না করে ঔপনিবেশিক শক্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

৩১.৪.৪ দিয়েগো গার্সিয়া

ভারত মহাসাগরের একটি ছোট দ্বীপ দিয়েগো গার্সিয়া মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের একটি অংশ। ১৯৬৫ সালে মরিশাস যখন ব্রিটেনের অধিকার থেকে স্বাধীনতা লাভ করে তখন দিয়েগো গার্সিয়া ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবে থাকবে বলে ভাবা হয়। চুক্তির ফলে দ্বীপের অধিবাসীরা মরিশাসের মূল দ্বীপে স্থানান্তরিত হন এবং ব্রিটেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়। ব্রিটেনের কাছ থেকে এই দ্বীপটি ইজারা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলে। বর্তমানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং মরিশাস, ভারত এবং অন্যান্য ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলির ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। মরিশাসের জাতীয়তাবাদী শক্তি এই অঞ্চলটি ফিরিয়ে দেবার দাবি তোলে ও মার্কিন ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়ার আর্জি জানায়। জাতিপুঞ্জ কিন্তু এই অঞ্চলটিকে ঔপনিবেশিক অঞ্চল বলে স্বীকার করে নি। এটিকে ঔপনিবেশিকতার অবশেষ বলে বিবেচনা করেছে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে উপনিবেশিকতার নেতিবাচক অবদানগুলি হল — (১) তৃতীয় বিশ্বকে সামগ্রিকভাবে দারিদ্রে নিমজ্জিত করে পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির উপর তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে দেওয়া এবং অর্থনীতিকে বিপন্ন ও বিকৃত করে তোলা, (২) অন্তঃ রাষ্ট্র সম্পর্কগুলি ভেঙে দেওয়া ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, (৩) সাংস্কৃতিক বিচারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত বিবাদের বীজ বপন করা, (৪) ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির জটিলতা অব্যবহিত অবস্থায় রেখে যাওয়া।

৩১.৫ নয়া উপনিবেশবাদের বিবিধ রূপ

নয়া উপনিবেশবাদ বলতে বোঝায় পূর্বতন নির্ভরশীল দেশগুলির উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখতে এক অদৃশ্য চাপের উপস্থিতি। প্রধানত এটি একটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি। এটি নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির সার্বভৌমিকতার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সদ্য স্বাধীন দেশগুলির আত্মনির্ভরতা, আর্থ-সামাজিক উন্নতি, দারিদ্র দূরীকরণ, শিল্পবাণিজ্যে পশ্চাৎপরতা প্রভৃতি প্রয়াসের উপর এই নয়া উপনিবেশিকতা, একটি প্রবল প্রতিবন্ধক স্বরূপ। উপনিবেশিকতার অবসান করে বৃহৎ বাণিজ্যিক সংগঠন, সামরিক ঘাঁটি, সামরিক হস্তক্ষেপ, গোপন তথ্যানুসন্ধান এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন ও গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে গ্রাস করার প্রক্রিয়াটিই নয়া উপনিবেশবাদ; এই প্রক্রিয়ার কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ নেই। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক আরোপ করে তাদের পুঁজিবাদী রাজনীতি ও অর্থনীতির অধীনস্থ করার যে চেষ্টা করে তাকেই বলা হয় নয়া উপনিবেশিকতা।

৩১.৫.১ তিনটি রূপ

নয়া উপনিবেশিকতার তিনটি রূপ আছে — অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং সামরিক। অর্থনৈতিক রূপটির প্রকাশ ঘটে বৃহৎ একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুরি মুনাফা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সহায়তা আদায় করার মধ্যে, স্বল্পমূল্যে অবাধে কাঁচামাল সংগ্রহ করার মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে, অর্থনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করার মধ্যে।

অর্থনৈতিক নয়া ঔপনিবেশিকাবাদের মূল উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতাপূর্ব সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কটি অবিকৃত রাখা। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেকিতার যুগে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলি খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বাগানশিল্পের প্রসার ঘটায় এবং জাতীয় সম্পদ ও সস্তা শ্রমমূল্যের সদ্ব্যবহার করে শোষণ প্রক্রিয়া চালাতে থাকে। এই ধরনের শিল্পসংস্থা, যেমন, United Africa Company স্থানীয় উৎপাদকদের জন্য সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং উচ্চমূল্যে সেগুলি বিক্রি করে উচ্চহারে মুনাফা করতে থাকে। আবার উৎপাদিত দ্রব্যগুলি উপনিবেশগুলিতে চড়া দামে বিক্রয় করে দ্বিগুণ লাভ করে। ১৯৬০ সালে Food And Agricultural Organisation-এর বিবরণীতে দেখা যায় আফ্রিকায় গাছের গুঁড়ি রপ্তানি ও কাঠের তৈরি দ্রব্যাদি আমদানির ব্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাতে প্রতি বছর ৪৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে। এটি কেবলমাত্র এক বছরে একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে হিসাব, সুতরাং কী পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

৩১.৫.২ অর্থনৈতিক রূপ

স্বাধীনতার পরেও এই বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলি সরে যায় নি। উপরন্তু তারা অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় করেছে। যেহেতু এরা একই সঙ্গে একাধিক দেশে সক্রিয় তাই এদের বলে বহুজাতিক সংস্থা বা MNC (Multi National Corporation)। এই সংস্থাগুলি বিভিন্ন দেশের উপর প্রায় পূর্ণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রেখেছে।

এরা উৎপাদন করে বা খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত করে, প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে, উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। ওই প্রস্তুত দ্রব্যগুলি বাজারজাত করা ও অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। যে সব জায়গায় বাণিজ্যিক ফসলের সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন, কেনিয়ার কফি, নাইজেরিয়ার চেরি বা ঘানার কোকো, সবই বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবেই প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং সেই মুনাফা তাদের নিজের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে উৎপাদনকারী দেশগুলিকে নিঃস্ব করে দেয়।

তৃতীয় বিশ্ব যেসব কাঁচামাল রপ্তানি করে সেগুলির দাম এমনভাবে ঠিক করা হয় যাতে তাদের প্রায় কোন লাভ থাকে না বললেই চলে। এর পরে এগুলি বিক্রয় হলে পুনরায় বৈদেশিক সংস্থাগুলি লাভবান হয়। এটি একটি অসম সম্পর্ক গড়ে তোলে যার ফলে রপ্তানিকারী দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্য ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে। এরা সংকটের মুখে পড়ে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংগঠনগুলির শরণাপন্ন হয়। বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক, পাশ্চত্য বাণিজ্য ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (IMF)-এর কাছে ঋণের জন্য এরা হাত পাতে।

এই সংস্থাগুলি ঋণ দেওয়ার পূর্বে কতকগুলি শর্ত আরোপ করে। যেমন, অর্থের বিনিময় মূল্যকর অবমূল্যায়ন, সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় হ্রাস, সরকারী ভাতা হ্রাস অথবা ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি। এর ফলে গ্রহীতা দেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ক্রমশ এই দেশগুলি ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে কারণ এরা সুদ বা সার্ভিস চার্জ কোনটিই দিয়ে উঠতে পারে না। ১৯৭০ সালের পর থেকে অধিকাংশ দেশেই জনপ্রতি আয়ের হার হয় অবিচলিত রয়েছে অথবা হ্রাস পেয়েছে।

৩১.৫.৩ রাজনৈতিক রূপ

নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তিগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রধানত রাজনৈতিক ক্ষমতা যাতে সমাজের এমন একটি শ্রেণির হাতে থাকে যারা বিদেশী শক্তির মদতপুষ্ট সেদিকে লক্ষ্য রাখে। এই শ্রেণির মানুষেরা বহুজাতিক সংস্থাগুলি থেকে কমিশন বা চাকরির সুযোগ পায়। ক্ষমতা যাতে এই শ্রেণির হাত থেকে প্রকৃত পরিবর্তনবাদীদের হাতে চলে না যায় সেদিকে এরা কড়া নজর রাখে। এই কারণেই এরা সামরিক শাসক, রাজা বা অপ্রিয় নেতাদের মদত দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এরা ইথিওপিয়ার হাইলে সেলেসি বা ইরানের শাহ বা দক্ষিণ কোরিয়ার শাসক গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।

যদি কোনভাবে পরিবর্তনবাদীদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়, নয়া উপনিবেশবাদীদের লক্ষ্য থাকে সামরিক অভ্যুত্থান বা হত্যার কৌশলে তাদের সরিয়ে দেওয়া। ১৯৫৩ সালে ইরানে মোসাদেকের অপসারণ, ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় আরবেঞ্জ সরকার, ১৯৬৬ সালে কোয়ামে এনক্রোমা নামক ঘানার রাষ্ট্রপতি, ১৯৭৩ সালে চিলির আলেয়ান্দে, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যা প্রভৃতি ঘটনা এই সত্যই প্রমান করে। মোজাম্বিক, আঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, কাম্পুচিয়া, আফগানিস্তান, নিকারাগুয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও সরকারকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা চলেছে।

৩১.৫.৪ সামরিক শক্তির ভূমিকা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য নয়া ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের সামরিক ক্ষমতা ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদী শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি অঞ্চলগুলির সঙ্গে চুক্তি করে যাতে ওইসব দেশে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে বিশেষ সামরিক শিবিরে যোগ দিতে কোন কোন তৃতীয় বিশ্বের দেশকে বাধ্য করা হয়। এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্যারিবিয়া ও আফ্রিকায় অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। মার্কিন কেন্দ্রিয় কম্যান্ডের অধীনে রয়েছে প্রায় ২,২২,০০০ সামরিক কর্মী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, পারস্য উপসাগর ও আফ্রিকার উনিশটি জাতি-রাষ্ট্র। অধিকাংশ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সামরিকব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দেশের মোট ব্যায় বরাদ্দের ৫০ শতাংশ হয়ে উঠেছে। এইসব দেশে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র জমা হয়েছে কারণ অস্ত্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের আগ্রহে এইসব দেশে সর্বদাই সশস্ত্র বিরোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে কারণ তাদের স্বার্থ এতেই নিহিত হয়েছে। অনেক সময়ই সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার উদ্দেশ্য হল অপর একটি দেশকে সন্ত্রস্ত ও ভীত করে তোলা, যেমন দিয়েগো গার্সিয়া ও পাকিস্তানে অস্ত্র সম্ভার বৃদ্ধির ফলে সর্বদাই ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন ও বিঘ্নিত হচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬০ সালে বেলজিয়ামের বাহিনী মার্কিন সমর্থনে পুষ্ট হয়ে কঙ্গোতে প্রেরিত হয় যাতে সেখানকার পশ্চিম-সমর্থক নেতৃবৃন্দ সহায়তা পায়। ১৯৭৮ সালে ফরাসী ও বেলজিয়ামের বাহিনী মার্কিন বিমানে পুনরায় জায়রে প্রেরিত হয় কাটাঙ্গা অভ্যুত্থান দমনের উদ্দেশ্যে। ১৯৮৫ সালে ফরাসীরা চাডে (Chad) হস্তক্ষেপ করে।

প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ঘটনা না ঘটলেও সামরিক ঘাঁটির প্রভাব একটি দেশের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। এগুলি ক্ষমতা, মর্যাদা ও গুরুত্বের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয় কারণ যেসব দেশ এই ঘাঁটিগুলি পরিচালনা করে তারা এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই নিজ নিজ ক্ষমতা প্রচার ও ব্যবহার করে। এই কেন্দ্রগুলির সাহায্যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রত্যক্ষ্য সামরিক শক্তি ব্যবহার না করেও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়।

উপরে আলোচিত নয়া উপনিবেশবাদের তিনটি রূপই পরস্পর সংশ্লিষ্ট, তবে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারই মূল যোগসূত্র।

৩১.৬ বর্ণবৈষম্য একটি অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ এবং নয়া উপনিবেশিকতাবাদের সহায়ক

বর্ণবৈষম্যের তত্ত্ব প্রচার করে, কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিরা পশ্চাৎপর এবং নিকৃষ্ট শ্রেণির মানুষ। এর ফলে বিভিন্ন বর্ণবৈষম্যমূলক কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে। পশ্চিমী শক্তিগুলির আফ্রিকার দাসব্যবসা চালানো ও আফ্রিকার উপর চরম ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা এই কথাই প্রমান করে। বহু পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকার কালো মানুষদের প্রতি বিভিন্ন ভাবে পীড়ন চালানো হয়, তাদের সমাজ জীবনকে নিচু মর্যাদা দেওয়া হয়। উপনিবেশগুলিতে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রচার করে যে আফ্রিকার মানুষেরা সহজাত ভাবেই বুদ্ধির দিক থেকে নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসক দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার মানুষদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে।

৩১.৬.১ বর্ণ (Race) শব্দটির অর্থ

আক্ষরিক অর্থে বর্ণ শব্দটি গাত্রবর্ণ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত, এর সঙ্গে সমার্থক হয়ে পড়েছে জাতি বা সম্প্রদায়। সাধারণভাবে একটি গোষ্ঠীর মানুষ যখন একই সংস্কৃতিতে লালিত হয়, একই ইতিহাস, ভাষা ও ব্যুৎপত্তিগত পরিমন্ডলে বসবাস করে তখন তারা একটা জাতি গড়ে তোলে। জৈবিক সাদৃশ্যও সম্প্রদায়গত ঐক্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গাত্রবর্ণ, চুলের রং, চোয়াল ও নাকের গড়ন প্রভৃতির ভিত্তিতে সমগ্র মানব সমাজকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় — নিগ্রয়েড (কালো), মঙ্গোলয়েড (পীত), এবং ককেসয়েড (সাদা)। দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে মানুষের মূল দেহগত ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর যে মানুষের বুদ্ধি বা মননশক্তি নির্ভর করে না তা প্রমাণিত হয়েছে। ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যারা এই বর্ণের ধারণাটি প্রবর্তন করেছে তারা এশিয় ও আফ্রিকার অধিবাসীদের উপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এটি করেছে।

বর্ণবৈষম্যের তাত্ত্বিকদের মধ্যে — (ক) মানবজাতি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এই দুই দলে বিভক্ত, (খ) উৎকৃষ্ট জাতির প্রচেষ্টার ফলেই সামাজিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে, (গ) সামাজিক ইতিহাস একটি নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণগত যুদ্ধ যার পরিণতি উৎকৃষ্ট জাতির জয়।

যেহেতু এই বর্ণবৈষম্যের তত্ত্ব আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়, সেহেতু ইতিহাসের বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বের সংঘাত অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে মানুষের পরিশ্রমের ফলে, কোন বিশেষ বর্ণের মানুষের সহজাত কৃতিত্বের কারণে নয়। প্রকৃতির উপাদানগুলির উপর কর্তৃত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যেই মানুষ পরিশ্রম করেছে এবং তারই ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটেছে।

৩১.৬.২ বর্ণ বা জাতি শোষণের একটি হাতিয়ার

অশ্বেতাঙ্গ মানুষ, বিশেষত আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বাধীন উন্নয়নের অপারগতার কথা প্রচার করে বর্ণবিদ্বেষকে ইউরোপীয় শাসন কায়েম রাখার একটি কৌশল হিসেবে ক্রমাগত প্রচার করা হয়েছে। বিকৃত প্রচার ও পুনঃ পুনঃ একটি বিশেষ ধারণা আরোপের মধ্য দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শোষণমুখী অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের পরিবর্তন প্রভৃতির প্রয়াস।

আদর্শগত আরোপ এতই তীব্র যে অ-শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা নিজেদের অজান্তেই এই ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছে। যদিও এই বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবু মানবসমাজের একটি বড় অংশের মধ্যেই এই ধারণা প্রচারিত হয়ে গেছে যা থেকে তাদের মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী এই উদ্দেশ্যে মানবসমাজের সকল সন্তানকে পরস্পরের ভাই বলে বর্ণনা করে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করতে চেয়েছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে বিভেদের ধারণা অজ্ঞাত ছিল। সেই সময় ধর্ম, স্থান ও শ্রেণির ভিত্তিতে মানুষে বিভাজন হত। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের বিভেদের ধারণার মধ্যেই কিন্তু নিচুশ্রেণির মানুষের উপরের শ্রেণিতে আরোহণের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্যকেই জন্মগত বলে স্থায়ী চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয় নি। বর্ণগোষ্ঠীগুলিকে অনড় বলে বিবেচনা করা হয় নি। কেবল সামরিক শক্তিতে উন্নত হতে পারলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এমন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল।

ইউরোপীয় উপনিবেশিকতাবাদীগণ দাসব্যবসা, বাণিজ্য, লুঠ, গণহত্যা প্রভৃতির সাহায্যে আফ্রিকা মহাদেশকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলে এবং প্রচার করে যে তাদের বর্ণগত অক্ষমতাই আফ্রিকীয়দের পশ্চাৎপদতার একমাত্র কারণ। তাদের তত্ত্বে বলা হয় ইউরোপের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পিছনে রয়েছে তাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব।

৩১.৬.৩ ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপ ও তার প্রভাব

আফ্রিকার যেসব অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তৃত হয়, সেখানেই বর্ণবৈষম্যের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এই সব স্থানের মনোরম জলবায়ু সম্পন্ন, খনিজদ্রব্যে ধনী, কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের দিক থেকে উর্বর অংশগুলি ইউরোপীয় বাসিন্দাদের হস্তগত হয়। দেশীয় মানুষের হাত থেকে ভূমির অধিকার চলে যায়। আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষেরা অতি অল্প পারিশ্রমিকেও কাজ করতে রাজি হওয়ায় তারা চিরকালের জন্য শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনাও বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকেও তারা সরে যেতে বাধ্য হয়। তাদের রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। বর্ণবৈষম্য এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষদের মনুষত্যের প্রাণীতে পরিণত করে।

আফ্রিকার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ওই দেশের অনেকেই শিক্ষিত হয়ে ওঠেন ও কবি, ঔপন্যাসিক নাট্যকার, ঐতিহাসিক, অভিনেতা, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। এদের ধ্যানধারণার প্রসার ঘটায় সাধারণ মানুষ তথা তাত্ত্বিকরা সবাই বুঝতে পারেন যে বর্ণবৈষম্যের তত্ত্বটি সম্পূর্ণই অবৈজ্ঞানিক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা করে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের বর্ণবৈষম্য বিরোধী মনোভাব এদের মনে তথা বিশ্ববাসীর মনে রেখাপাত করে, এর ফলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর স্বার্থরক্ষার জন্য এই ধরনের একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যার প্রকৃতপক্ষে কোন ভিত্তি নেই।

৩১.৬.৪ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম

ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই বর্ণবৈষম্য বিরোধী নীতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করে আসছে। কেননা, বর্ণবৈষম্য ঔপনিবেশিকতারই একটি অংশ। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এটি যে একটি অত্যন্ত গর্হিত সংস্কার সেটি অনুধাবন করা হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ এবং অহিংসামূলক কর্মসূচী প্রথম মানবাধিকারের প্রশ্নটিকে সম্মুখে নিয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজী, বর্ণবৈষম্য অ-মানবিক অত্যাচার এবং শোষণের যে কদর্য চেহারা সেখানে দেখে এসেছিলেন সে কথা প্রচার করেন এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বর্ণবিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করার কথা বলেন। ১৯৪৬ সালে জাতিপুঞ্জের ভারতবর্ষ এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলে দেয়।

বর্ণবৈষম্য বিরোধী কর্মসূচীর প্রধান সূত্র সমূহ ঃ

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশনে ভারতবর্ষ বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে। তখনও পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের ভিতর ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহেরই প্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ সদস্যই বৈদেশিক প্রাধান্য ও পীড়ন থেকে মুক্তি খুঁজছিল। ভারতবর্ষ উপনিবেশগুলির পক্ষ নিয়ে বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের জন্য উদ্যোগ নেয়। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনেও ভারত একই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। ভারতের মতে বর্ণবৈষম্য মানবিকতার বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রতিফলন, শোষণ ও অত্যাচারের নিদর্শন এবং এই বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। কারণ এই ধারণার সংস্কার সম্ভব নয়।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় উদ্যোগ ঃ

জাতিপুঞ্জ ও ভারত শেষ পর্যন্ত তিনটি সূত্রের ভিত্তিতে এই আন্দোলন শুরু করে — (১) বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। (২) এ ধরনের নীতি যে কোন দুটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে এটি মেনে দিতে হবে। (৩) বর্ণবৈষম্যকে জাতিপুঞ্জের সনদে মানবাধিকার সম্পর্কে সার্বজনীন ঘোষণার বিরোধী বলে বিবেচনা করা হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য জাতিপুঞ্জ যাতে প্রয়াসী হয় ভারত সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ১৯৫৫ সালের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সনদে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস সাম্য ও গণতন্ত্রের দাবি তোলে। কিন্তু ওই দেশের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা ৬৯ জন ব্যক্তিকে হত্যা করে। প্রায় ৪০০ জনকে আহত করে, এবং ১৯৬১ সালে নিরস্ত্র প্রতিবাদীদের উপর গুলি চালিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি গড়ে তোলে।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঃ

ভারতীয় উদ্যোগে জাতিপুঞ্জ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে এবং সাধারণ সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের বর্ণবৈষম্য সম্পর্কিত নীতিগুলি পরিহার করতে বাধ্য করে।

নেহরু দক্ষিণ আফ্রিকাকে জাতিপুঞ্জ ও কমনওয়েলথ থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি পরোক্ষে বর্ণবিদ্বেষকে সমর্থন করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

১৯৬৭ সালে আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই সংগঠন সমগ্র এশিয়ার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। কয়েক বছর পরে ভারতবর্ষ SWAPOকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় এবং নিজেদের বৈদেশিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। নেলসন ম্যান্ডেলাকে 'নেহরু পুরস্কার' দিয়ে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। প্রতিবেশিদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হয়। উদ্বাস্তু শিবিরগুলি আক্রান্ত হতে থাকে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন সংগঠনগুলি এদের যাবতীয় উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করলেও এরা হতোদ্যম হয়না।

আফ্রিকা ভান্ডার ঃ

ভারতীয়দের উদ্যোগে একটি অর্থভান্ডার খোলা হয় যাতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলিকে সাহায্য করা যায়। উপনিবেশিকতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে কোন উদ্যোগকেই যাতে রোধ

করা যায় সেজন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সমস্ত পৃথিবী এই দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তার প্রধান কৃতিত্ব ভারতই দাবি করতে পারে।

৩১.৭ অনুশীলনী

১। নয়া উপনিবেশবাদ কী? (দশ পংক্তির মধ্যে উত্তর লিখুন)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। নিম্নোক্ত বিষয়টি সযত্নে অনুধাবন করুন এবং সঠিক উত্তরের পাশে দাগ (✓) দিন।

বর্ণবাদকে এইভাবে দেখা যায় —

(ক) এটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ

(খ) নয়া উপনিবেশবাদের হাতিয়ার

(গ) একটি অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ কারণ মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সম্ভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতাকে এটি জড়িয়ে ফেলে।

(ঘ) (খ) এবং (গ) উভয়ই।

৩। বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোন্ তিনটি মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত?
(দশ পংক্তির মধ্যে উত্তর লিখুন)

একক ৩২ □ পারমাণবিক বিশ্বে শান্তির সমস্যা

৩২.১ প্রস্তাবনা

৩২.২ পারমাণবিক শক্তির প্রকৃতি

৩২.২.১ পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণাম

৩২.২.২ পারমাণবিক শৈত্য ও তার ফল

৩২.২.৩ পারমাণবিক অস্ত্রে প্রসারণ

৩২.৩ বৃহৎশক্তি ও বিশ্ব সামরিক ব্যবস্থা

৩২.৪ শান্তি আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা

৩২.৪.১ পশ্চিমে শান্তি আন্দোলন

৩২.৪.২ যুদ্ধ প্রসঙ্গে গান্ধীর মত

৩২.৫ সারাংশ

৩২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩২.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান বিশ্বের সমাজব্যবস্থা পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা সংক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সর্বদা সন্ত্রস্ত। এই সকল অস্ত্রের ব্যাপক ও অবাধ ব্যবহার বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে। হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর মার্কিন বোমা নিক্ষেপ প্রমাণ করে এই অস্ত্রসমূহ কতখানি বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এ জন্যই শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মহাশক্তিগুলির মধ্যে আলোচনা আদানপ্রদান এবং জাতিপুঞ্জের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত এই প্রয়াস সফল হওয়া সম্ভব নয়। পারমাণবিক ও সাবেক অস্ত্রসমূহের উৎপাদন রোধ করা নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ।

৩২.২ পারমাণবিক শক্তির প্রকৃতি

১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোতে প্রথম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিধ্বংসী অস্ত্র 'মহাপ্রলয় যন্ত্র' বা 'Doomsday Machine' হিসেবে পরিচিতি পায়। প্রথম বিস্ফোরণ একটি বিশাল আকৃতির ব্যাঙের ছাতার মতো আগুনের মেঘ সৃষ্টি করে যা ছিল আকাশে প্রায় ৪০,০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত বিস্তারিত। এটি

'পারমাণবিক ছত্রাক' বা 'ছত্রাক মেঘ' নামে পরিচিত। এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে হিরোশিমা ও নাগাসাকি বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। নয় হাজার পাউন্ড ইউরেনিয়াম বোমা হিরোশিমার ১৮৯০ ফুট উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং অর্ধমাইল পরিধি বিস্তার করে একটি জ্বলন্ত অগ্নিগোলক সৃষ্টি করে। এটির কেন্দ্রে উষ্ণতা ছিল ·৫০ মিলিয়ন ডিগ্রি ফারেনহাইট।

সমগ্র যুদ্ধের ইতিহাসে যা ঘটেনি তাই এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটল। সমস্ত অঞ্চলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং কতজন যে নিহত হয় তার কোন নিশ্চিত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ৭০ হাজার থেকে আড়াই লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় এবং আর অগণিত মানুষ আহত হয়। প্রায় ৫৫ হাজার বাড়ি নিশ্চিহ্ন ও নষ্ট হয় যার মধ্যে ২০০০ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে য়ায়।

এই বিবরণ প্রমাণ করে পারমাণবিক অস্ত্রনিক্ষেপ কতখানি বিধ্বংসী হতে পারে। বৃহৎ শক্তিগুলি যে ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করেছে তা থেকে সমগ্র পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। হিরোসিমা যেভাবে বিনষ্ট হয়েছিল তার ৬০০ গুণেরও বেশি বিস্ফোরক অস্ত্র এখন বৃহৎ শক্তিগুলির হস্তে রয়েছে।

৩২.২.১ পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণাম

১৯৪৫ সালে যখন প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের সূচনা করে তারপর থেকেই সকল বৃহৎ শক্তি পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ করে চলেছে। পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় দিক থেকেই বিশ্ববাসী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রায় পঁচিশ পছর আগে রাষ্ট্রপতি কেনেডি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ পরমাণু যুদ্ধ হয় তবে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন, ইউরোপীয় এবং রাশিয়ান নাগরিকের মৃত্যু হবে এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে। এই ধরনের যুদ্ধে মৃত ও জীবিতের মধ্যে পার্থক্যের কোন অর্থ হয় না কারণ এই সর্বধ্বংসী যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। বৃহৎ শক্তিগুলি কেবল নিজেদের দেশের স্বার্থের কথাই চিন্তা করেছে কিন্তু চীন ও ভারত যদি আক্রান্ত হয় তবে বহু বেশি সংখ্যক মানুষ নিহত হবে কারণ এই দেশগুলি অত্যন্ত জনবহুল।

৩২.২.২ পারমাণবিক শৈত্য ও তার ফল

পারমাণবিক যুদ্ধের অপর একটি দিকও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পৃথিবীর কোন কোন প্রান্তে তাপমাত্রা অত্যন্ত হ্রাস পায় এবং হিমপ্রবাহ বইতে থাকে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে প্রচুর পরিমাণে ধুলি ও অন্যান্য পদার্থ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এর পরে যে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হয় তা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে না এবং এর ফলে এক দীর্ঘস্থায়ী শীতাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এই চরম শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে কোন প্রাণের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না।

পরবর্তী পর্যায়ে আবার এক নূতন বিপদের সূচনা হবে। ওজোন স্তর পৃথিবীর প্রাণীজগতকে সুরক্ষিত রাখে যা পরমাণু যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণ জ্বলে যাবে। সুতরাং যেটুকু প্রাণ অবশিষ্ট থাকবে তা অতিবেগুনী রশ্মির সামনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এই রশ্মির বিকীকণে ক্যান্সার ও অন্ধত্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান পৃথিবীতে যে পরিমাণ পরমাণু শক্তি সঞ্চিত রয়েছে তার এক চতুর্থাংশই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যে কোন একটি পক্ষের অস্ত্র সম্ভারই এটি সম্ভব করে তুলতে পারে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কোন পক্ষ জয়ী হবে এ নিয়ে অনুমান করা নিষ্ফল। এই সম্ভাবনাকে যে কোন মূল্যে রোধ করাই এখন জরুরি।

৩২.২.৩ পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারণ

পারমাণবিক অস্ত্রসমূহের কিন্তু সম্ভাব্য কোন সামরিক ভূমিকা নেই। এরা সর্বাত্মক ভাবে হত্যা করার জন্যই নিযুক্ত। কারণ যে এই অস্ত্র ব্যবহার করবে সে নিজেও এর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। ১৯৬৮ সালে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাসও রোধ করার জন্য অস্ত্র সংবরণ করার শপথ গ্রহণের কথা চিন্তা করা হয় এবং Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নতুন করে আর পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ করবে না এবং কোন রূপ পরীক্ষা করবে না একথা স্থির হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে বিধ্বংসী যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে বলে মনে করা হয়।

কিন্তু এই অস্ত্র সংগ্রহের নেশা প্রতিটি দেশকেই আকর্ষণ করে। যেখানে দুনিয়া জুড়ে বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে সেখানে লক্ষ্য করার বিষয়, পরমাণু উৎপাদক কেন্দ্রগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় এবং সেখানে শ্রমিকরা দিনরাত কাজ করে চলেছে ও তাদের চাকরির নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, সুতরাং যতক্ষণ না বৃহৎ শক্তিগুলিকে পরমাণু অস্ত্র বৃদ্ধি করা থেকে নিরস্ত করা যাচ্ছে ততক্ষণ কোন লাভ হবে না। বরং কেবল যেসকল দেশে পরমাণু অস্ত্রসম্ভার নেই তারা যাতে কখনোই এই অস্ত্র উৎপাদন করতে না পারে তার জন্যই বিভিন্ন চুক্তি করা হচ্ছে। এর ফলে একদল শক্তির হাতে সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে এবং অন্য দলের হাতে কোন ক্ষমতাই থাকছে না। 'অনুভূমিক অস্ত্র বৃদ্ধি' রোধ হচ্ছে অথচ 'উল্লম্ব অস্ত্রবৃদ্ধি' নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন ১৯৬৮ সালের চুক্তিটির জন্য উদ্যোগ নেয় কিন্তু তখন থেকেই ভারত এর বিরোধিতা করে কারণ এর ফলে পরমাণু-নিরপেক্ষ দেশগুলি আরো পরনির্ভর ও সদাসন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ২৮,০০০ পারমাণবিক অস্ত্র বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করে। সকল বৃহৎ শক্তিরই মনোভাব এই ধরনের। সুতরাং অস্ত্র সম্বরণ পুরোপুরি একদেশদর্শী ও অর্থহীন।

এই ধরনের আন্তর্জাতিক নীতিবোধের মান প্রমাণ করে কোন সম্ভাবনাময় দেশই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নিজেদের অক্ষমতা বৃদ্ধি করবে না। কারণ বৃহৎ শক্তিগুলি নিজেদের ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলবে এবং অন্যদের অস্ত্র উৎপাদনে নিরস্ত করবে। বিশ্ববাসীকে ধ্বংস করে দেওয়ার এই ক্ষমতা যা বৃহৎ শক্তিগুলির রয়েছে তাকেই বলা হয় পারমাণবিক প্রবল হত্যাস্পৃহা বা overkill.

৩২.৩ বৃহৎশক্তি ও বিশ্ব সামরিক ব্যবস্থা

পারমাণবিক অস্ত্রের প্রকৃতিও বৃহৎ শক্তিগুলির আচরণকে নির্ধারণ করে, এবং বিশ্বের সামরিক ব্যবস্থার প্রকৃতিও এর দ্বারা নির্ধারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এই উভয় বৃহৎশক্তিই তাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত

করতে চায় এক 'ভীতিসাম্য অবস্থার' (Balance of Terror) মাধ্যমে। অর্থাৎ এরা উভয়েই এতখানি পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করতে চায় যাতে অন্যকে ধ্বংস করা যায়, এমনকি প্রথমেই আক্রান্ত হলে। একেই বলে Second Strike Capacity-এর অর্থ দুরকম ঃ

প্রথমত এটা অর্জন করতে গেলে প্রতিটি বৃহৎশক্তিকে উত্তরোত্তর উন্নত সমরাস্ত্র উৎপাদন করতে হবে, যার অর্থ অধিকতর বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পন্ন মারাত্মক বোমার উৎপাদন যা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম। এক্ষেত্রে একটি বৃহৎ শক্তির সাফল্যের সঙ্গে অন্য বৃহৎ শক্তির পাল্লা দিতে বাধ্য। অতএব উভয় বৃহৎশক্তিই পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় ভূগর্ভে, যেহেতু মনে করা হয় যে এতে পরিবেশ বিপন্ন হবে না।

দ্বিতীয়ত এইসব পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদনের পর এগুলিকে এমন স্থানে সংরক্ষিত করতে হয় যাতে তা অন্য বৃহৎশক্তির নাগালের বাইরে থাকে। অতএব এগুলিকে হয় গোপনে ভূগর্ভে সঞ্চিত করতে হয় অথবা সমুদ্রে ভ্রাম্যমান সাবমেরিন বা অন্য কোন জলযানে সন্তর্পণে সংরক্ষিত করা হয়। এগুলিকে আবার মহাকাশে কোন উপগ্রহে অথবা গ্রহেও স্থাপন করা যেতে পারে। অস্ত্রগুলির জন্য এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে একটিমাত্র বোতাম টিপেই সেগুলিকে কার্যকর করা যায়। তবুও বৃহৎশক্তিবর্গ বিশ্বকে এই আশ্বাস দেয় যে আকস্মিকভাবে কোন পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হবে না। এই আশ্বাসের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে পারমাণবিক অস্ত্র আগেই শুরু করতে না দেওয়া। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই অতএব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Mutually Assured Destruction, সংক্ষেপে MAD।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের সঙ্গী রাষ্ট্রগুলিই সমরসম্ভার উৎপাদন ও তা রপ্তানীর অধিকাংশ ভাগটা দখল করে আছে। অবশ্য প্রায় প্রতিটি উন্নতিকামী রাষ্ট্রই আজ সমরসম্ভার উৎপাদন এবং সামরিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার খাতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সূচক হিসেবে সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা একালের রেওয়াজ।

পুরাতন দ্বন্দ্ব, সীমান্তবিরোধ, জাতিগত সংঘাত ইত্যাদিও তৃতীয় বিশ্বের উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় দুনিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সশস্ত্র সংঘর্ষের মঞ্চ। এবং এই সংঘর্ষগুলি সংঘটিত হয় উন্নত দেশগুলি থেকে আমদানি করা সমরাস্ত্রের সাহায্যে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যেকার এই সংঘর্ষগুলি থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। দৃষ্টান্ত ঃ ভারত—পাকিস্তান, ইরান—ইরাক, আরব—ইজরায়েল, থাইল্যান্ড—কাম্পুচিয়া ইত্যাদি। বৃহৎ শক্তিগুলি শুধু অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি করেই এই যুদ্ধে মদত দেয় নি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনের দ্বারা এর ইন্ধন জুগিয়েছে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই সামরিক ঘাঁটির ও সামরিক জোটের অদ্ভুত শৃঙ্খল গড়ে তুলেছে চারিদিকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইভাবে দাতা-গ্রহীতার এক জটিল ছক তৈরি হয়ে উঠেছে। আর এইসব সুনিপুণ সমরাস্ত্র সমূহ আবিষ্কৃত হবার ফলে মানবসমাজ ক্রমাগত এগিয়ে ছলেছে সামরিকীকরণের দিকে। ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে সামরিক বিধিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই দিক থেকে বৃহৎশক্তি সমূহের মধ্যেকার অস্ত্র প্রতিযোগিতা এক বিশ্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৩২.৪ শক্তি আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা

পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের বিপদ ও অস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির ফলে উন্নত দেশসমূহে যে গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপদ ঘনিয়ে উঠছে তাতে জনমানসে বিশ্বশান্তি বিষয়ে এক সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রকাশ ঘটেছে বিশ্বের নানা দেশে বিভিন্ন ধারার শান্তি আন্দোলনের মধ্যে।

৩২.৪.১ পশ্চিমী দেশে শান্তি আন্দোলন

অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও গ্রন্থ ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় যাতে এ বিষয়ে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। Club of Rome-য়ের 'Limits to Growth', ব্রিটেনের 'Blueprint for Survival' এবং E. F. Schumacher-য়ের 'Small is Beautiful' হল এই রকম কয়েকটি নজির। কিন্তু এসবের আগেও ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Campaign for Nuclear Disarmament (CND) বার্টান্ড রাসেল প্রদর্শিত পথে। অবশ্য ১৯৭০ ও ৮০'র দশকের শান্তি আন্দোলনের ব্যাপ্তি অনেক বেশি।

সাম্প্রতিককালে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে Green Movement (সবুজ আন্দোলন) সামিল হওয়ায় এটি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানত চারটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে ঃ পরিবেশ সামাজিক দায়িত্ব চেতনা, তৃণমূল গণতন্ত্র ও অহিংসা।

অনিয়ন্ত্রিত শিল্পাঞ্চল বিস্তার শিল্পদূষণ সৃষ্টি করেছে, প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ ঘটিয়েছে, ধ্বংসসাধন করেছে ভূমন্ডলের এবং সম্পদের অসম বন্টনকে বৃদ্ধি করেছে। অম্লবর্ষণ (Acidrain), বৃক্ষরাজির বিনাশ, নদী ও সাগরজলের বিষাক্তকরণ এবং বায়ুমন্ডলের দূষণ ইত্যাদি হ'ল পরিবেশ দূষণের কয়েকটি দিক। এই জাতীয় দূষণের ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলির এক বড় ভূমিকা বর্তমান। অন্যান্য সব বিবেচনাকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে অনুসরণ করে এইসব বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থা। এইসব বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা বিপুল সম্পদের অধিকারী যা কোন কোন ছোট রাষ্ট্রের সম্পদের তুলনায় বেশি, এবং এই সব সংস্থা ছড়িয়ে আছে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে নানা দেশে। ভূপালে অবস্থিত ইউনিয়ন কার্বাইড-এর আকস্মিক দুর্ঘটনায় কয়েক সহস্র মানুষের প্রাণহানি এর এক জ্বলন্ত নজীর। শান্তি আন্দোলন তাই উন্নয়নের ধারণাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চায় এবং উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক বিকাশকেই বিকল্প মডেল বা পথ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

জাতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার রাজনীতিবিদদের চিন্তাধারা আজও নিয়ন্ত্রিত হয় যে যুক্তি অনুযায়ী তা হল, শান্তি আসবে নিরাপত্তার মাধ্যমে এবং নিরাপত্তা আসবে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রসমূহের মনে অস্ত্রের ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে। অন্যদিকে শান্তি আন্দোলন জোর দেয় বিশ্বের জনগণের দ্বারা সংগঠিত গণ আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর—যেমন Amnesty International অথবা Campaign for Nuclear Disarmament. অহিংস, সামরিক জোটের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি এবং জনগণ ও জাতিগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে পারস্পরিক মিত্রতা—এসবের মধ্যেই প্রকৃত শান্তির আশ্বাস নিহিত আছে, সামরিক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে গড়ে তোলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নয়। তাই শক্তির উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের চেয়ে পারমাণবিক অস্ত্রের বিরোধিতা ও নিরস্ত্রীকরণকেই শান্তি আন্দোলন অধিক গুরুত্ব দেয়। অহিংস প্রতিরোধের ধারণাকেই তারা সমর্থন করে।

উপরন্তু এই শান্তি আন্দোলন মেয়েদের অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের প্রয়াসকে সমর্থন করে যার দ্বারা বিশ্বে নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাস সূচিত হতে পারে। এই নতুন ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর থেকে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে।

৩২.৪.২ যুদ্ধ প্রসঙ্গে গান্ধীর মত

১৯২০ ও ৩০-এর দশকে গান্ধীজী যেসব মত ব্যক্ত করেছিলেন উপরোক্ত শান্তি আন্দোলনের মতামতের সাথে তা নানা দিক থেকে মিলে যায়। তিনি হিংসার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে বাতিল করেছিলেন, এবং সত্যাগ্রহ ও গণপ্রতিরোধ (Civil resistance) গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'আক্রমণ বা আত্মরক্ষা যে প্রয়োজনেই হোক সকল হিংসাই জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ সাধন করে।' তিনি এমন কী একতরফা নিরস্ত্রীকরণের কথাও বলেছেন।

গান্ধী মনে করতেন প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া এবং প্রকৃতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ জীবনযাপন করাই হ'ল অহিংসা। বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানার প্রতি তাঁর বিরোধিতাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে অহিংসা সম্পর্কিত তার উপরোক্ত ধারণাকে অনুধাবন করতে হবে। তিনি ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামসমাজের স্বশাসনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এর দ্বারা কেবল তৃণমূলস্তরের গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে না, নতুন মানুষও গড়ে উঠবে। তাই একালের এই নতুন শান্তি আন্দোলন নানা দিক থেকে গান্ধীর মতামতকেই প্রতিফলিত করছে।

গান্ধীজী যুদ্ধ ও হিংসার অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধ সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে যুদ্ধ কৌশলকে সমৃদ্ধ করার মধ্যে নয়, শান্তি বজায় রাখার কৌশলকে বিকশিত করার মধ্যে।' তিনি নিরপেক্ষতাকে সমর্থন করতেন না বরং মনে করতেন যে এক শান্তিবাদীর নৈতিক দায়িত্ব হ'ল কোন সামরিক সংঘাতে কোন পক্ষ ন্যায়ের দিকে তা নির্ণয় করা। তাঁর পক্ষে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় ছিল যুদ্ধাস্ত্র ও হিংসার প্রয়োগ। যে কোন যুদ্ধকেই তিনি প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'যুদ্ধ হ'ল অন্যায়,—এক স্থায়ী অকল্যাণ—এর অবসান ঘটাতেই হবে—রক্তপাত বা প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়।'

যুদ্ধের বদলে গান্ধী অহিংস গণ আন্দোলনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মত 'হিংসার প্রত্যক্ষ প্রকাশ হিসেবে যুদ্ধাস্ত্রের একমাত্র প্রতিষেধক হ'ল সত্যাগ্রহ'—যা অহিংসার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এমনটা হতে পারে যে অহিংস প্রতিরোধের কালে সকল প্রতিরোধকারীই প্রাণ হারাবেন, তবু তিনি বিশ্বাস করতেন যে আক্রমণকারী যথাসময়ে অহিংসার প্রতিরোধকারীদের হত্যা করতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আক্রমণকারী এদের মনোবলের উৎসকে খুঁজতে চেষ্টা করবে এবং অতিরিক্ত হত্যা থেকে বিরত হবে।

অনুশীলনী ১

দ্রষ্টব্য ঃ উত্তরের জন্য নীচের খালি জায়গাটি ব্যবহার করুন।

এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিন।

১। বিশ্ব সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। শান্তি ও অহিংসা বিষয়ে গান্ধীর মতামত সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩২.৫ সারাংশ

জাপানে বিধ্বংসী বিস্ফোরণ মৃত মানুষের যে মহাশ্মশান সৃষ্টি করেছিল তা বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিয়েছে। এবং পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ধারাবাহিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পারমাণবিক বিস্ফোরণের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া খুব কম করে বললেও বলতে হয় একটি দুঃস্বপ্নের মত। সর্বনাশের এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও বৃহৎ শক্তিবর্গ ও তাদের সঙ্গীদের এই পারমাণবিক শক্তি বিস্তারের নীতি তাদের অভ্যন্তরীণ জীবনেও সঙ্কট ঘনিয়ে তুলতে বাধ্য যেমন বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবার উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি। এর প্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই পাবে না উন্নয়নশীল দেশগুলিও—যারা নিজেদের ভূখণ্ডগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে মাথা ঘামায়। অনিবার্য ভাবেই তারা তাদের অপ্রতুল সম্পদ সমারিক খাতেই ব্যয় করে চলেছে; স্বভাবতই অবহেলিত হচ্ছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। এরই ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে যা এইসব দেশের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর।

সম্প্রতিককালে অবশ্য এই বৃহৎ শক্তিবর্গ পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তারের উন্মত্ত প্রতিযোগিতার অসারতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে পারমাণবিক শক্তির দেশগুলি নিজেদের মধ্যে Non-Proliferation Treaty সম্পাদন করেছে। পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির ওপর নির্জোট দেশসমূহের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। এই প্রভাবের দরুন পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত হ্রাস করার জন্য—ভূগর্ভ, মহাশূন্যে, সমুদ্রগর্ভে ও অন্যত্র—কতকগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। রোনাল্ড রেগন ও মিখাইল গর্বাচভের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজেদের সেনা প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় তা বিশ্বশান্তির পক্ষে এক স্বাস্থ্যকর ইঙ্গিত। ঠাণ্ডা-লড়াই যা অতীতে ভয়ঙ্কর মাত্রা অর্জন করেছিল ক্রমশই তার উত্তেজনা প্রশমতি হচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে সামরিক শক্তিকে যে মূল গুরুত্বের স্থান দিয়ে এসেছে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এতকালে তা ক্রমশই গুরুত্ব হারাচ্ছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে শান্তি ক্রমশই মৌলিক গুরুত্ব লাভ করছে।

অতএব বিশ্বশান্তি আন্দোলন বিশ্বের নানা দেশে আজ তাৎক্ষণিক ও বর্ধিত তাৎপর্য অর্জন করছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাও আজ এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার গুরুত্ব অনুধাবন করছে। কেবলমাত্র একটি জোরদার আন্দোলনই পারে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে।

৩২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

Burzan Barry, 1983 — People States and Fear : The National Security Problem in International Relations, Harvester Press, Sussex.

Catudal, H.M. 1983 — Nuclear Deterrence. Does it deter? Marshall Pub. Ltd. New York (Chap 1).

Clarke, Duncan L, 1985 — Politics of Arms Control : The Role and effectiveness of the US Arms Control and Disarmament Agency. The Free Press, London (chap 2).

Howe O Connor J (ed) 1984 — Armed Peace : The search for world security, Macmillan, London.

Pasolini A and Robert J, 1984 — The Arms Race as a time of Decision. The Macmilan Press, London.

T. T. Poulose (ed.) 1988 — The Future of Arms Control, ABC Pub., New Delhi.

United Nations and Nuclear Proliferation DK Pubs. New Delhi.

একক ৩৩ □ বাস্তুতন্ত্র (Eco-System) ও তার বিপদসমূহ

৩৩.১ উদ্দেশ্য

৩৩.২ প্রস্তাবনা

৩৩.৩ বাস্তুতন্ত্র কী ?

৩৩.৩.১ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

৩৩.৩.২ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব

৩৩.৪ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

৩৩.৫ বায়ুমণ্ডল

৩৩.৫.১ গুরুত্ব

৩৩.৫.২ বায়ুমণ্ডলের অপব্যবহার

৩৩.৬ পরিবেশগত অবক্ষয়

৩৩.৬.১ অবক্ষয় বনাম দূষণ

৩৩.৬.২ ঊষরীভবন ও ঊষরীকরণ

৩৩.৬.৩ বিনষ্টির বিধান (Entropy Law)

৩৩.৭ বর্তমান বিপদসমূহ

৩৩.৮ সারাংশ

৩৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৩.১০ উত্তর সংকেত

৩৩.১ উদ্দেশ্য

বাস্তুতন্ত্রের উপর এই অংশটুকু পড়ার পর আপনি পারবেন ঃ

বাস্তুতন্ত্র ও তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে।

বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে।

বাস্তুতন্ত্রের বর্তমান বিপদের আলোচনা করতে ও তার শোধরানোর উপায় নির্দেশ করতে।

৩৩.২ প্রস্তাবনা

বাস্তুতন্ত্রের অর্থ কী? বাস্তুতন্ত্র বলতে আসলে জীবজগতের সাথে তার পরিবেশের সম্পর্ককে বোঝায়। এই সম্পর্ক বিচিত্র ও পারস্পরিক। দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিককালে এই সম্পর্ক নিদারুণভাবে বিপন্ন হচ্ছে। 'বাস্তুতন্ত্রগত সঙ্কট', 'পরিবেশ দূষণ' ইত্যাদি কথাগুলির মধ্যে এই বিপন্নতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে আরো অনেক কিছুই পড়া হবে।

৩৩.৩ বাস্তুতন্ত্র কী ?

পৃথিবী বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীকুলের বাসভূমি। এটা এক প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য। তবু এ সত্যটিকেই যত জোর দিয়ে সম্ভব তুলে ধরলেই আমরা ভাল করব। কারণ সর্বত্র এই বাসভূমির অপব্যাবহার ও নিঃশেষীকরণ এমনভাবে ঘটে চলেছে যা অদূর ভবিষ্যতে তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে। এমনটা যদি ঘটে তবে আমরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। বস্তুত আমরা ততদিনই টিকবো যতদিন এই পৃথিবী আমাদের টিকিয়ে রাখতে পারবে।

৩৩.৩.১ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

এক পৃথ্বি চেতনা (Earth Consciousness) গড়ে তুলতে পারলে আমরা ভাল করব। আমাদের ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তুতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করা বোধহয় আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাস্তুতন্ত্র বা তার ইংরেজী প্রতিশব্দ Ecology কথাটি দুটি মূল গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে—'Oikas' যার অর্থ গৃহ, এবং 'Logos' যার অর্থ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। অতএব প্রতিবেশবিদ্যা বলতে বোঝায় এমন এক আলোচনা শাস্ত্র যা মানুষ জাতীয় প্রাণীকুলের বসবাসব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করে। Shorter Oxford English Dictionary-তে Ecology'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'জীববিদ্যার এমন এক শাখা যা পরিবেশের সাথে প্রাণীকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এটা অবশ্য ঐ অভিধানে দেওয়া দুটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথমটি। অন্যটিতে সকল পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টিকেই বোঝানো হয়েছে, এদিক থেকে প্রতিবেশবিদ্যায় সমগ্র বিশ্বের বাস্তুতন্ত্র বোঝানো হয়।

৩৩.৩.২ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব

আমরা দেখেছি বাস্তুতন্ত্ররীতি প্রাণীকুল ও তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করে। আমরা এও দেখেছি যে এই সম্পর্ক পারস্পরিক এবং আশ্চর্যভাবে বিন্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে এই সম্পর্কের মধ্যে একটা ভারসাম্য বর্তমান। আমরা যখন বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের কথা বলি তখন আমরা প্রাণীকুলের সাথে তার পরিপার্শ্বের স্বাভাবিক ভারসাম্যের সেই বিঘ্নের কথাই বলি যা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল। প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হয়েও মানুষ এই ভারসাম্যকে নির্বিচারে বিপন্ন করে তুলেছে।

অনুশীলনী ১

দ্রষ্টব্য ঃ ১) উত্তরের জন্য নীচের খালি জায়গাটি ব্যবহার করুন।

২) এই অংশের শেষে যে উত্তরের প্রতিলিপি আছে তার সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। বাস্তুতন্ত্ররীতির ধারণাটি সম্পর্কে পড়েছেন। ৫ লাইনে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন ঃ

৩৩.৪ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

আমরা যখন বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের কথা বলি তখন বাস্তুতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের কথাই বোঝাতে চাই। এই সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে মূলত পরিবেশের উপর মানুষের ক্ষয়সাধনকারী কর্মকাণ্ড ও বেআইনী হস্তক্ষেপের দরুন। এটা সহজেই বোঝা যায় যে বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থার সংহতি আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বজায় রাখতে হবে, কারণ এই ব্যবস্থা এতই স্পর্শকাতর যে আপাতভাবে পরিবেশের কোন আঞ্চলিক অপব্যবহারও সামগ্রিক ভাঙনের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সাম্প্রতিক বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের নমুনা ঃ

দুটি সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের সুসংহত ছবি স্পষ্টতর হবে। এর প্রথমটি হ'ল কীটনাশক ও রাসায়নিক বিষের ব্যবহার যা উদ্ভিদের দেহে কীটগুলিকে ধ্বংস করতে প্রয়োগ করা হয়। এতে শেষ পর্যন্ত পোকামাকড়গুলি ধ্বংস হয় এবং কৃষিউৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এটি অত্যন্ত স্বল্পকালীন এক লাভ; কারণ ক্রমশ পোকামাকড়রা এইসব বিষের বিরুদ্ধে নিজেদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলত এইসব বিষাক্ত কীটনাশকগুলি আরো শক্তিশালী সংস্করণ আরো অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় এক দুষ্ট আবর্তনের (Vicious Circle) ক্রিয়া। এর ফল হ'ল কৃষিউৎপাদনকে অব্যাহত রাখতে বিষ প্রয়োগের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হবে।

আর একটি অসুবিধাও আছে। সেটি হ'ল একবার ব্যবহৃত হলে ঐসব কীটনাশক বিশেষ রোগসঞ্চারী বিষে পরিণত হয়। তারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ এইসব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে বিনষ্ট করা বা তাদের ক্ষতিকারিতা কমিয়ে দেবার মত কোন এনজাইম ভূব্যবস্থায় তৈরি হতে পারে না। একবার ব্যবহৃত হ'লে তারা চিরকালের জন্য টিকে থাকে এবং প্রাণসম্পন্ন পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্তনদায়িনী মায়েদের দুধে কীটনাশকের অবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি পেঙ্গুইনদের শরীরেও অনুরূপ

অবশেষ পাওয়া গেছে। অনুরূপভাবে British Nuclear Fuels Ltd. পারমাণবিক শক্তি কারখানা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়ও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বর্জ্যপদার্থ আইরিশ সাগর থেকে বাল্টিক সাগরের দিকে বয়ে চলেছে বলে জানা গেছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 'Greenhouse Effect' নামে পরিচিত। এটি 'সবুজ গৃহ' বা 'উষ্ণ গৃহ' নামেও পরিচিত। এটি হ'ল এমন একটি দালানবাড়ি যার ছাদ ও দেওয়ালগুলো চাঁদ দিয়ে তৈরি। এই বাড়ি ব্যবহার করা হয় এমন সব গাছ ও ফুল ফলাতে যার জন্য সাধারণ গাছগাছড়ার চাইতে বেশি উষ্ণতার প্রয়োজন। এই সবুজগৃহ ভেদ করে যে সূর্যালোক ঢোকে তার সাহায্যে গাছেরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। কিন্তু এই গ্যাস সবুজ গৃহের মধ্যে আটকে থাকে এবং বাইরের থেকে আসার সূর্যের তাপকে শোষণ করে নেয়। এইভাবে সবুজ গৃহে ভেতরকার তাপকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি যথেষ্ট কাজে লাগানো যায়।

এই জাতীয় ব্যবস্থা সারা বিশ্বেই কার্যকর করা যেতে পারে। যদিও আবহাওয়ামন্ডলে মোট গ্যাসের মাত্র ০.০৩ শতাংশ হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড তবু এই গ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে এর ভূপৃষ্ঠে প্রাণীর জীবনধারণকে সম্ভব করে তোলে। এটা সহজেই বোঝা যায়। সৌরশক্তি যখন ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ামন্ডলের সংস্পর্শে আসে তখন তার অনেকটাই ফিরে যায়, কিন্তু কিছু বায়ুমন্ডলের কিছু অংশের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নেয়। এইভাবে ভূপৃষ্ঠ যথেষ্ট উষ্ণ হয়ে প্রাণীকুলের জীবনধারণের উপযোগী হয়।

কিন্তু বর্তমানে বিপজ্জনক কিছু ব্যাপারস্যাপার ঘটছে। কয়লা অথবা খনিজ তেলের মত জীবাশ্ম তাপশক্তি (Fssil fuel) যত বেশি বেশি করে মানুষ পোড়াচ্ছে নানা প্রয়োজনে ততই এইসব জীবাশ্মের মধ্যে লক্ষ বছর আটকে থাকা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া পেয়ে বায়ুমন্ডলের সঙ্গে মিশছে। ক্রান্তীয় বনাঞ্চল যেভাবে পুড়ে ছাই হচ্ছে তার ফলেও এই প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে ১৮৫০ সালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে এই গ্যাস ছিল ২৬৫ অংশ, অথচ বর্তমানে এই অংশ ৩৪০-তে দাঁড়িয়েছে এবং যদি ভবিষ্যতে এই বৃদ্ধিকে রোখা না যায় পরবর্তী শতাব্দীর মাঝামাঝি এই অংশ ৬০০-তে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। ফলে পৃথিবী এখনকার তুলনায় অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে উঠবে। বস্তুত মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যেতে পারে ফলে মেরু অঞ্চলের তুষারবরণ (Ice Cap) গলে গিয়ে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের জলস্তরকে প্রায় ৫ থেকে ৭ মিটার পর্যন্ত অধিক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এর পরিণতি হলো পৃথিবীর ভূভাগের বৃহদাংশ প্লাবিত হয়ে যাবে এবং চিরকালের মত নিমজ্জিত হয়ে থাকবে। কলকাতা, বোম্বাই, লন্ডন, নিউইয়র্ক ইত্যাদির মত বিশ্বের বড় বড় শহরগুলি এভাবে নিশ্চহ্ন হয়ে যাবে।

এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। অতএব আমরা যদি এ ব্যাপারে সজাগ হতে শুরু করি, আমরা এই বর্তমান সভ্যতার যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন না করে পারি না। কারণ যেভাবে এই বর্তমান সভ্যতার জীবনধারা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তুলেছে তা মানবীয় অস্তিত্বের ভিত্তি নির্মূল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর অর্থ, আমরা উন্নয়ন ও বিকাশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন তত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সযত্নে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য।

অনুশীলনী ২

দ্রষ্টব্য ঃ উত্তরের জন্য নীচের খালি জায়গাটি ব্যবহার করুন। ৫০টি শব্দে উত্তর লিখুন।

(ক) 'বাস্তুরীতির সঙ্কট' বলতে কী বোঝায়?

(খ) আমাদের একালের বাস্তুধারার বিপদগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩৩.৫ প্রাণমণ্ডল বা জীবমণ্ডল (Biosphere)

উপরে যে পুনর্বিবেচনার কথা বলা হ'ল তার প্রয়োজন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা শুধুমাত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়াও সমগ্র প্রাণমণ্ডলের কথা চিন্তা করি। আপনারা হয়তো জানেন যে এই প্রাণমণ্ডল বলতে বোঝায় পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকা প্রাণের এমন এক পরিমণ্ডল যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বায়ুমণ্ডল, সমুদ্রভাগ ও ভূভাগ—যার প্রত্যেকটিতেই আছে অসংখ্য প্রকার প্রাণের সম্ভার।

এই অসংখ্য প্রকার প্রাণীর মত আমরাও এই প্রাণমন্ডলের এক অতি নিবিড় অংশ। কিন্তু অন্যান্যরা যা পারে না আমরা তা পারি, এবং তা হলো আমাদের কর্মধারার সাহায্যে আমরা এই প্রাণমন্ডলের রূপান্তর সাধন করতে পারি। এর অর্থ, অন্যান্য প্রাণীদের মতই আমরা এই প্রাণমন্ডলের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সেখান থেকেই আমাদের বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করি, অথচ অন্যান্য প্রাণীদের মত ঐ প্রাণমন্ডলের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত নই।

৩৩.৫.১ গুরুত্ব

এটা স্মরণে রাখাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অধুনা এই প্রাণমন্ডল সামগ্রিকভাবে একটি অখন্ড জীবনধারা হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে অথবা একে তুলনা করা যেতে পারে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের সাথে। অতএব আমরা যদি এই প্রাণমন্ডলের দূষণপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখি আমরা এই দূষণ জনিত ক্ষয়ক্ষতির ফলভোগ করতে এবং বিনাশসম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করতে বাধ্য।

এক প্রাণময় জীবসত্তা রূপে প্রাণমন্ডলের যে ধারনা তার উৎসসন্ধানে ফিরে যেতে হয় একালের এক প্রখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী অধ্যাপক James Lovelock-য়ের কাছে। তিনি একে অভিহিত করতে দুটি শব্দের ব্যবহার করেছেন

যার একটি হ'ল Gaia এবং অন্যটি 'Geo'। এই দুটি হ'ল গ্রীক পুরাণে পৃথিবী দেবীর নাম, এবং এই দ্বিতীয় শব্দটি থেকেই Geometry, Geography, Geology ইত্যাদি ইংরাজি শব্দগুলির উৎপত্তি।

অধ্যাপক Lovelock আরও বলেছেন যে এই Gaia অথবা বিশ্ব প্রাণমন্ডলের নিজেকে সৃষ্টি করার নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে, কোন প্রজাতির তা নেই। বস্তুতপক্ষে অনেক প্রজাতিই ইতিমধ্যে সৃষ্ট হয়েছে এবং বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর এই দিক থেকে অন্তত আমরা অন্য প্রজাতি থেকে ভিন্ন নই। তবু অন্যান্য প্রজাতির পরিস্থিতির চেয়ে আমাদের পরিস্থিতি ভিন্ন। কারণ অন্যান্য প্রজাতির প্রাণী যে পরিস্থিতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে সেটা আমাদেরই তৈরি এক অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

৩৩.৫.২ প্রাণমন্ডলের (বা জীবমন্ডলের) অপব্যবহার

মনুষ্য-সৃষ্ট ধ্বংসের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল আবর্জনাবাহী নর্দমার মত জীবমন্ডলের ধারাবাহিক অপব্যবহার। সমস্ত ধরনের কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ, সকল প্রকার যন্ত্রযান থেকে উদগীর্ণ ধোঁয়া, কৃষিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক পদার্থ, আণবিক পরীক্ষাদি থেকে উদ্ভুত বিষবাষ্প এবং সামরিক অনুশীলনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নানা দিক থেকে জীবমন্ডলে প্রবেশ করে, যেহেতু এগুলি অন্য কোথাও যেতে পারে না। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতি বছরে প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ১৩০ মিলিয়ন টন সালফার-ডাই-অক্সাইড, ৯৭ মিলিয়ন টন হাইড্রোকার্বন, ৫৩ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন অক্সাইড, ৩ মিলিয়ন টনের বেশি আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সিসে, পারদ ইত্যাদি আবহাওয়া মন্ডলে মিশছে। এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে আরো বেশ কিছু সংশোষিত জৈব যৌগ বা ক্যান্সার, জন্মকালীন বিকার ও জেনেটিক পরিবর্তন সঞ্চারিত করে। সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নানা প্রকার নাইট্রোজেন অক্সাইড বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এর থেকেই সৃষ্টি হয় অ্যাসিড বা অম্লজনিত নানা দুর্যোগের সূচনা যেমন অম্ল বর্ষণ, অম্লতুষার, অম্লতুষারঝড়, অম্লকুয়াশা, অম্লশিশির ইত্যাদি উপসর্গ। স্বাভাবিকভাবেই এইসব উপসর্গগুলিকে 'রাসায়নিক কুষ্ঠ' রোগ বলে অভিহিত করা হচ্ছে। যা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই এক বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সঙ্কট, প্রধানত দুটি কারণে — ১) অতি উন্নত দেশগুলিতে নিষ্ক্রিয় বিষাক্ত পদার্থ ঐসব দেশের পরিধির মধ্যে সীমিত থাকে না; এবং ২) অর্ধোন্নত দেশগুলি জীবাশ্ম-তাপশক্তি (ইন্ধন!)-র বহুল ব্যবহার ঘটায়।

এসবের মোদ্দা অর্থ হ'ল আমরা পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে, বা হয়তো ইতিমধ্যে অযোগ্য করে তুলেছি। যাই হোক, আমরা এই বাস্তুতন্ত্র ও জীবমন্ডলের সংহতি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা আজও যথাযথ উপলব্ধি করতে পারিনি। এই জন্যেই পরিবেশকে রূপান্তরিত করার আমাদের বিশেষ ক্ষমতা যা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতি থেকে আমাদের উন্নত করেছে এবং আমাদের মনুষ্যত্বদান করেছে তা আজ আমাদের ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনছে।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ পারমাণবিক মহাশ্মশানের মত এত ভয়াবহ সম্ভাবনা নয়। তবু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকা উচিত। এর গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। কারণ জীবমন্ডল হ'ল এক জটিল বিন্যাস যার মধ্যে শতসহস্র প্রজাতির প্রাণী নানান বিচিত্র সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। একটি দুটি প্রজাতির বিলোপে এই বিন্যাস অব্যাহত থাকতে পারে। অর্থাৎ, কয়েকটি মাত্র প্রজাতির অপসারণ বা বিনাশে Gaia ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

কিন্তু আজ আমরা যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি তা শুধু কয়েকটি প্রজাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নয়, বরং ব্যাপক হারে বহু প্রাণী প্রজাতির বিলোপের আশঙ্কা। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্যে যে সম্ভাব্যতার কথা মাথায় রাখতে হবে তা হল ২০০০ সালের মধ্যে আধ মিলিয়ন থেকে দু মিলিয়ন প্রজাতি — অর্থাৎ পৃথিবীর মোট প্রাণী প্রজাতির ১৫ থেকে ২০ শতাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এটা ঘটবে অংশত এই কারণে যে পৃথিবীর বনাঞ্চল হ্রাস পাচ্ছে, এবং মুখ্যত এই কারণে যে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ক্রমবর্ধমান দূষণ প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। প্রাণী জগতের এই প্রকার বিলোপসাধন ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। একারণে আমরা আমাদের এই সময়কে 'বিলুপ্তির যুগ' বা 'Age of Extinction' বলে বর্ণনা করতে পারি।

অনুশীলনী ৩

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি মন দিয়ে পড়ুন এবং সঠিক উত্তরটি দাগ দিন। (এই অংশের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে দেখুন)

১। জীবমন্ডল বলতে বোঝায়

(ক) আবহাওয়ামন্ডল, সমুদ্রভাগ ও মৃত্তিকা।

(খ) আবহাওয়ামন্ডল ও সমুদ্রভাগ।

(গ) সমুদ্রভাগ ও মৃত্তিকা।

২। বর্তমানে জীবমন্ডলকে দেখা হয়

(ক) একক জৈব-ব্যবস্থা হিসেবে।

(খ) বহুবাদী জৈব-ব্যবস্থা হিসেবে।

(গ) এক অজৈব ব্যবস্থা হিসেবে।

৩। একক জৈব-ব্যবস্থার ধারণার উদ্গাতা

(ক) অধ্যাপক জেমস লাভলক।

(খ) অধ্যাপক অল্ডাস হাক্সলি।

(গ) অধ্যাপক জে. বি. হ্যালডেন।

৩৩.৬ পরিবেশগত অবক্ষয়

পরিবেশগত অবক্ষয় আমাদের কাছে গভীর উদ্বেগের কারণ। সারা পৃথিবীর যে পার্থিব পরিমন্ডল তা মানুষের ভোগবাদী বিকাশমূলক কর্মকান্ডের দ্বারা বিপন্ন হয়েছে। কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস — আধুনিক মানুষের যাবতীয় উদ্ভাবন — আমাদের পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। একথাও অবশ্য স্মরণে রাখা দরকার যে সকল পরিবেশগত অবক্ষয় মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ঘটে না। স্বাভাবিক গতিতে প্রকৃতির যে ক্ষয়সাধিত হয় তার সাথে মনুষ্যসৃষ্ট ক্ষয়সাধনের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। এটাও উপলব্ধি করা দরকার যে কিছু অবক্ষয় স্বাভাবিক ও অনিবার্য এবং এব্যাপারে আমাদের কিছুই করণীয় নেই।

এ ব্যাপারটাকে জীবনের এক অনিবার্য ধারা হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এর অর্থ, যদি আমাদের এই মানবপ্রজাতি আদৌ না থাকত, তবুও এই বিশ্বজোড়া বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকত

আমাদের ছাড়াই। অন্যভাবে বলা যায়, পৃথিবীর বুকে মানুষের উদ্ভবের বহু আগে থেকেই এই ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল, এবং মানুষ বিলুপ্ত হবার পরেও এই ধারা চলতে থাকবে।

৩৩.৬.১ অবক্ষয় বনাম দূষণ

পরিবেশগত ক্ষয়ীভবন ও পরিবেশ দূষণের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা সহজ। ক্ষয়ীভবন প্রায় বয়োবৃদ্ধির মত। কিন্তু দূষণ হলো ফুসফুসের ক্যান্সারের মত যা ধূমপানের ফলে ধূমপায়ীকে আক্রামণ করে ও তার জীবনকালকে সংক্ষিপ্ত করে তোলে। এর অর্থ, দূষণ হলো এমন প্রক্রিয়া যা পরিবেশের স্বাভাবিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে তোলে। সহজেই বোঝা যায়, আমাদের পরিবেশ যদি স্বাভাবিক অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্ত থাকতো তবে তা দূষণ এর হাত থেকেও মুক্ত থাকতো। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি জীবনের এক স্বাভাবিক ধারা, এবং পরিবেশের অবক্ষয়ও ঠিক তাই। বাস্তবিকই, আমরা পরে দেখবো, এই ক্ষয়ীভবনের ফলেই পৃথিবীতে জীবনের সূচনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দূষণ হলো পৃথিবীর জীবন-সহায়ক ব্যবস্থার ক্রমিক বিনাশ, এবং বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে এই দূষণ প্রক্রিয়া চরম ও ক্রমবর্ধমানভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। অতএব আমাদের যা করা উচিত তা হ'ল পার্থিব পরিবেশের অবক্ষয়কে ঠেকানোর চেষ্টা করা যদিও সেটা সম্পূর্ণ থামানো আমাদের সাধ্যাতীত। এটাকে জগতের স্বাভাবিক ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। আমরা শুধু পারি পরিবেশের অপব্যাবহারকে কমিয়ে আনতে।

৩৩.৬.২ উষরীভবন ও উষরীকরণ

স্বাভাবিক অবক্ষয় ও পরিবেশ দূষণের মধ্যে পার্থক্যকে আরো স্পষ্ট করে তুলতে আমরা আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারি মরুভূমি বা অতি শুষ্ক কোন অঞ্চলের দিকে। এই জাতীয় পাঁচটি বড় শুষ্ক মরু অঞ্চল পৃথিবীতে আছে যা নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। সাহারা, আরব ও গোবি হ'ল এদের মধ্যে প্রধান। এইসব অঞ্চল ও প্রায়-অনুর্বর ভূভাগ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বহু শুষ্ক অঞ্চলে মরুভূমির পরিধি ভীতিপ্রদ গতিতে বেড়ে চলেছে। যখন এই বৃদ্ধি প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে তখন তাকে বলা হয় 'উষরীভবন'। কিন্তু এই মরু অঞ্চলের বিস্তার যখন ঘটে কৃষিবিস্তার, বনবিনাশ, অতি মাত্রায় পশুচারণ বা অতি অল্প সেচের কারণে তখন এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি 'উষরীকরণ'। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মরুভূমির প্রসার অতি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া এবং তা ঘটে জলবায়ুগত পরিবর্তনের দরুন। উষরীভবন তাই তুলনামূলক বিচারে এক শ্লথগতি পদ্ধতি। পক্ষান্তরে উষরীকরণ এক মারাত্মকভাবে দ্রুতগতি প্রক্রিয়া। প্রতি বছর প্রায় ১২ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি এই উষরীকরণ প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং কৃষির অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। এর মধ্যে প্রায় ৫ বিলিয়ন হেক্টর ভূভাগ বর্ষণসিক্ত অঞ্চল হওয়া সত্বেও তার উপরিস্তর উষর হয়ে পুড়ছে। ফলে প্রতি বছরে প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষতির পরিমাণের মাত্র একের আট ভাগের সাহায্যেই এই জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা বা ক্ষতিরোধ করা যায়।

এসব সত্বেও আমরা উষরীকরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও উষরীভবনকে ঠেকাতে পারব না। এর দ্বারা আগে আমরা যে কথা উল্লেখ করেছি সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় থাকলেও পরিবেশের অবক্ষয় বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। দূষণ একটি রোগ যা আমরা নিরাময় করতে পারি। আর অবক্ষয় হলো বয়োবৃদ্ধির মত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা আমাদের মেনে নিতে হবে।

৩৩.৬.৩ বিনষ্টির বিধান (Entropy Law)

আমাদের এই উল্লিখিত অক্ষমতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হ'ল 'Entropy Law'. বস্তুতপক্ষে, এটা হ'ল বিশ্বপ্রকৃতির এক মৌলিক সূত্র এবং এ বিষয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকা ভাল। আলবার্ট আইনস্টাইন নিজেই একে বিজ্ঞানের এক প্রাথমিক সূত্র বলে বর্ণনা করেছেন। স্যার আর্থার এডিংটন এর বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন এটি হ'ল সমগ্র মহাবিশ্বের এক চূড়ান্ত আধিবিদ্যক সূত্র, এবং আরো সাম্প্রতিককালে ব্যারি কমনার (Barry Commoner) একে বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির কর্মধারা সম্পর্কে সবচেয়ে শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টি বলে।

এই সূত্রের বক্তব্য খুবই সরল। সমস্ত বস্তু ও শক্তিই স্বতঃস্ফূর্ত ও তাদের গতি-প্রকৃতির কোন ব্যতিক্রম নেই এবং তাই সময়ের সাথে সাথে এদের ক্ষীয়মানতা অনিবার্য। এই ক্ষীয়মানতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'ল সূর্য। সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ (চার) মিলিয়ন টন ভর হারাচ্ছে, এবং তার তাপশক্তির যে বিকিরণ প্রতিনিয়ত নানা দিকে ঘটছে তার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ আমাদের পৃথিবীতে এসে জীবনের সহায়ক হয়ে ওঠে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে এই ক্ষীয়মানতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় তার গতিকে উল্টে দেওয়া। অনুরূপভাবে, যখন এক টুকরো কয়লা পুড়ে ছাইয়ে পরিণত হয় সেই ছাইকে পুনরায় কয়লায় রূপান্তরিত করা যায় না। অথবা যখন এক শিশি আতরের ছিপি খুলে দেওয়া হয় তখন শিশির ভেতরকার ঘণীকৃত তরল পদার্থের অণুগুলি ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এই অণুগুলিকে বন্দী করে পুনরায় আতরের শিশিতে পোরা যায় না।

সূর্য, এক টুকরো কয়লা এবং এক শিশি আতর এসবই সুনির্দিষ্টভাবে সুসংবদ্ধ কাঠামো (ordered structures) । এই সুসংবদ্ধ কাঠামো সম্পন্ন বস্তুগুলি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে। ক্রমক্ষীয়মানতার প্রক্রিয়ায় এদের সুসংবদ্ধ কাঠামো বিনষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা হারায়।

মহাবিশ্বের বস্তুপঞ্জের এই সুসংবদ্ধতা থেকে অসংবদ্ধতায় রূপান্তরকে চিহ্নিত করতে যে সূচক ব্যবহার করা হয় তাকে 'Entropy' বলে। Rudolf Classius নামে এক জার্মান পদার্থবিদ ১৮৬৮ সালে এই শব্দটি উদ্ভাবন করেন। 'En' এবং 'Trope' নামক মূল দুটি গ্রীক শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে এই নতুন শব্দটি। যুক্ত এই শব্দটির দ্বারা Classius বোঝাতে চেয়েছেন 'The Transformation Content' । সাধারণভাবে, 'Entropy Law' বলতে বোঝায় যেসব প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের বাঁচতে হয় এবং যেগুলিকে আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না। আমরা যখন অপেক্ষাকৃত অসংবদ্ধ একতাল লৌহআকরিককে একখন্ড সুসংবদ্ধ লোহায় পরিণত করি এবং পরে তাকে আরো সুসংবদ্ধ একটি হাতুড়িতে রূপান্তরিত করি; তখন অবশ্যই তার মধ্যে আমরা শৃঙ্খলা বা সুসংবদ্ধতা আনি, যদিও তা শুধুমাত্র স্থানিক বা আংশিক। কিন্তু খন্ডিতক্ষেত্রে এই শৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে পারি না। সমস্ত ধরণের অট্টালিকা, রাস্তা, রেলপথ, কারখানা, তৈলশোধনাগার, মোটর গাড়ি, সাইকেল, পিন ইত্যাদি সবই হ'ল কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট শৃঙ্খলার নানা নমুনা। ভূমিক্ষয়, জলমগ্নতা, দূষিত বায়ু, অম্লবর্ষণ, দূষিত নদী ইত্যাদি হলো কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা। অন্যভাবে বলা যায়, দূষণ হল মনুষ্যসৃষ্ট Entropy.

একথার অর্থ হল যে আমরা সব নির্মাণ, উৎপাদন ও কৃষিকর্ম বন্ধ করে দেব। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই দেখতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত বিনাশ ও পরিবেশের দূষণ সৃষ্টি হয় এমন প্রয়াসে যেন আমরা বিশেষ উদ্যোগী না হই। কারণ, যদি আমরা এ ব্যাপারে যত্নবান না হই তবে আমরা নিজেদের বিনাশকেই ত্বরান্বিত করবো।

অনুশীলনী ৪

দ্রষ্টব্য ঃ ১) নীচের খালি জায়গা ব্যবহার করুন।

২) এই অংশের শেষে দেওয়া আদর্শ উত্তরের প্রতিলিপির সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিন। পরিবেশের অবক্ষয় বলতে আপনি কী বোঝেন ব্যাখ্যা করুন। পরিবেশের দূষণের সাথে এর পার্থক্য কী?

৩৩.৭ বর্তমান বিপদসমূহ

ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হ'ল তা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে বর্তমানে বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। উপরি-বর্ণিত আলোচনায় এইসব বিপদের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নীচে এইসব বিপদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল। মানব-প্রজাতির বয়স দু মিলিয়ন বছরই হোক অথবা ৫০ হাজার বছরই হোক, আমাদের মনে রাখা দরকার যে বিগত মাত্র ৫০ বছর বা তার কিছু বেশি সময় ধরে আমরা এক তীব্র ও চরম দূষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে বেঁচে আছি। বস্তুতপক্ষে, এই প্রথম বিশ্বজোড়া বাস্তুতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। অবশ্য এমন নয় যে জীবপ্রজাতিতে আমরাই প্রথম প্রতিবেশগতভাবে ক্ষতিকর কর্মে লিপ্ত হয়েছি। কিন্তু অতীতে আমাদের পক্ষে খুব বেশি ক্ষতিসাধন করা সম্ভব ছিল না। অন্যভাবে বলা যায় যেটুকু ক্ষতিসাধন অতীতে হতো তা পৃথিবীর ব্যাপক অঞ্চলে প্রসারিত হতো না। তাছাড়া ঐটুকু পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি শুধরে নেওয়ার ক্ষমতা প্রকৃতির ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই ক্ষতিসাধন ঘটছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এবং এই ক্ষয়ক্ষতি নিজে থেকে শুধরে নেওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর ক্ষমতাও কমে এসেছে।

পৃথক পৃথক কর্মকান্ড ও বাস্তুতন্ত্রের বিপর্যয় ঃ

চার রকমের পৃথক কর্মকান্ডের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যার প্রতিটিই, সময় মতো ঠেকানো না গেলে, বিশ্বব্যাপী বাস্তুতন্ত্রকে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং একটি জীবপ্রজাতি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। এই কর্মকান্ডগুলি হ'ল ঃ (ক) নিরক্ষীয় অরণ্যাঞ্চলের বিনাশ, (খ) পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের কর্মকান্ড, (গ) পারমাণবিক-শক্তি উৎপাদন (ঘ) সমকালীন সামরিকিবাদের বাহুল্য। এই তালিকা পরিবেশের দিক থেকে চরম বিপজ্জনক সমস্ত বা অধিকাংশ কর্মকান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। কিন্তু তবু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার পক্ষে এই তালিকা যথেষ্ট।

(ক) নিরক্ষীয় বর্ষা-বনাঞ্চলের বিনাশ ঃ

এই বনাঞ্চল ভূ-পৃষ্ঠে বিষুবরেখা বরাবর এক প্রশস্ত সবুজ বন্ধনীর মতো যা পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ৮ শতাংশ দখল করে আছে। তবু সারা বিশ্বে যত বৃক্ষসম্পদ আছে তার প্রায় অর্ধেক এই অঞ্চলেই জন্মায়। উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতির মোট অক্সিজেনের অধিকাংশটুকু উৎপন্ন হয় এই অঞ্চলে। উপরন্তু এই বনাঞ্চল একরকম সৌর-ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে যা সূর্যকিরণ শুষে নিয়ে ভূমন্ডলের তাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, এই নিরক্ষীয় বর্ষা-বনাঞ্চল হ'ল মানবজাতির পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের এক বিপুল ভান্ডারবিশেষ, অথচ সর্বত্রই তার বিনাশসাধন চলছে। ১৯৮২ সালে এই অঞ্চল ব্যাপ্ত করেছিল মোট প্রায় ১২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার পরিসর যা পৃথিবীর নিয়মিত উষ্ণ ও উচ্চবর্ষণশীল অঞ্চল বলে পরিচিত। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-র হিসেব অনুযায়ী, প্রতি বছর ১,৫৭,০০০ বর্গকিলোমিটার হারে এই অরণ্য অঞ্চল সাফ হয়ে চলেছে। এই পরিমাণটি হ'ল ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মোট স্থলভাগের সমান।

এ অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা। এইভাবে চলতে থাকলে ২০৫৭ সালের মধ্যে সমগ্র নিরক্ষীয় বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিশ্বের বর্ষা-বনাঞ্চলের প্রায় একের তিন ভাগ ব্রাজিলে অবস্থিত এবং একের দশ ভাগ অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার। এই বনাঞ্চলের প্রায় চার শতাংশ ভারতে অবস্থিত। এ সম্পর্কে আমাদের একটা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। কারণ, বিশ্বের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এই বনাঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। উপরন্তু বিশ্বের অংসখ্য বৈচিত্রময় প্রাণী-প্রজাতির আশ্রয় হিসেবে এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগানদার হিসেবে এই অঞ্চলের গুরুত্ব সবিশেষ। জীবনধারার পক্ষে অপরিহার্য এইসব ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়া উচিত নয়। তাই গড়ে উঠেছে এক ধরনের আন্তর্জাতিক আইন যা কোন ব্যক্তি, সংস্থা অথবা কোন রাষ্ট্রের লঙ্ঘন করার অধিকার নেই। কারণ সামান্য কিছু লোকের এই অধিকারকে সংযত করতে না পারলে সমগ্র মানবজাতি অদূর ভবিষ্যতে তার টিকে থাকার অধিকার হারাবে।

কিন্তু এসব কিছু বিস্মৃত হয়ে কিছু অতিকায় বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা যেমন Goodyear, Volkswagen ও Nestle ইত্যাদি আজ বেপরোয়াভাবে ব্রাজিলের এই বর্ষা-বনাঞ্চলকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ও ধ্বংস করছে। তারা হয়তো গোমাংস ব্যবসায় বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা একই সাথে বিপুল ধ্বংস সাধনও করছে।

বছর কয়েক আগে ইন্দোনেশিয়ায় এই বর্ষা-বনাঞ্চল সাফ করে ফেলার এক বিশাল কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। একদিকে বহু সহস্র জমি-কাঙাল জাভাবাসীকে সুমাত্রা, কালিমন্তন, সুলায়েসি ও পশ্চিম ইরিয়ানের এই জাতীয় বনাঞ্চলে স্থানান্তরিত করা শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর অনুগত ৭৩ জন সেনাপ্রধানকে International Timber Corporation of Indonesia (Wyeyerhauser) টাকা দিয়েছিল তার নিজের শেয়ারগুলো কিনতে এবং ৩৫ শতাংশ মুনাফা লাভ করতে। বিনিময়ে Wyeyerhauser পেয়েছিল ১.৫ মিলিয়ন একর বর্ষা-বনাঞ্চল সাফ করার অনুমতি।

(খ) পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প ঃ

পেট্রোলিয়ম-ভিত্তিক উচ্চমাত্রার টক্সিক কেমিক্যালের অশেষ যোগানদার হিসেবে এই শিল্প পরিবেশদূষণের অন্যতম ভয়ঙ্কর উপাদান। এর একটি কারণ অবশ্য এর উৎপাদিত সামগ্রীর চরিত্র। কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্য কারণটি হল এই শিল্প আর্থিক অগ্রগতি সাধন করে। আমরা জানি যে আমাদের ভূমন্ডল পেট্রোকেমিক্যাল

সামগ্রীকে বিনাশ করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একখন্ড সুতির কাপড়কে যদি মাটিতে পুঁতে রাখা হয় তবে কালক্রমে তা মাটিতে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু একখন্ড নাইলন কাপড়কে যদি ঐভাবে মাটির তলায় রাখা হয় তবে তা কখনোই মাটিতে মিলিয়ে যাবে না। অন্যভাবে বলা যায়, একখন্ড সুতির কাপড় ভূ-ব্যবস্থায় (Earth System) সম্পৃক্ত হয়ে মিলিয়ে যায় এবং তাই তা প্রাকৃতিক পরিবেশ-ব্যবস্থায় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু নাইলনের ক্ষেত্রে তা হয় না। এর অর্থ, একবার উৎপাদিত হ'লে পেট্রোকেমিক্যাল সামগ্রী বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রে অসমঞ্জস উপাদান হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে জমতে থাকে। অতএব যদি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে এইসব সামগ্রী উৎপাদিত হয় তাহলে ক্রমাগতই মজুত হতে থাকবে। এই সবই হ'ল দূষণ।

এতএব পেট্রোকেমিক্যাল-ভিত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশ মানেই মোট জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধিই শুধু নয়, মোট জাতীয় দূষণেরও বৃদ্ধি। এই অর্থনৈতিক বিকাশ মানেই ডেটারজেন্ট, রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যালজাত জামা কাপড় ও নানা আচ্ছাদন সামগ্রী ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। ডেটারডেন্টগুলিই হ'ল সবচেয়ে ক্ষতিকর। ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আত্মপ্রকাশ করে ৩০ বছরের মধ্যে ফসফেট নিষ্ক্রমণ প্রবাহকে সাতগুণ বৃদ্ধি করেছে, যা তৎপূর্ববর্তী ৩০ বছরে (১৯১০—১৯৪০-য়ের মধ্যে) বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র দ্বিগুণ। এগুলো ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ বলেও মনে করা হয়। আরো মারাত্মক হলো রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি। বলা হয় যে, আমেরিকার কৃষির ভিত্তি মাটি নয়, তেল। কিন্তু ১৯৪৫-এর পর চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাষীদের দ্বারা কীটনাশকের ব্যবহার ছ'গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তবু কীটপতঙ্গের দ্বারা শস্যহানি ঘটেছে প্রায় দ্বিগুণ। তাছাড়াও রাসায়নিক সার ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ শেষ পর্যন্ত মাটির তলায় গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলে মিশছে এবং এমনকি খাদ্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে। পরিশেষে উল্লেখ করতে হয়, তেল কোম্পানীগুলো তৃতীয় বিশ্বে এমন সব বিষাক্ত সামগ্রী বিক্রি করে চলেছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনী দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

(গ) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ঃ

সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল ধ্বংসকান্ডের ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন কী বিপজ্জনক এক প্রয়াস। এমনকি যদি এই জাতীয় দুর্ঘটনা নাও ঘটে তবু আণবিক শক্তির উৎপাদন কেন্দ্রগুলি মনবীয় পরিবেশের স্থায়ী ক্ষতিসাধন করেই চলবে। এইসব কেন্দ্রগুলি বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত আবর্জনা নির্গত করছে যা কোনভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। নির্গত এই বর্জ্যবস্তুর নানা প্রকাশ আছে যার মধ্যে সবচেয়ে কম নজর দেওয়া হয় পারমাণবিক fission থেকে সৃষ্ট অতিমাত্রার উষ্ণতা। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক থেকে এ হ'ল এক সামগ্রিক অপচয়। কারণ এর জন্যে যা করতে হবে তা হ'ল উচ্চচাপসম্পন্ন বাষ্প উৎপন্ন করা যা শক্তি-উৎপাদনকারী চাকা ঘোরাতে সক্ষম। এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রয়োজন ২০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের, তার বেশি নয়। অতএব জল ফোটানোর জন্য যদি পারমাণবিক চুল্লী ব্যবহার করতে হয় তবে তা হবে মশা মারতে কামান দাগার মত ব্যাপার। মশাটা ঠিকই মরবে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এর ফলে ঘটে যাবে। অনুরূপভাবে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির দরুন যে তাপ সঞ্চারিত হয় তা শুধুই অপচয় নয়, ববং তার দ্বারা সৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর তাপ-দূষণ। শুরুতে, তাপের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চল সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্রমশ পারমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে ততই সমগ্র জীবমন্ডল তাপদূষণে পরিকীর্ণ হতে থাকবে। এটা অবশ্য এক সুদূর সম্ভাবনা। আমাদের শুধু এইটুকু মনে রাখতে হবে যে একটি মাত্র পারমাণবিক তাপ-উৎপাদন কেন্দ্র সমগ্র হাডসন নদীর জলকে ৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে পারে।

এই মাত্রাতিরিক্ত তাপ সঞ্চার করা ছাড়াও সাধারণ এইসব পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলি নির্গত করে চলে চূড়ান্তভাবে তেজস্ক্রিয় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অদৃশ্য সব গ্যাস। পাশাপাশি প্রতিটি রিঅ্যাক্টর থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয়

বর্জ্য পদার্থ হাজার হাজার বছর ধরে toxic (বিষাক্ত?) থেকে যায়। এই বর্জ্য পদার্থের সবচেয়ে বিপজ্জনক উপাদান হ'ল প্লুটোনিয়াম — যার নামকরণ করা হয়েছে গ্রীক পুরাণে অন্ধকারের দেবতা প্লুটোর নামানুসারে। এই প্লুটোনিয়ামের বিষাক্ত শক্তি অটুট থাকে অন্তত অর্ধ মিলিয়ন বছর যাবৎ — যা আমাদের দীর্ঘ লিপিবদ্ধ ইতিহাস কালে প্রায় ১০০ গুণ বেশি দীর্ঘ। এই প্লুটোনিয়াম এতই বিষাক্ত যে যদি সমভাবে একে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে মাত্র এক পাউন্ড প্লুটোনিয়াম সমগ্র মানবপ্রজাতির ফুসফুস — ক্যান্সারের আশঙ্কা প্রকট করে তুলতে পারে। অথচ প্রতিটি পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রই নিয়মিত প্রতি বছর চার থেকে পাঁচশ পাউন্ড প্লুটোনিয়াম উদ্‌গীরণ করে চলেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্লুটোনিয়ামের অনিবার্য — উৎসারণের (unavoidable leakages) দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শিল্প ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুহার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করবে।

সব শেষে উল্লেখ্য, পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়ার পরও দূষণগত সমস্যা থেমে যায় না। এই শক্তিকেন্দ্রগুলি পুরোপুরি বন্ধ করে দেবার পর ১৫০ থেকে ২০০ বছর সময়ের মধ্যে এর সংক্রমণকারী ক্ষমতা রোধ করা বা এগুলোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া যায় না। এই কারণে তাদের তেজস্ক্রিয় কাঠামো এবং অন্যান্য উপাদানগুলি বিপুল পরিমাণ প্রতিরোধক সামগ্রীর তলায় চাপা দিতে হয়। সাধারণত একটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের জীবনকাল ৩০ বছরের বেশি নয়, ফলে জীবন্ত কেন্দ্রগুলির চেয়ে নির্বাপিত কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বাড়তে থাকে। এথেকে বোঝা যায়, যতই দিন যেতে থাকে ততই পরবর্তী পারমাণবিক কেন্দ্রটি কোথায় গড়ে তোলা যাবে তা ঠিক করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। বর্তমানে প্রায় ৩৭৫টি অসামরিক পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর সারা বিশ্বে চালু আছে, এবং তার চাইতে অনেক বেশি সংখ্যায় আছে বোমা তৈরির জন্যে গড়ে তোলা প্লুটোনিয়াম সৃষ্টিকারী পারমাণবিক কেন্দ্র। কালক্রমে এইরকম আরো অনেক পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তাদের জীবনকাল শেষ করে স্তব্ধ হয়ে যাবে গড়ে উঠবে নতুন আরো কেন্দ্র। ফলস্বরূপ, মারাত্মক জীবননাশী এইসব কাঠামোর বৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে বিশ্ব পরিবেশ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে তা কল্পনা করা কঠিন নয়।

(ঘ) সমকালীন সমরবাদ বাহুল্য ঃ

একালের সমরবাদ বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রবল প্রভাব ফেলেছে। মানুষের বসবাসব্যবস্থার বিপুল ক্ষতিসাধন করছে এই সামরিক প্রস্তুতির প্রক্রিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের MX-র ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার নির্মাণ এর এক দৃষ্টান্ত। ইতিহাসের বৃহত্তম নির্মাণ পরিকল্পনা এটি — যা মিশরের পিরামিড, আলাস্কার পাইপলাইন এবং পানামাখাল নির্মাণের থেকেও বড় প্রকল্প। তাছাড়া এই ক্ষেপনাস্ত্র-নির্মাণ প্রকল্পের বাবদ খরচের হিসেব সময়ের সাথে সাথে বেড়েই চলেছে। যদিও কেউই জানতে পারে না শেষ পর্যন্ত এই খরচের অঙ্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তবু ১৯৮০ সালের নভেম্বরে অথবা প্রকল্প সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার এক বছরের মধ্যে যে হিসেব হয়েছিল সেই অনুযায়ী ৩০ বছরের জীবনকালে ১০৮,০০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। স্বভাবতই এই বিপুল ব্যয়ের প্রকল্প পরিবেশের ধারণকারী উপাদানসমূহকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হাজার হাজার টন ধুলো ও আবর্জনা ঠেলে সরানো হবে বুলডোজার Earth movers ও অন্যান্য ভারী যন্ত্র ও যানের সাহায্যে। এটা বিশেষভাবে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে নেভাদায় যেখানে আগ্নেয়গিরি-উত্থিত ভস্মস্তরে 'Erionite নামক ক্যান্সারসৃষ্টিকারী রাসায়নিক উপাদান বর্তমান। এই ধুলার ধূম্রজাল থিতিয়ে যেতে অনেক মাস সময় নেবে, ইতিমধ্যে কিছু ধুলো, ইরওনাইট ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যত্রও বাতাসের সাথে ছড়িয়ে গিয়ে থাকবে।

উপরন্তু 'নির্মাণ' কর্মকান্ডের মাত্র একটি অংশ হলো রাস্তাঘাট তৈরির কাজ। তদুপরি প্রতি ২৩টি ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য একটি হিসেবে মোট ৪,৬০০টি বিশাল মজবুত কংক্রিটের আস্তানা, এবং ৫০,০০০ লোকের বাসস্থানের

ব্যবস্থা করতে হয়। সমগ্র প্রকল্পটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ১০০ থেকে ২০০টি সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা, যা ১০০ মিলিয়ন টন উপরিস্তর মৃত্তিকাকে খুঁড়ে সরায়।

এই পরিস্থিতিতে ধুলো চাপা দেওয়ার কোন কর্মসূচী সফল হওয়ার আশা নেই। প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়া মন্ডলের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উপত্যকাগুলিতে এই ধুলোর ধূম্রজালকে দীর্ঘকালিন মেয়াদে আটক করা গেছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে MX-র ২০ বছর-ব্যাপী অপারেশন ও নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় জলের যে হিসেব করা হয়েছিল তার খরচ প্রকল্পের খরচের চেয়ে বেশি। ১৯৮০ সালে অঙ্কটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১,১২,০০০ মিলিয়ন গ্যালন এবং এখন এটা হয়েছে ১,৯০,০০০ মিলিয়ন গ্যালন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই মাটির তলার জলস্তরে ইতিমধ্যেই যে অবনমন ঘটেছে তা আরো বেশি করে অবনমিত হবে।

কিন্তু Coyote Spring Valley-তে ভূগর্ভস্থ জলের সরবরাহের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হবে যথেষ্ট বিপর্যয়কারী। শুধু MX-এর জন্যই ঐ অঞ্চলে বাইরের থেকে জল পাইপযোগে সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু জল সরবরাহের সঙ্কটই এই প্রকল্পের একমাত্র সঙ্কট নয়। আর একটি বিপদ হলো Hologeton নামে এক বিষাক্ত আগাছা যা ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার বিপর্যয়ের ফলে বিপুলভাবে গজিয়ে ওঠে এবং যা খেয়ে গরু ভেড়া প্রভৃতি প্রাণী মারা যায়। এক কথায়, নেভাদা ও উটা রাজ্যের বহু বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়ে পশুচারণ প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়।

অতএব এই সব রাজ্যের জনগণ যুদ্ধকালীন সময়ে প্রত্যক্ষ পারমাণবিক আক্রমণের সম্ভাব্য শিকারে পরিণত হয়, এমনকি যখন যুদ্ধ ঘটছে না তখনও MX-য়ের দরুন লোকবসতি আগাগোড়া ধ্বংসের মুখে পড়ে।

ধারাবাহিক জীবনযাত্রা প্রণালী ঃ

সহজেই বোঝা যায় যে এই ধরণের যে কোন প্রয়াস প্রকল্প বিশ্বপরিবেশকে এত দূর বিপন্ন করে তুলতে পারে যে তা আর আমাদের ধারণ করতে বা সহায়তা করতে পারবে না। আর সামগ্রিকভাবে এই জাতীয় প্রকল্পগুলির সমষ্টি আমাদের পরিবেশকে ব্যাপকভাবে বিনষ্ট করবে। সমস্যাটা হলো এই যে এইসব বিপজ্জনক প্রয়াস এতটাই বেগবান হয়ে উঠেছে যে আমরা এগুলোকে হঠাৎ একদিনে থামিয়ে দিতে পারি না। Norman Mayer লিখেছেন ঃ "আমাদের অবস্থাটা একটা Supertanker-এর ক্যাপ্টেনের মত। সে যদি তার Tankerটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চায় তাকে বহু মাইল আগে থেকে তার জাহাজের গতিবেগকে শ্লথ করতে হবে, একেবারে ভিন্নমুখী যাত্রার তো কথাই নেই। সময়টা আমাদের পক্ষে নয়।"

অতএব আমাদের চেষ্টা করা উচিত পরিবেশ-বিধ্বংসী আলাদা আলাদা কর্মকান্ডকে অতিক্রম করে ভাবা। মানবীয় বসত-ব্যবস্থার ক্রমাগত বিনাশকে ব্যাখ্যা করতে পারে এইরকম কিছুর কথাই আমাদের ভাবা উচিত। এই 'কিছু'টা যে কী তা যতক্ষণ আমরা খুঁজে না পাচ্ছি এবং যতক্ষণ এই ধ্বংস প্রক্রিয়াকে আমরা নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারছি ততক্ষণ আমরা আমাদের বসতব্যবস্থা এবং আমাদের নিজেদের বাঁচাতে ব্যর্থ হব। ধারাবাহিক জীবনপ্রণালী বলতে যা বোঝায় তা শূন্যে গড়ে তোলা যায় না। তার জন্যে চাই এমন সামাজিক ব্যবস্থা যা প্রকৃতির সংরক্ষণকে এক চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে স্বীকার করবে। কারণ, যদি আমরা চাই যে আমাদের প্রজাতিকে পৃথিবী ধারণ করে থাকুক তবে জীবন-সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীকে লালন করতে আমরা বাধ্য। এ হলো এক পারস্পরিক সম্পর্ক।

আমরা আগের অধ্যায়ে কিছু কিছু বিশ্লেষণ করেছি কীভাবে এই বাস্তুতন্ত্র নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের বিনাশ ও অন্যান্য বিপজ্জনক প্রয়াসের দ্বারা বিপর্যস্ত হচ্ছে। লোকে এগুলোকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বোঝে না। পৃথিবীর

জীবন-সহায়ক ব্যবস্থা কীভাবে এসবের দ্বারা বিপন্ন হয় লোকে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কারণ তারা দেখে যে এতে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হচ্ছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে মানবীয় বসত-ব্যবস্থার বিনাশের মূলে আছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। অতএব, ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন যদি আটকানো না যায় অথবা বিপরীতমুখী না করা যায় তবে পরিবেশ সংরক্ষণের কজে আমরা কিছু করে উঠতে পারবো না। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো প্রচলিত পরিস্থিতি বিষয়ে গণসচেতনতা গড়ে তোলা। পরিবেশ সুরক্ষা যখন এক যথার্থ ও জীবন্ত রাজনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে তখনই ধারাবাহিকতাপূর্ণ জীবনপ্রণলী গ্রহণ করা যাবে। এটাই স্বাভাবিক যে এই ধরনের ধারাবাহিকতাপূর্ণ এক সভ্যতা নিজস্ব এক নতুন নৈতিক মূল্যবোধ, এক নতুন সাংগঠনিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

বস্তুতপক্ষে, আজকের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মূলে রয়েছে একালের সামরিক — শিল্পোন্নত সভ্যতা যথেষ্ট মনে করে না। এই সভ্যতা ক্রমবর্ধমান চাহিদার দ্বারা পরিচালিত হয়। ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা থেকে জন্ম নেয় অস্ত্র, আরো অস্ত্র — এই দাবি। অনুরূপভাবে আরো-আরো ভোগের ইচ্ছা, তবু যথার্থ কোন তৃপ্তির সম্ভাবনা নেই। তবু ধনীদের ভোগবাসনা যদি যথেষ্টতার ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় তবেই সমস্ত মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের পূরণ সম্ভব হবে। তখনই আমরা পরিবেশের সংরক্ষণ ঘটিয়ে তার সাথে বাঁচতে শিখব। এবং তখনই আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং নিজেদের মানবজাতির বিরুদ্ধে হিংসা বর্জন করতে পারব।

অনুশীলনী ৫

দ্রষ্টব্য : ১) নীচের খালি জায়গা ব্যবহার করুন। ২) পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয়ের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

১) সংক্ষেপে মানুষের সেইসব কর্মকান্ডের আলোচনা করুন যা বিশ্বের বাস্তুব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে।

২) বাস্তুব্যবস্থার সঙ্কট ঠেকাতে কিছু উপায় নির্দেশ করুন।

৩৩.৮ সারাংশ

এই এককে আমরা বাস্তুতন্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি এবং তার বিপর্যয়ও আলোচনা করেছি। বর্তমান বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটকে ঠেকানোর ব্যাপারে আমাদের কী করণীয় তার দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

৩৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

'Boader, PJS and Seed, R 1985	An Introduction to Coastal Ecology, Chapman & Hall, New York
Sapru, RK, 1957	Environmental Management in India (Vol I & II) Ashis Publishing House, New Delhi, 1957
Singh, Samar, 1986	Conserving India's Natiional Heritage, Natraj Pub., Deharadun
Varshney, C. K. (Ed), 1983	Water Pollution and Management, Wiley Eastern Ltd., New Delhi.
Banerjee, BN	Environmental Pollution and Bhopal Killings, Gian, New Delhi
Gare, A and Elliot R, 1983	Environmental Philosophy, The Open University Press Milton Keynes, UK.
Harvell A Mark, 1984	Nuclear Winter, Springer Verlag, New York.

৩৩.১০ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী ১

১) বাস্তুতন্ত্র হ'ল এমন এক আধার যার মধ্যে আছে প্রাণীজগৎ ও তার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারা। একটি প্রাণীর সাথে তার পরিপার্শ্বের সম্পর্কের মধ্যে এক স্বাভাবিক ভারসাম্য বর্তমান। সাধারণত এই ভারসাম্য নিজে থেকেই গড়ে ওঠে। মানুষের হাতে এই স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় ইদানিংকালে প্রতিবেশব্যবস্থার অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়েছে।

অনুশীলনী ২

১) বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট বলতে প্রধানত বোঝায় প্রাণীসমূহ ও তদের পরিবেশের মধ্যকার স্বাভাবিক ভারসাম্যের বিপর্যয়। এই বিপর্যয় ঘটছে মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের দরুন। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের একজন হস্তক্ষেপকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর ভূমিকা। এর ফলে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তাই আজ সাধারণভাবে বাস্তুতন্ত্রগত সঙ্কট নামে পরিচিত।

২) আজ আমাদের বাস্তুতন্ত্র নানা দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন। প্রথমত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ও কীটনাশক থেকে গড়ে ওঠা বিপদ। দ্বিতয়ত 'সবুজ ঘরের প্রতিক্রিয়া' (Green House Effect) থেকে গড়ে ওঠা বিপদ। এই 'সবুজ ঘর প্রতিক্রিয়া'র ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বর্ধমান সঞ্চয় ঘটছে? আমাদের বাস্তুতন্ত্র আজ এইরকম কয়েকটি বিশিষ্ট বিপদের মুখোমুখি।

অনুশীলনী ৩

১) (ক)

২) (ক)

৩) (ক)

অনুশীলনী ৪

পরিবেশগত অবক্ষয় বলতে মূলত বোঝায় সময়ের স্বাভাবিক ধারায় ক্ষয়ীভবন। পরিবেশ দূষণ থেকে এই প্রক্রিয়ার ধারা ভিন্ন। পরিবেশের অবক্ষয় হ'ল এক স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া, অন্য দিকে দূষণ হ'ল মূলত এক মনুষ্যসৃষ্ট প্রক্রিয়া।

অনুশীলনী ৫

মোটামুটিভাবে মানুষের চারটি কাজের ফলে বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হচ্ছে। এই কাজগুলি হল ঃ (১) নিরক্ষীয় বর্ষা-বনাঞ্চলের বিনাশ সাধন; (২) পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের প্রতিষ্ঠা যা থেকে উৎপন্ন হয় বিষাক্ত গ্যাস, রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য টক্সিক পদার্থ; (৩) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন; এবং (৪) মাত্রাতিরক্ত সমরবাদ। এইসব বিপদের দীর্ঘ-মেয়াদি সমাধান হ'ল জীবন-সমর্থনকারী ব্যবস্থার স্বনির্ভরতা।

একক ৩৪ □ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশ

গঠন

৩৪.১ উদ্দেশ্য

৩৪.২ প্রস্তাবনা

৩৪.৩ বিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা

৩৪.৪ বিজ্ঞানের নানা দিক ও প্রয়োগ

৩৪.৪.১ বিজ্ঞানের গতিশীল চরিত্র

৩৪.৪.২ গবেষণা ঃ বিজ্ঞানের একটি দিক

৩৪.৪.৩ সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞান

৩৪.৫ বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

৩৪.৫.১ বস্তুনিষ্ঠতা

৩৪.৫.২ পরীক্ষানিরীক্ষা

৩৪.৬ বর্ণবৈষম্য এক অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ ও নয়া উপনিবেশবাদের সহায়ক

৩৩৪.৬.১ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার আবশ্যক শর্তাবলী

৩৪.৭ সারাংশ

৩৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৪.৯ উত্তরমালা

৩৪.১ উদ্দেশ্য

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ বিষয়ে এই এককটি পর্যায় আটের শেষ আলোচ্য বিষয়। এই পর্যায়ের পূর্ববর্তী এককগুলোতে অর্থাৎ ৩১, ৩২, এবং ৩৩ এককে আপনারা আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলি নিয়ে অধ্যায়ন করেছেন—যে সমস্ত সমস্যাগুলি দ্বারা আমাদের দেশ লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং যেগুলি সম্পর্কে আমাদের সক্রিয় হওয়া উচিত। বর্তমান এককে পড়া হবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী কীভাবে গড়ে ওঠে যার সাহায্যে আমরা বিশ্বের প্রধান সমস্যাগুলোকে বুঝতে পারি এবং কীভাবে তা আমাদের দেশকে প্রভাবিত করে সেটা বিষয়গত ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করতে পারি।

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হ'ল ঃ

- বিজ্ঞানের মূল ধারণাসমূহ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সাথে পরিচয় ঘটানো।
- বৈজ্ঞানিক মনোবাবের সম্ভাব্য লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করা।
- সমাজের প্রতি বৈজ্ঞানিক মনোভাব, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানের সুফলগুলিকে সংক্ষেপে তুলে ধরা।

৩৪.২ প্রস্তাবনা

আমাদের সংবিধানের 51(A) অনুচ্ছেদ যেখানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে অন্যতম কর্তব্য হিসেবে নাগরিকদের বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবীন নাগরিগকেদর তাই প্রথমেই প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক মনোভাব বলতে ঠিক কী বোঝায় তা জানা এবং তার অনুশীলন করা। সংবিধানে উল্লিখিত বলেই যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলা এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাই নয়, অন্য কারণেও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অনুধাবন ও অনুশীলন বিশেষ জরুরি। বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে কোন সমস্যা বোঝা ও সমাধান করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হয়, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সৃজনশীল কাজে বুদ্ধিবাদী মানসিকতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য বৈজ্ঞানিক মানসিকতা জীবনে সাফল্য অর্জনে কোন যাদুমন্ত্র নয়, অথবা এটা হঠাৎ-ই আয়ত্ব করার জিনিষও নয়। এটা আয়ত্ব করতে হলে বেশ কিছু সময় ধরে সযত্ন অভিনিবেশ ও পর্যালোচনার আশ্রয় নিতে হয়।

এই পাঠক্রম অনুসরণ করছেন যেসব ছাত্রছাত্রী তাঁদের অনেকেই যেহেতু বিজ্ঞানের সাথে সবিশেষ পরিচিত নন, তাই আমরা প্রথমেই খুব সংক্ষেপে বিজ্ঞান কী তা নিয়ে আলোচনা করব। যদিও বিজ্ঞানের কোন স্পষ্ট নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভব নয়, তবু এর সম্পর্কে কিছু ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। এই ধারণা থেকেই পরবর্তী পর্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করব 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' ও 'বৈজ্ঞানিক মনোভাব' সম্পর্কিত ধারণাগুলি। আপনারা হয়তো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন যে 'বিজ্ঞান' বা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' কোনটিকেই স্পষ্ট ও সরলভাবে বর্ণনা করা যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ধারণাগুলি সম্পর্কে মতপার্থক্য, এমনকি মতের সংঘাতও থাকতে পারে। এমনকি কেউ কেউ এমন কথাও বলতে পারেন যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বলে কিছু নেই। অবশ্য আমাদের বিশ্বাস বর্তমান এই আলোচনা থেকে আপনাদের নিজেদেরই কিছু ধারণা গড়ে উঠবে, এবং যদি আগ্রহী হন তবে এই বিষয়ে অন্য কিছু বইও পড়তে পারেন। এগুলি পড়ে যদি আপনাদের মনে হয় যে এগুলি অর্থবহ তবে আপনারা নিজ নিজ প্রত্যয় অনুশীলন করতে পারেন।

৩৪.৩ বিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা

আমরা কী বিজ্ঞানকে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে পারি? একজন অতিসাধারণ মানুষ এমনকি নিরক্ষর লোকেরও বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ভাসাভাসা ধারণা আছে। সম্ভবত তার মাথায় বিজ্ঞান বলতে যে ধারণা সৃষ্টি হয় তা রেডিও, টিভি, এরোপ্লেন, মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহ ইত্যাদির মত মানুষের বিস্ময়কর উদ্ভাবনগুলির সাথে যুক্ত। কেউ

কেউ আবার বিজ্ঞান বলতে বোঝেন জীবনদায়ী ওষুধ, কেউ আবার বিজ্ঞান বলতে আমাদের নানা দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীকে বোঝেন যেমন জলের মগ থেকে বলপয়েন্ট পেন পর্যন্ত সব কিছুই। বস্তুত আমাদের জীবন আধুনিক নানা আবিষ্কারের সাথে কত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তা Neil Postman ও Charles Weingartner-য়ের লেখা Teaching as a Subversive Activity বইয়ের অন্তর্গত একটি ছোট্ট অনুচ্ছেদের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ ঃ

"....এই শতাব্দে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটেছে এবং তাদের বেশির ভাগই বাড়ির দেওয়ালের সাথে প্লাগ দিয়ে যুক্ত। ...কল্পনা করুন আপনার বাড়ি এবং আশেপাশের অন্যান্য বাড়ি ও অট্টালিকাগুলিকে চারদিকে থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে; এবং এইসব বাড়ি থেকে গত ৫০ বছরে উদ্ভাবিত সমস্ত ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে...সেখানে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ নেই, নেই কোন মিউজিক ডিস্ক, টেপরেকর্ডার, টেলিফোন অথবা টেলিগ্রাফ। যদি ভাবেন যে এইসব ইলেকট্রনিক মাধ্যম না থাকায় বড়জোর বিনোদন ও সংবাদ প্রাপ্তিতে বাধা হবে তো মনে রাখা দরকার এর পর কোন সময় বৈদ্যুতিক আলো, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার অথবা রুম হিটার ও সরিয়ে নেয়া হবে। ফলে একদিনের বেশি জীবনধারণ করতে হলে আপনি যা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ হয়ে দাঁড়াবেন।"

কিন্তু এ ধরণের অনুভব, বা বিজ্ঞানের উপর আমাদের নির্ভরতা কোনটিই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ করে না। বিজ্ঞান এবং আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনে এমনভাবে মিশে গেছে যে আমরা কখনো কখনো এগুলিকে অতি স্বাভাবিক বলে ভাবি, এবং আমাদের ব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলো কীভাবে প্রস্তুত হয় তা নিয়ে ভাবি না। আমাদের মধ্যে ক'জনেরই বা চিন্তার মধ্যে আসে পেন্সিলের মধ্যে কালো সীসে কীভাবে পোরা হয় অথবা কীভাবে বলপেনের মধ্যেকার ক্ষুদে ক্ষুদে বলগুলো এত নিপুণভাবে তৈরি হয়। আমরা লক্ষ্য করি যে প্রতিটি সামগ্রী ও প্রতিটি প্রক্রিয়ার সাথেই বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট।

আবার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে যদি আমরা ইতিহাস বিশ্লেষণ করি তাহলেও আমরা সফল হবো না। শত সহস্র বছর আগে মানবপ্রজাতির যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন থেকে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে তাকাতে এবং খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রয়োজনে কিছু করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। একেবারে গোড়ার দিকেই বিজ্ঞান বোধহয় ছিল ফলমূলপাতা ইত্যাদির মধ্যে কোনগুলি খাদ্য এবং কোনগুলি অখাদ্য-তা নিরূপণ করা। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে এবং কৌতুহলের বশে তার চারপাশের যা কিছু বর্তমান তাকে অন্বেষণ করে, পরীক্ষানিরীক্ষা করে, আবিষ্কার করে ও ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। এইভাবে বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড মানব-অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বহুকাল আগে থেকেই বিশেষ বিশেষ বৃত্তি বা কর্মধারায় বিশেষ দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল যার ফলে কেউ কেউ বিশেষ ধরনের হস্তশিল্পে, কেউ চিকিৎসায় আবার কেউবা জ্যোতির্বিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ আবার আমরা দেখছি আমাদের জীবনের সকল দিকে বিজ্ঞানের যে সর্বব্যাপী বিস্তার তার ফলে আমরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের কোন না কোন কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। স্বভাবতই এইরকম সর্বব্যাপী মানবীয় কর্মকান্ড সুসংবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা শক্ত।

প্রকৃতপক্ষে, এক সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ইতিহাসকার অধ্যাপক জে.ডি বার্নল তার 'ইতিহাস বিজ্ঞান' (Science in History) নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এ ব্যাপারে আমায় নিশ্চিত করেছে যে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণের কোন চেষ্টা, যে চেষ্টা বহুভাবেই করা হয়েছে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের কোন একটি ক্ষুদ্র দিকের অল্পবিস্তার এক অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিতে পারে মাত্র। সমাজ বিবর্তনের স্বতন্ত্র এবং বারম্বার সংঘটিত হয়না এমন যে প্রক্রিয়ার মানবিক কার্যকলাপ জড়িত, বলতে গেলে সেখানে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়াই চলেনা।

৩৪.৪ বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও তার নানা দিক

'বিজ্ঞান' কথাটির মধ্য দিয়ে আমরা যা বোঝাতে চাই তার সম্পর্কে অধিকতার সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞানের নানাদিকে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে স্পষ্ট দিকটি হল এই যে বিজ্ঞান বলতে মানবজাতির সুদীর্ঘকালব্যাপী অস্তিত্বের মাধ্যমে গড়ে তোলা বিপুল জ্ঞানভান্ডারকে বোঝায় কিন্তু বোধহয় বিগত ১০ হাজার বছরের মানবসভ্যতার সঞ্চিত জ্ঞানভান্ডারই এক্ষেত্রে অধিক প্রাসঙ্গিক। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে সবচেয়ে নাটকীয় অগ্রগতি হয়েছে বিগত কয়েক'শ বছরে। এই অগ্রগামী জ্ঞান বিস্তৃত হয়ে আছে সব কিছুতে—অণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কণা থেকে আকাশের গ্রহ, ও ছায়গ্রহ ইত্যাদির মত সুবিশাল বস্তুপিন্ড পর্যন্ত। এই জ্ঞান বিস্তৃত আছে সমস্ত গাছপালা ও প্রাণীজগত, স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে, খাদ্য ও ঔষধ বিষয়ক সকল তথ্যে। মানুষের শরীর ও মন সম্পর্কিত সকল অন্বেষণের সঙ্গে বিজ্ঞান জড়িত। পুডিং খেতে কেমন তা যেমন না খেয়ে বোঝা যায় না তেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তার বিস্ময়কর সাধারণ সূত্রগুলির নির্ভরযোগ্যতা সেগুলোর প্রয়োগ ছাড়া পরীক্ষিত হতে পারে না। এই প্রয়োগের মাধ্যেমেই উড়োজাহাজ ওড়ানো হয়, খাদ্যশস্য ফলানো হয়, দৈনন্দিন জীবনের হাজারো টুকিটাকি সামগ্রী তৈরি হয়, নানা উপায়ে নানা শক্তি উৎপাদন করা হয় যার দ্বারা যন্ত্রপাতি চালানো যায়। এই জ্ঞানসম্পদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই সম্পদ সর্বদাই অসম্পূর্ণ। যতই আমরা এই জ্ঞান আয়ত্ত করি ততই এই জ্ঞানের জানা ও অজানার সীমারেখায় দাড়িয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম হয়। এইভাবে ক্রমশই নতুন নতুন তথ্যের উদ্ভাবন হয়, এবং নতুন ও পুরোনো তথ্যের ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তত্ত্ব জন্ম নেয়। ফলে পুরোনো জ্ঞানের পরিধির তুলনায় দ্রুততর হারে নতুন নতুন তত্ত্বের বৃদ্ধি ঘটছে। বলা হয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশ উদ্ভাবনাকেন্দ্রিক। ভিন্নমত অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় প্রতি ১০ বছরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বিগুণ হচ্ছে।

৩৪.৪.১ বিজ্ঞানের গতিশীল প্রকৃতি

এটা স্পষ্ট যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্থির দাঁড়িয়ে থাকে না, এটা গতিশীল প্রক্রিয়া। এবং সবচেয়ে ভাল বিজ্ঞানকর্মী তাঁরাই যাঁরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বদলাতে, শোধরাতে এবং পুরোপুরি নতুন করে ব্যাখ্যা করতে বেশি সক্রিয়। এই কাজকেই সৃজনধর্মী কাজ বলে অভিহিত করা হয় এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্য ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। এসব জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থির বা অপরিবর্তনীয় থাকা একটি গুণ বলে বিবেচিত হয় না কিন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্বজ্ঞানকে বাতিল বা শোধরানোর চেষ্টা বিপদ ডেকে আনে।

৩৪.৪.২ গবেষণা ঃ বিজ্ঞানের একটি দিক

বিজ্ঞানের এই দ্বিতীয় দিকটি প্রথম দিকটির সাথে জড়িত। কারণ নতুন জ্ঞানের অবিরাম অন্বেষণ, যা বর্তমান জ্ঞানসমূহের বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না, তাকে অব্যাহত রাখতে গেলে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত নানা প্রতিষ্ঠানের এক সমাহার সমন্বয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ধারার সাথে যুক্ত হওয়ার অর্থ অনেকগুলো বছরের শিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার প্রতি গভীর অভিনিবেশ ও দায়বদ্ধতা। যারা ওপর-ওপর কিছু তথ্য জানে এবং পরীক্ষা পাশ করতে হয়তো সেগুলো মুখস্ত করে ফেলে তারা যথার্থভাবে কখনো বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে পারে না; তারা বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে বা সামাজিক উন্নয়নের কাজে তাকে প্রয়োগ করতে পারেন না।

শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজন সংযোগমাধ্যম। তাই গবেষণাসংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তক ও পত্রপত্রিকার প্রকাশনা একটি বৃহৎ শিল্প (Industry)। প্রতি বছর নানাভাষায় লক্ষ লক্ষ বই ও জার্নাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এবং বর্তমানে জনশিক্ষার প্রয়োজনে ভিডিও ও অডিও (দৃশ্য ও শ্রাব্য) ক্যাসেট তৈরি হচ্ছে ও সম্প্রচারিত হচ্ছে প্রায় সব দেশেই। এই কাজ, শিল্প ও পেশার সাথে লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানী জড়িত। উপরন্তু ক্লাশরুমের জন্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যেমন প্রয়োজন তেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলির জন্যেও তা প্রয়োজন। কিছু কিছু উচ্চ-প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ এবং এজন্যে সমবায়ভিত্তিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর একটি রেওয়াজ হয়ে উঠেছে যেখানে নানা দেশ নানা গবেষণা সংস্থায় যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে, ইউরোপীয় দেশগুলির পারমাণবিক গবেষণার এইরকম এক যৌথ কেন্দ্র আছে (CERN)। ভারতেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গড়ে তুলেছে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পারমাণবিক বিজ্ঞানের এক গবেষণাকেন্দ্র যা দিল্লীতে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের এই বিপুল আয়োজন এবং বিশেষ ধরনের ও ব্যয়বহুল পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডকে এক আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করেছে। এবং এর জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞানের বিনময় স্বাধীনতা।

৩৪.৪.৩ সমাজের পরিবর্তনসাধনের মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের তৃতীয় দিকটি হ'ল সমাজ কীভাবে তাকে কাজে লাগায়। আজ মানুষ যা কিছু সামগ্রী ব্যবহার করে তার প্রত্যেকটির উৎপাদনের পেছনে আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বস্তুত প্রতিটি উৎপাদনশীল কর্মের ভিত্তিমূলে আছে বিজ্ঞান। কৃষির দিকে তাকালেই দেখা যাবে এক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রকৃতির সবচেয়ে কাছাকাছি এবং মনে হতে পারে যে ধান, গম এবং শাকসব্জি হয়তো 'প্রাকৃতিকভাবেই' উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের মানবসভ্যতার বর্তমানস্তরে এটা ঘটে না। কৃষি উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন সঠিক বীজ যা বিশেষজ্ঞদের সযত্ন প্রয়াসে সৃষ্টি হয়। জমিখন্ড যদি বৃহদাকার হয় তবেতো কর্ষণ করতে প্রয়োজন যন্ত্রের। কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক বড় বড় কারখানায় উৎপাদিত হয়। জলসেচ অব্যাহত রাখতে যে গভীর নলকূপ ব্যবহার হয় তা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। এমনকি শস্যের যথাযথ মজুতের জন্যও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রয়োজন যাতে শস্য নষ্ট না হয়। উৎপন্ন সামগ্রীর উন্নতির জন্য এবং বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদন মূল্য কমিয়ে আনতে নিয়মিত ও সচেতনভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। দরকারমত প্রযুক্তির দ্বারা উৎপন্ন কাপড় আধুনিক মিলে তৈরি আধুনিক বস্ত্রের চাইতে সস্তাও নয়, সূক্ষ্মও নয় অতএব যদি কোন দেশ তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিক্রি করতে চায় তাহলে তাকে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে তার পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করতে সর্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কজে লাগানো যায়। এই উদ্দেশ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। এবং এই উন্নতি শুধু যে বাণিজ্যের সুবিধা বৃদ্ধি করে তাই নয়, এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, উৎপাদন-উপকরণগুলির দ্বারাই সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় এবং এই সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি উৎপাদনধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। উদাহরণ হিসেবে, সাবেকি কৃষিব্যবস্থায় লোক কৃষিজমিকে ঘিরেই বসবাস করতো। এই পরিস্থিতিতে যে ধরনের জনজীবন বা সমাজজীবন সম্ভব (যা গ্রামীণ জীবনধারা নামে অভিহিত) তা আধুনিক শিল্প ও কলকারখানা ভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার (যেখানে শ্রমিক, যন্ত্রকুশলী ও প্রাশাসকদের প্রয়োজন) সাথে যুক্ত নগরজীবন থেকে ভিন্নধর্মী। এই দিকে থেকে বলা যায়, বিজ্ঞান যখন উৎপাদন-উপকরণগুলোর পরিবর্তনসাধন করে তখন পাশাপাশি তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরও ঘটায়।

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল, বিভিন্ন মানবসমাজ নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। প্রথম দিকে এই সংঘাত হয়তো ঘটতো উর্বরা জমি, গোচারণক্ষেত্র, বনসম্পদ ও খনিজ সম্পদের দখলদারী নিয়ে। বিগত কয়েক শতাব্দে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে একদেশের দ্বারা আরেকটি দেশকে সম্পূর্ণ দখল করার উদ্দেশ্যে যাতে ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার হস্তশিল্প ইত্যাদি থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং যাতে বিজয়ী দেশ তার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী লাভজনকভাবে অধিকৃত দেশে বিক্রি করতে পারে। এইভাবেই ভারতবর্ষ পরিণত হয়েছিল ব্রিটেনের উপনিবেশে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র, যা ক্রমাগতই প্রযুক্তিগতভবে উন্নত হতে হবে—তলোয়ার থেকে বন্দুক থেকে মেসিনগান; অথবা সাদামাটা গোলা ছোঁড়ার ব্যবস্থা থেকে কামান বা আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমবর্ষণকারী এরোপ্লেন বা রকেট পর্যন্ত। সর্বশেষ অস্ত্র হলো আণবিক বোমা যার ধাংসাত্মক শক্তি এতই বিশাল যে মাত্র ১০০টি বোমাই বিশ্বের সকল প্রাণীপ্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম। এখানেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিজ্ঞানে অনগ্রসর কোন দেশকে অন্য দেশের দয়ার উপর নির্ভর করতে, অথবা তাকে অন্য দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে যে দেশ তার উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ, কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে যুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের অভাবে দেশের সার্বভৌমিকতা পর্যন্ত বিপন্ন হতে পরে। সমস্ত উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশ আজ এই সঙ্কটের সম্মুখীন।

অনুশীলনী ১

১. প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত এমন কয়েকটি appliance-য়ের উল্লেখ করুন যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফসল।

.....

.....

.....

.....

.....

২. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী ? এই প্রশ্নটি 'বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' শীর্ষক অংশের সঙ্গে যুক্ত।

.....

.....

.....

.....

.....

৩৪.৫ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগে কীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এত দ্রুত বৃদ্ধি পেল এবং কীভাবে বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ও বাস্তববাদী জ্ঞানের দ্বারা অর্থনীতি, সমাজজীবন এমনকি রাজনীতি এত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হলো? এর উত্তর নিহিত আছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন ও তার সত্যতা কঠোরভাবে যাচাই করে নেয়ার যেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আছে তার মধ্যে। নীচে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হবে এবং আপনারা দেখবেন যে মূলত তা বেশ সরল, যদিও শুরুতে প্রায় কয়েক শতাব্দ ধরে এই পদ্ধতি প্রচলিত ভিন্ন পদ্ধতিসমূহের সাথে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল।

৩৪.৫.১ বস্তুনিষ্ঠতা

বস্তু, বিষয় ও ঘটনাবলীর সতর্ক পর্যবেক্ষণের উপর এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে এই পর্যবেক্ষন চালানো হয় তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার উপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে, গ্রহণক্ষেত্রের গতিবিধি বহুযুগ ধরে বিশ্বের নানাপ্রান্তের লোক পর্যবেক্ষণ করছে; এবং তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে এইসব গ্রহণক্ষেত্রের গতিবিধি সম্পর্কে এবং তাদের অবস্থান, গতির দ্রুততা এবং তাদের গতিপথের নিয়ম বা অনিয়ম সম্পর্কে হিসেবনিকেশ করা যায়। অন্য এক উদাহরণের কথাও বলা যায়। যখন কেউ অসুস্থ হয়, তখন রোগের সব লক্ষণগুলো ভাল ক'রে লক্ষ্য করা হয়, এবং যদি কোন পথ্য, ঔষধ বা চিকিৎসায় রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে অথবা অধিকতর অসুস্থ হয় তাও তথ্যাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণকে অতি অবশ্যই পুরোপুরি তথ্যনির্ভর হতে হয়, অর্থাৎ যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সে বিষয়ে যদি প্রচলিত কোন বিশ্বাস থকে তা যেন পর্যবেক্ষণধারাকে প্রভাবিত না করে। যদি পর্যবেক্ষকেরও কোন ব্যক্তিগত ধারণা বা সংস্কার থাকে তাকেও সরিয়ে রাখতে হবে; এইরকম বস্তুনিষ্ঠতার ফলে পৃথিবীর নানাস্থানে কোন একটি রোগের নানা পর্যবেক্ষক একই জাতীয় সিদ্ধান্তে এসে থাকে। এ থেকে অর্জিত জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৩৪.৫.২ পরীক্ষানিরীক্ষা

কখও কখনও এই পর্যবেক্ষণের পরিধি বৃদ্ধি করা সম্ভব একেবারে ঘটনাস্থলে গিয়ে এবং নানা জায়গায় ঘুরে অনুসন্ধান চালিয়ে। যেমন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশে গাছপালারা যেভাবে রয়েছে, অথবা খনিজদ্রব্য মাটির উপরিস্তরে অথবা ভূগর্ভে যেভাবে রয়েছে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। আবার কখনো কৃত্রিমভাবে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি চারাগাছকে সূর্যালোক থেকে দূরে অন্ধকারের মধ্যে রেখে তার অবস্থা ও আচরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরীক্ষানিরীক্ষা। আজকের দিনে অবশ্য এমনসব যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে যা মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ আজ আমাদের এমন সব জিনিষ দেখতে সক্ষম করে তুলেছে যা অন্যথায় আমাদের কাছে আদৌ দৃশ্যমান ছিল না বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্পষ্ট হতো না। পরীক্ষানিরীক্ষা নানাধরণের হতে পারে, যার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ পরীক্ষানিরীক্ষা হল মানুষকে রকেটের মধ্যে স্থাপন করে, রকেটের গতিকে হঠাৎই দ্রুত বাড়িয়ে দিয়ে অথবা তাকে পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে পাঠিয়ে তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করা। পরীক্ষানিরীক্ষা, অন্বেষণ ও পর্যালোচনা ইত্যাদির সাহায্যে তথ্য সংগৃহীত হয়—যার কিছু অংশ বর্ণনামূলক হতে পারে, আবার কিছু অংশ পরিমাণগত। এই পরিমাণগত বা পরিমাপযোগ্য তথ্যকে বলা হয় 'data' বা উপাত্ত বা পরিমেয় তথ্য। এই 'data'

সংগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হলো তথ্য বিশ্লেষণ (data analysis)। এই পরিমাপযোগ্য তথ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়, তার শ্রেণীবদ্ধকরণ করা হয় অথবা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় অথবা কম্পিউটারে সাজিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবীয় যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। কখনো কখনো এই data-র মাধ্যমে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং এর ফলে আরো পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আবার কখনো এই data পূর্বেকার ধারণার বিরোধিতা করে এবং পুরোনো তত্ত্বের পুনর্বিবেচনা করতে অনুপ্রেরণা দেয়। আচরণের সাধারণ সূত্রগুলি থেকে কিছু সিদ্ধান্ত গড়ে তোলা হয় যাকে 'hypothesis' বলা হয়। এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল অসঙ্গতিময় তথ্য বা পর্যালোচনাকে এড়িয়ে না গিয়েও বাস্তবে যা কিছু ঘটছে তা ধরতে পারা।

বৈজ্ঞানিক কাজের ক্ষেত্রে সাধারণত আর এক দফা পযবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা আছে যার সাহায্যে, কোন সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ বস্তুর আচরণ সম্বন্ধীয় যথার্থ সূত্র গড়ে তোলার আগে, অনুসিদ্ধান্তগুলোকে যাচাই করে নেয়া হয়। আমরা আনুমানিক সূত্রগুলোকে ব্যবহার করি নতুন পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কিছু পূর্বঘোষণা করতে এবং সেগুলি বাস্তবে ঘটে কিনা তা দেখতে। যদি তা ঘটে তবে সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্রকেও চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে যদি নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ বা পর্যবেক্ষিত তথ্য পাওয়া যায়। অতএব জ্ঞানের বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও পরিশীলন সর্বদাই ঘটতে থাকে।

আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গভীরভাবে বাস্তবতার সাথে, অর্থাৎ বস্তু যা এবং বস্তু যেভাবে আচরণ করে তার সাথে সম্পর্কিত। এই কারণেই এই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন সামগ্রী ও নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যায় — তা সে এরোপ্লেন, সাবমেরিন, জীবনদায়ী ঔষুধ, নতুন ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী যাই হোক না কেন।

জ্ঞান অর্জনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে অনেকে বিশ্বাস করতো যে জ্ঞান বস্তুত নিজেকে 'প্রকাশ করে', অর্থাৎ জ্ঞান হলো কারোর ভেতর থেকে উঠে আসা এক প্রেরণা। আবার অনেকে বিশ্বাস করতেন যে বাস্তব জীবনধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। আবার অনেকে কল্পনা বা অনুমানকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন। অবশ্য, জ্ঞান অর্জন করতে কল্পনা ও অনুমানশক্তি, গভীর চিন্তা ও অনুপ্রেরণা ইত্যাদির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বিপুল পরিমাণ বাস্তব তথ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি হতে পারে না। এবং জ্ঞানের এই নির্ভরযোগ্যতা যাচাই হয় প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

এইমাত্র যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনা আমরা করলাম তা যে কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও সমাজে তার প্রয়োগকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাই নয়, সমাজ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার অগ্রগতিও এর দ্বারা সাধিত হয়েছে। এমনকি, আমাদের জীবনের সকলক্ষেত্রে প্রতিদিনই আমরা এসব ব্যবহার করি এটা উপলব্ধি না করেই যে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করছি। রাস্তায় আমরা ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলি এবং মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিই একটি বিশেষ বেগে বিশেষদিকে রাস্তা পার হতে কতটা সময় লাগতে পারে। আমরা মানুষের আচারব্যবহার লক্ষ্য করি এবং ঠিক করি তার সাথে কী রকম আচরণ করব। আমরা আমাদের চারপাশে যা দেখি তাকে বিশ্লেষণ করি এবং স্বল্পকালীন অথবা দীর্ঘকালীন ভবিষ্যতের কর্মধারা পরিকল্পনা করি। একমাত্র যখন আমাদের হাতে সংবাদ বা তথ্যের খামতি ঘটে তখন কী করা উচিত তা আমাদের অনুমান করে নিতে হয় যাকে অনেকটা বিশ্বাস বা প্রেরণা বলে চিহ্নিত করা যায়। অবশ্য, মানবীয় আচরণ হলো যুক্তিময়তা ও যুক্তিহীনতা, বিবেচনা ও অবিবেচনার এক আশ্চর্য মিশ্রণ। এর কারণ, অধিকাংশ মানুষেরই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট চেতনা না থাকায় তারা

অযৌক্তিক আচরণের সম্ভাবনাকে কমাতে পারে না। তারা তাদের ব্যক্তিগত আচরণকে বিচার করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। এইজন্য মানবীয় আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর — সঙ্গে যুক্ত করে অন্য ধরনের মানসিক গঠন প্রয়োজন।

অনুশীলনী ২

১. প্রাত্যহিক জীবনে এমন কতকগুলি পরিবর্তনের বর্ণনা দিন যা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সাধিত হয়েছে। (৫টি বাক্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

২. প্রাত্যহিক জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা দিন যেখানে বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রাধান্য পায়। (৫টি বাক্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

৩৪.৬ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও নেহরু

নির্ভরযোগ্য ও বাস্তব জ্ঞান অর্জনের পেছনে যে মানসিক ধারা তাকে 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' বলেই বর্ণনা করা যায়। ভারতে 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' কথাটি বিশেষ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় বোধহয় এইজন্যে যে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে এটি ছিল খুব প্রিয়। আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারটা যেন খুব ওপর-ওপর আনুষ্ঠানিক ব্যাপার না হয় সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির নানা তথ্য জানলেই যথার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। তিনি চাইতেন যাতে মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে ওঠে যাতে তারা উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞানী, উৎকৃষ্টতর নাগরিক, এবং ব্যক্তিগত চিন্তা ও কর্মধারাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে নেহরুর দেওয়া সভাপতির ভাষণের কিছু অংশ পড়লে আপনারা হয়তো উৎসাহীবোধ করবেন। সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতটি খুবই তাৎপর্যময়।

"এটা রীতিমত দুঃখের যে যখন পৃথিবীতে বিজ্ঞানের এত বিপুল শক্তি বর্তমান যা মানুষের উপকারে লাগে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানকে অকল্পনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে তখনও লোকে যুদ্ধ ও সংঘাতের কথাই ভাবছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে এমনভাবে বজায় রাখতে চাইছে যার ফলে একচেটিয়া ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে এবং জনগণের বিভিন্ন অংশ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদগত বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে উপস্থিত নবীন ও প্রবীন আপনাদের সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এইরকম বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে চিন্তাভাবনা করতে এবং ৪০ কোটি ভারতবাসীর অবস্থার দ্রুত সমৃদ্ধিসাধনের যুদ্ধে সামিল হতে। আমি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি যে বিশ্বের সমস্যাবলী ও আমাদের জাতীয় সমস্যাবলীকে বোঝার একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মনোবৃত্তি।

৩৪.৬.১ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ও আবশ্যিক শর্তাবলী

তাহলে কী সেইসব মনের ধারা যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ও তজ্জনিত বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগের দ্রুতবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়?

এর প্রাথমিক ব্যাপারটি হ'ল মনের সক্রিয়তার এক ধারা যা মানসিক জড়তার বিরোধী। মনের এই সক্রিয়ভাব জন্ম দেয় নিরন্তর কৌতুহলের — এমন এক প্রেরণার যা খুঁজতে ও আবিষ্কার করতে চায়। বিশ্বজগৎ রহস্যে পরিপূর্ণ; এখানে এমন অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর পাওয়া যায়নি, এমন অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান আজও প্রতীক্ষিত। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মনের গতি হবে হাল ছেড়ে দেওয়া বা নিষ্ক্রিয়তার পথে নয়, বরং সক্রিয়তা ও আবিষ্কারের অভিযানে সচেষ্ট। প্রাত্যহিক জীবনে এর অর্থ হ'ল, যে যেকাজে নিযুক্ত আছে সেই কাজে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করা এবং তার সাথে যুক্ত নানা প্রশ্নকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিচার করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা।

এই বিষয়টি আর একটি মনোভাবের সাথে জড়িত, এবং তা হ'ল যাচাই না করে কোন সিদ্ধান্ত বা উত্তরকে মেনে না নেওয়া। সাধারণভাবে একটা প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় যে কোন ধারণা বা মতামতকে সহজেই মেনে নেওয়া হচ্ছে — যেহেতু বহুকাল ধরে সেই ধারণা স্বীকৃত হয়ে আসছে, অথবা মহান কোন ব্যক্তি বা নমস্য কোন গ্রন্থে ঐ মতামত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্যে প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি ও পরিসংখ্যাগত উপাদান এবং তার উপযুক্ত বিশ্লেষণ। আমরা সবাই এব্যপারে অবহিত যে একশ বছর আগে কিংবা এক হাজার বছর আগে আমরা আজকের তুলনায় কত কম জানতাম। অতএব সেই অতীতের সেই সাবেকি জ্ঞান ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে যা আমাদের উপর বর্তেছে তাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া যায় না। অবশ্যই অতীতের অনেক জ্ঞানই যথেষ্ট ভাল যেহেতু তা যথেষ্ট পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাতে এটা বোঝায় না যে সমস্ত সাবেকি ধারনাই যুক্তগ্রাহ্য ও গভীর। তাই প্রচলিত সমস্ত তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাসমূহকে বিচার করার ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে দেখা ও বাছাই করা দরকার। এটা এক সাধারণ জ্ঞান যে ভিন্ন ভাষার মানুষ, অথবা দেশের ও বিশ্বের নানাপ্রান্তের মানুষ যারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাদের সম্পর্কে নানা ভ্রান্তধারনা আমরা বংশানুক্রমে নিঃসংশয়ে গ্রহণ ও লালন করি। আমাদের প্রচুর বিশ্বাস ও সংস্কার-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোভাবের জন্য চাই বস্তুনিষ্ঠতা; প্রচলিত মতামতকে চট্ করে মেনে নেয়ার বদলে ধৈর্য ধরে তা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে তবেই নিজস্ব মতামত গড়ে তোলা। এই কারণে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সাধারণত অধিক নমনীয় ও খোলামনের ব্যাপার হয়ে থাকে। আপনারা যদি অনুসন্ধিৎসু হন ও প্রশ্ন করতে শেখেন তবে আপনারা অবশ্যই তথ্য ও প্রমাণকে যাচাই করবেন,

ফলে কখনোই গোঁড়ামি বা একপেশে মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে পারবেন না। তথ্যপ্রমাণের দ্বারা যত নিজেদের মতামতের পরিবর্তন ঘটাতে হয় তত নিজেকে খোলা মনের মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে।

একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যিনি স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষে বসবাস শুরু করেন এবং এদেশের মানুষের সেবা করতে করতেই এখানে মারা যান — সেই J.B.S. Haldane 'Possible Worlds' নামে একটি বই লেখেন যেখানে তিনি লিখেছেন ঃ

"আমাদের শেখানো হয় যে বিশ্বাস একটি মহৎ গুণ। স্পষ্টতই এটা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যি কিন্তু আমি মনে করি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা মিথ্যা। আমি এটাও বুঝি যে বর্তমানে মানবজাতির খুব কম সংখ্যক নয়, বরং খুব বেশি সংখ্যকই বিশ্বাস থেকে ভুগছে। ফলে বিশ্বাস নয়, সন্দেহটাই বেশি করে আজ প্রচার করা প্রয়োজন। বিশ্বাস বলতে আমি শুধুমাত্র বা প্রধানত কোন ধর্মে বিশ্বাসের কথাটি এখানে চিন্তা করছি তা নয়, বরং কোন ব্যাপারকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার অভ্যাসকেই আমি ইঙ্গিত করছি। আধুনিক বিজ্ঞান সন্দেহের বড় বড় ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে — এই ধারণার বিরুদ্ধে কোপারনিকাস সন্দেহ করেছিলেন; ভারী বস্তুপিন্ড হালকা বস্তুপিন্ডের চাইতে দ্রুততর গতিতে নীচে পড়ে — এই ধারণার বিরুদ্ধে গ্যালিলেও সন্দেহ শুরু করেন; রক্তপ্রবাহ শিরার মধ্য দিয়ে 'কলা'য় (Tissue) যায় — এই ধারণার বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন হার্ভে।"

সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা থেকে যেন রহস্য ও নিষ্ক্রিয়তা জন্ম না নেয়, বরং সাক্ষ্যপ্রমাণ, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্যে আরো সক্রিয়তা সৃষ্টি হয় যাতে আরো নির্ভরযোগ্য মতামত ও অনুসিদ্ধান্ত গড়ে তোলা যায়। বিশ্লেষণও একটি যুক্তিবাদী প্রক্রিয়া। তথ্যগুলোকে যাচাই করার সময় যুক্তি প্রায়োগ করা হয় এবং তার দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এর জন্যে প্রথম প্রয়োজন হলো সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে যথেষ্ট মাত্রায় পরিসংখ্যান ও তথ্য। এটা যেন এমন না হয় যে "একজন ইংরেজ একজন ভারতীয়কে লন্ডনের রাস্তায় থুথু ফেলতে দেখলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সব ভারতীয়রাই নোংরা স্বভাবের"। বস্তুত আমরা বহুক্ষেত্রেই এই ধরনের ভ্রান্ত সরলীকরণ করি এবং নানা সংখ্যালঘু জাতি বা গোষ্ঠীর লোকেদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে স্বল্প সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে নানা ধারণা তৈরি করে বসি। শিখ, গোর্খা, মুসলিম অথবা পার্সি প্রভৃতি গোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের বহু ধারণার সৃষ্টি এইভাবেই।

যুক্তির যথাযত প্রয়োগের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে তাকে গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি আমাদের থাকা উচিত, এমনকি যদি সেই সিদ্ধান্ত আমাদের নিজের প্রিয় কোন ধারণা অথবা ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচলিত কোন ধারণার বিরুদ্ধে যায়ও। অন্যভাবে বলা যায়, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধারণাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন সংস্কার থাকা অথবা তাকে এড়িয়ে চলা উচিত নয়। গোঁড়ামি বর্জন ও খোলা মন এই দুটি হলো বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে, আমরা জানি যে পৃথিবী ব্যাপক বৈচিত্রে পূর্ণ এবং আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যখন অনেক কিছুই স্পষ্টভাবে জানা বা বোঝা যাচ্ছে না, তাই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের একটা দিক হলো কোন মতামত পোষণ বা ব্যক্ত করার ব্যাপারে ঔদ্ধত্যের বদলে বিনয় দেখানো। অনেককিছু সম্পর্কেই আমরা পুরোপুরি দৃঢ়নিশ্চিত হতে পারি না, এবং তাই কোন ধারণা পোষণ করার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি থাকাটাও উচিত নয়; বরং কোন কিছু সম্পর্কে নিজের ধারণার পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে প্রস্তুত থাকা উচিত। অন্যদিকে, বিগত শতাব্দগুলিতে মানুষের অর্জিত কৃতিত্ব আমাদের মনে বিজ্ঞানের ক্ষমতা সম্পর্কে এই আস্থা সৃষ্টি করেছে যে বিজ্ঞান অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে পারে এবং আজকের অসমাধিত সমস্যাবলীর সমাধান হয়তো কাল সমাধান করবে। এই অর্থে কোন কিছুই আমাদের ক্ষমতার অতীত নয়। মানবীয় প্রয়াসের উপর আস্থাই হলো আবিষ্কার, অনুসন্ধান ও সৃজনমূলক সক্রিয়তার ভিত্তি। এর সাথে 'ভবিতব্যবাদে'র কোন যোগই নেই — যে ভবিতব্যবাদ মনে করে যে মানুষের জীবন তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নয়, ববং তা নিয়ন্ত্রিত হয় ভাগ্য বিধাতরা হাতে ক্রীড়নক হিসেবে। উপরোক্ত এইসব বৈশিষ্ট্যই হলো বৈজ্ঞানিক মনোভাবের চারিত্রলক্ষণ। অবশ্য এর সাথে রয়েছে কঠোর ধারাবাহিক কর্মোদ্যোগ এবং আচরণ ও কর্মের মধ্যে সঙ্গতি।

বর্তমান একক-টির পরিসমাপ্তিতে নেহরুর অপর একটি জোরালো উদ্ধৃতি উল্লেখ করা সমীচীন হবে। উদ্ধৃতিটি তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ঃ

"আজকের প্রতিটি দেশ ও জাতির উন্নয়নের পক্ষে বিজ্ঞানের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রায়োগের চাইতে অতিরিক্ত কিছুও প্রয়োজন। এবং তা হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিজ্ঞান সম্পর্কে দুঃসাহসিক অথচ সমালোচনাপূর্ণ মনোভাব, সত্য ও নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ, কোন কিছুর পরীক্ষা বা যাচাই করা ছাড়া গ্রহণ না করা, নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোয় পুরোনো সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে নেয়ার মানসিকতা, পূর্বানুমানভিত্তিক তত্ত্বের উপর নয় বরং পর্যবেক্ষণভিত্তিক তথ্যের উপর আস্থা, এবং মনের কঠোর শৃঙ্খলা — এসবই প্রয়োজন শুধু বৈজ্ঞানিক প্রায়োগের জন্য নয়, বরং জীবন ও তার নানা সমস্যার সমাধানের জন্য।"

অনুশীলনী ৩

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কাকে বলে?

.....

.....

.....

.....

.....

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বিষয়ে নেহরুর মতামত কয়েকটি বাক্যে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা জন্য কী কী গুণাবলীর প্রয়োজন বলে মনে করেন?

.....

.....

.....

.....

.....

৩৪.৭ সারাংশ

এই একক পাঠে আমরা এখন বুঝতে পেরেছি বৈজ্ঞানিক মানসকতা কাকে বলে, এবং আমাদের দেশে প্রতিটি মানুষের জীবনে কেন ঐ মানসিকতা এত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি যে বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে সম্ভাব্য প্রায় সকল দিক থেকে বদলে দিয়েছে, অথচ আমাদের অনেক ধ্যানধারণাই অবৈজ্ঞানিক বা প্রাক্-বৈজ্ঞানিক। এই অবৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানবিরোধী মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণাই অধিকাংশ সময় আমাদের ভয়ঙ্কর নেতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন ও প্রক্রিয়াসমূহের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে — যেমন সাম্প্রদায়িক বা প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী সমূহ। এগুলিকে মাথায় রেখেই পন্ডিত নেহরু প্রমুখ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বৈজ্ঞানিক মানসিকতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

৩৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

Bernal J.D. 1968 The Social Function of Science MII Press

David Benj. 1973 The Scientists Role in Society Prentice Hall

Haldane JBS 1958 The Utility and Discovery of Life 'Ministry of Information of Broadcasting, Govt. of India', Publication Division

Malhotra P. (2nd ed) 1984 Nehru : An Anthology for Young Readers, New Delhi, NCERT.

Narasimhaiah, H. 1987 : Science, Nonscience and the Paranormal, Bangalore Science Forum, Bangalore.

Ravety, J.R. 1973 Scientific Knowledge and its Social Problems, London Penguin.

UNESCO, 1971 An Esay on the Origin and Organisation of National Science Policies. Pt. I.

৩৪.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১. বৈদ্যুতিক আলো, রেকর্ড, টেপ, রেডিও, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য যন্ত্রসামগ্রী হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফসল।

২. ৩৪.৪.৩ Sectionটি দেখুন।

অনুশীলনী ২

১. বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আমাদের জ্ঞানের বিপুল বিস্তার ঘটেছে। এছাড়াও এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলার মাত্রা এবং নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো বাস্তব স্তরে বিজ্ঞানের অবদান

আছে যেমন আমাদের আয়ুকে দীর্ঘতর করেছে। নেতিবাচক পরিবর্তনও আছে যেমন পরিবেশের দূষণ ইত্যাদি।

২. বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠানাদি এবং অতিরিন্দ্রিয়বাদ ও আদিযাদুবিদ্যায় বিশ্বাস ইত্যাদিকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যায় যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

অনুশীলনী ৩

১. জীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা মনের এক দিশা।

২. নেহরু ছিলেন তাঁর দেশের নরনারীর মানসিক গঠনে আচার সর্বস্বতা ও নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে। তিনি মনের সক্রিয়তা ও গতিময়তার উপর জোর দিতেন।

৩. অনুসন্ধিৎসা, মনের স্বাধীন ঝোঁক, ব্যক্তিগত বিশ্বাসসমূহের উপরে ওঠার ক্ষমতা ইত্যাদি।

—০—